স্বামী নির্মলানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব

SWAMI NIRMALANANDA

Advent
23rd December 1863

Mahasamadhi
26th April 1938

Sri Sri Ramkrishna, Holy Mother, Swami Vivekananda, Swami Brahmananda, Swami Premananda, Swami Yogananda, Swami Niranjanananda, Swami Ramkrishnananda, Swami Saradananda, Swami Adbhutananda, Swami Sivananda, Swami Abhedananda, Swami Adwaitananda, Swami Turiananda, Swami Akhandananda, Swami Trigunatitananda, Swami Subodhananda, Swami Bijnanananda, Swami Nirmalananda

স্বামী নির্মলানন্দ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য সন্ন্যাসীপ্রবর শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজের বিস্তৃত জীবনী, বক্তৃতাবলী, কথোপকথন ও পত্রমালা

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মঠ
বাগবাজার
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদদের মধ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী নির্ম্মলানন্দজী মহারাজ (তুলসী মহারাজ) অন্যতম। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে দক্ষিণ ভারতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়া তথাকার সমাজ-জীবনে বিরাট পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। ভারতের অপরাপর অংশে. ব্রহ্মদেশে ও সুদূর আমেরিকাতেও তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্ম-প্রচার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব প্রচারে তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্ম-প্রচেষ্টার বিষয় সাধারণ লোকের অগোচরে রহিয়া গিয়াছে। ১৯৪৩ সালে মাদ্রাজ-প্রদেশবাসী তাঁহার সুযোগ্য ত্যাগী সন্ন্যাসীদের চেষ্টায় তাঁহার সম্বন্ধে একখানা বিস্তৃত ইংরাজী জীবনীগ্রন্থ প্রকশিত হইয়া কিছুটা অভাব পূরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাংলা ভাষায় অনুরূপ গ্রন্থ না থাকায় একটা বড় অভাব ছিল। বাংলাদেশের এই কীর্ত্তিমান মহাপুরুষের সম্বন্ধে জানিবার-বুঝিবার সুযোগ হইতে বাংলার জনসাধারণই বঞ্চিত ছিলেন। স্বনামধন্য লেখক শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী মহারাজের চেষ্টায় এতদিনে বাংলা জীবনী প্রকাশ করা সম্ভব হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ত্রিপুরানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের এই অন্তরঙ্গপার্ষদের সাহচর্য্যে বহুকাল থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই পুস্তক-প্রণয়নে তিনি বহু অপ্রকাশিত তথ্য লেখককে দিয়া সহায়তা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তৎপ্রদত্ত তথ্যসমূহ ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়াতে গ্রন্থখানার জীবনী-গ্রন্থ নাম সার্থক হইয়াছে।

লেখক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দজী মহারাজ বৃদ্ধবয়সে এই পুস্তক প্রণয়নে খুব পরিশ্রম করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। নিবেদন ইতি।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩৬৮ প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণে ভূমিকা

শ্রীশ্রী ঠাকুরের অশেষ কৃপায় বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ত্রিপুরানন্দ মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা, ব্রহ্মচর্য্যদীক্ষা ও সন্ন্যাস লাভ করেছি।

পরমপূজ্য গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী ত্রিপুরানন্দ মহারাজের অশেষ প্রচেষ্টায় শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজের জীবনী গ্রন্থটি বহুপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। সুধীমহলে গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন তুলেছিল, কারণ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপনার গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু অকথিত ও অনুল্লেখিত তথ্য ও ঘটনার বিবরণী ঐ গ্রন্থটিতে ছিল।

বহু দুঃখ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে গ্রন্থটির দ্বিতীয় প্রকাশনা বের হল। এটি প্রকাশের জন্য যে সব সজ্জন ব্যক্তি নানাবিধ সহযোগিতা দান করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপায় গ্রন্থটি পূর্ব সংস্করণের ন্যায় সমাদৃত হবে বলে আশা রাখি।

৫ই পৌষ, ১৪০৬
(পৌষ শুক্লা চর্তুদশী)

নিবেদন ইতি —
স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দ

নিবেদন

মৎপ্রণীত 'নবযুগের মহাপুরুষ', দ্বিতীয় ভাগ ১৩৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। উহাতে শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজের ৪৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াছি। উক্ত সংক্ষিপ্ত জীবনীর প্রথমাংশ 'বিশ্ববাণী' মাসিকে ১৩৫৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বাহির হয়। প্রায় পাঁচ বৎসর পরে এই বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর বিস্তৃত জীবনী লিখিত এবং পত্রমালা ও কথোপকথন ও বক্তৃতাবলী সংগৃহীত হইল। বস্তুতঃ, এই রচনা স্বামী নির্মলানন্দের ৯২তম জন্মতিথির পূর্বে ১৩৬১ সালের মধ্যভাগে সম্পূর্ণ ও মুদ্রণার্থ প্রস্তুত হয়। অনিবার্য্য কারণে প্রায় সাত বৎসর পরে ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম ত্যাগী শিষ্য স্বামী নির্মলানন্দের অলৌকিক জীবন-বেদ ঐকান্তিক অনুধ্যান করিয়াছি। পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী-শিষ্যত্রয়—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের বিস্তৃত জীবনী রচনার পরম সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপার্ষদ্ স্বামী নির্মলানন্দজীর বিস্তৃত জীবনী রচনা করিয়া আমি ধন্য হইলাম। বেলুড়মঠে বহুবার তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়াছি এবং তাঁহার মুখে প্রেরণাপ্রদ ভাবগম্ভীর ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিয়াছি। তিনি যখন ইংরাজীতে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন, তাহা শুনিলে মনে হইত, যেন উহা তেজোদ্দীপ্ত সিংহগর্জন। সেই পুণ্যস্মৃতির যথার্থ মর্য্যাদা প্রদানার্থ এই গ্রন্থ রচিত হইল।

দক্ষিণ মালাবারের ওট্টাপালমস্থ নিরঞ্জন আশ্রম হইতে স্বামী নির্মলানন্দের বিস্তৃত ইংরাজী জীবনী ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অতিশয় পরিতাপের বিষয় এই যে, তাহার দীর্ঘকাল পরে সেই অমর সন্ন্যাসীর বাংলা জীবনী বাহির হইল। তাঁহার শতজন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গদেশে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য যথোচিত আয়োজন আবশ্যক। এই বাংলা জীবনী প্রধানতঃ পূর্বোক্ত ইংরাজী জীবনী অবলম্বনে লিখিত হইলেও ইহাতে অনেক নূতন উপাদান সংযোজিত হইয়াছে। কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ত্রিপুরানন্দজী এই শুভকর্মে প্রথম

হইতেই আমাকে প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্য দিয়াছেন এবং পরিশেষে এই গ্রন্থ প্রকাশের গুরুভারও গ্রহণ করিয়াছেন। তৎকর্তৃক চম্বারাজ্যে স্বামী নির্মলানন্দের অবস্থান-বিবরণ প্রদত্ত এবং বহু পত্র ও উপাদান সংগৃহীত। ওট্টাপালম্ নিরঞ্জন আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশদানন্দজীর নিকটও বিপুল প্রেরণা ও পরামর্শ পাইয়াছি। এই গ্রন্থে স্বামী নির্মলানন্দের জীবন-বৃত্তান্তের সহিত বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের অপ্রকাশিত উপেক্ষিত তথ্যপূর্ণ ইতিহাসও লিখিত হইয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ ও স্বামী নির্মলানন্দের মধ্যে মামলা বাঙ্গালোর জজ্ কোর্টে চলিয়াছিল। উহাতে স্বামী নির্মলানন্দ যে স্মরণীয় সাক্ষ্যদান করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এই পুস্তকের প্রারম্ভে প্রদত্ত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে ও আমেরিকায় স্বামী নির্মলানন্দ বেদান্ত-প্রচারের জন্য যে প্রাণপাতী পরিশ্রম করিয়াছিলেন, উহার চিত্তাকর্ষক বিবরণ ব্যতীত রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ইতিহাস অসমাপ্ত থাকিবে। সর্বোপরি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদের উপর এই অন্যতম জীবনী শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। নিঃসংশয়ে ইহা বাংলা সাহিত্যকে এবং বৃহত্তর বাংলার ইতিবৃত্তকে সমৃদ্ধ করিবে।

এই পুস্তক-প্রণয়নে স্নেহাস্পদ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার, বি. এ., বি টি., শ্রীশিবানীপ্রসাদ মৈত্র, এম. এ. ও স্বামী বিশ্বরূপানন্দ প্রমুখ তরুণ বন্ধুগণ আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করিয়াছে। তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতা না পাইলে আমার পক্ষে ভগ্নস্বাস্থ্য ও ক্ষীণদৃষ্টি লইয়া এই পুস্তক রচনা সম্ভব হইত না। এইজন্য তাহাদের সকলকে প্রীতিপূর্ণ ধন্যবাদ জানাইতেছি। সর্বশেষে উৎসাহ-দাতা ও প্রকাশক শ্রীমৎ স্বামী ত্রিপুরানন্দজীকেও গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের এই নূতন পুস্তক শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ্ নির্মলানন্দজীর পূতজীবনী ও অমর বাণী প্রচারে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সমর্থ হইলেই আমার সর্ব শ্রম সার্থক হইবে। ইতি

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র

বেলুড়,

ফাল্গুন, শুক্লাদ্বিতীয়া ১৩৬৮ সাল

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

'নির্মলানন্দ প্রণাম'

স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ এবং সাক্ষাৎ মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁর জীবনী গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ত্রিপুরানন্দ মহারাজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

১৩৬৮ সাল থেকে অনেক বছর কেটে গেছে, গ্রন্থটির অভাব অনুভূত হচ্ছে সর্বত্র; বিশেষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার আন্দোলন ও সঠিক তথ্য এবং তথ্য গোপন করে রাখার প্রচেষ্টার ইতিহাস প্রকাশের আলোয় আনার জন্য আবার গ্রন্থটির একটি নতুন প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন ইতিহাস অনুশীলন অনুরাগী বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ। শ্রীমৎ স্বামী ত্রিপুরানন্দ মহারাজ মন্ত্র-ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস দান করে বর্তমান মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দ মহারাজকে কৃপাধন্য করেছেন। শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণুদেবানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠের বর্তমান অধ্যক্ষ রূপে গ্রন্থটির পুনঃ প্রকাশের জন্য ব্রতী হয়েছেন, অনেক দুঃখ-দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে।

'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপনের গতি-প্রকৃতি, বরেণ্য পূজনীয় স্বামীজীদের এবং মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষের জাগতিক চিন্তাভাবনার বেশকিছু অনভিপ্রেত বিতর্কমূলক কার্য্যকলাপ গোচরে আসবে গ্রন্থটির মাধ্যমে।'

বিতর্ক একটিই সেটি-হল রামকৃষ্ণ মিশন কেন স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য হিসাবে স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিলেন। অথচ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন প্রকাশিত পুস্তক-প্রবন্ধে, চিঠিপত্র ও ছবিতেই অজস্র সাক্ষ্য রয়েছে যাতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় প্রকাশনে যে সব ব্যক্তি নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি ঠাকুর রামকৃষ্ণের, শ্রীশ্রী মা'র এবং স্বামীজীর কৃপা বর্ষিত হোক।

গ্রন্থটি পূর্বের মতই অনুরাগী মহলে সমাদৃত হবে আশা রাখি। শ্রীশ্রী ঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর কৃপালাভেচ্ছু—

৫ই পৌষ, ১৪০৬
(পৌষ শুক্লা চর্তুদশী)

'স্বামী জ্যোতির্জয়ানন্দ'

সূচীপত্র

বিষয়				পৃষ্ঠা
এক	—	পরিচয়	...	১
দুই	—	বাল্যকথা	...	৮
তিন	—	গুরুলাভ	...	১৪
চার	—	সাক্ষাৎ শিষ্য	...	২৩
পাঁচ	—	বরাহনগর ও আলমবাজার মঠ	...	৩১
ছয়	—	পরিব্রাজক	...	৪১
সাত	—	স্বামিজীর সাহচর্য্য	...	৪৯
আট	—	আমেরিকায় তিন বৎসর	...	৫৯
নয়	—	চম্বা রাজ্যে	...	৭০
দশ	—	বাঙ্গালোর আশ্রমে	...	৭২
এগার	—	কেরলে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব	...	৮১
বার	—	দাক্ষিণাত্যে সংঘমাতা	...	৮৬
তের	—	ত্রিবান্দ্রমে পদার্পণ	...	৯০
চোদ্দ	—	মালাবারে বেদান্ত প্রচার	...	৯৬
পনের	—	হরিপাদে আশ্রম প্রতিষ্ঠা	...	১০৪
ষোল	—	ওট্টাপালম্ স্মৃতি-তীর্থ	...	১০৮
সতের	—	অলৌকিক গুরুভ্রাতৃপ্রেম	...	১১৬
আঠার	—	কেরল জাগ্রত	...	১২০
উনিশ	—	প্রবল ধর্মবন্যা	...	১২৩
কুড়ি	—	আন্দোলন বর্ধমান	...	১৩৬
একুশ	—	মর্মন্তদ শোক-সংবাদ	...	১৪৬
বাইশ	—	অবিশ্রান্ত প্রচার-ভ্রমণ	...	১৫২
তেইশ	—	অনির্ব্বান হোমশিখা	...	১৫৫
চব্বিশ	—	গুরুভ্রাতার পুণ্যস্মৃতি	...	১৫৭
পঁচিশ	—	উত্তর ভারতে দশ মাস	...	১৬০
ছাব্বিশ	—	জ্ঞানালোক বিকিরণ	...	১৬৮
সাতাইশ	—	ওট্টাপালমে নিরঞ্জন আশ্রম	...	১৭২
আটাইশ	—	কূর্গ হইতে ত্রিবান্দ্রাম	...	১৭৩
ঊনত্রিশ	—	গভীর শূন্যতা	...	১৭৮
ত্রিশ	—	ব্রহ্মদেশে তিনবার	...	১৭৯
একত্রিশ	—	কর্মক্ষেত্র প্রসারিত	...	১৮৬
বত্রিশ	—	বিবেকানন্দ মিশনের অধ্যক্ষতা	...	১৯৬
তেত্রিশ	—	ওট্টাপালমে দিব্যদর্শন	...	২০৩
চৌত্রিশ	—	শিষ্যদের জীবন-গঠন	...	২০৭
পঁয়ত্রিশ	—	মহাসমাধি	...	২২৬
ছত্রিশ	—	উপসংহার	...	২৩৫
সাঁইত্রিশ	—	পত্রমালা	...	২৪৩
আটত্রিশ	—	কথোপকথন	...	২৬৩
ঊনচল্লিশ	—	বক্তৃতাবলী	...	২৭৫
পরিশিষ্ট—				
এক	—	অপ্রকাশিত সংঘবার্তা	...	২৮৭
দুই	—	মূল্যবান পত্রাবলী	...	২৯৭
তিন	—	দক্ষিণ ভারতে শ্রীমৎ নির্মলানন্দজী প্রতিষ্ঠিত আশ্রম সমূহ	...	৩০৮

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলচলং সর্ব্বধী সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং তং নমামি ॥

হৃদয় কমল মধ্যে রাজিতং নির্ব্বিকল্পং
সদসদখিল ভেদাতীতমেক স্বরূপং।
প্রকৃতি-বিকৃতি-শূন্যং নিত্যমানন্দমূর্তিং
বিমল পরমহংস রামকৃষ্ণং ভজামঃ ॥

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্ব্বধর্ম স্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণায় তে নমঃ ॥

এক

পরিচয়

(১)

বেলুড়মঠের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন', মাসিকে ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় নিম্নোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। —"গত ২৬শে এপ্রিল, (১৯৩৮ খ্রীঃ মঙ্গলবার স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ মালাবার প্রদেশে ওট্টাপালম নামক স্থানে ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী নির্মলানন্দ বাগবাজার বসু-পাড়ার বিখ্যাত দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল তুলসীদাস দত্ত এবং পিতার নাম দেবনাথ দত্ত। তিনি বাগবাজারে বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে অল্পবয়সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানের পর বরাহনগর মঠে যোগদান করেন এবং স্বামী নির্মলানন্দ নামে পরিচিত হন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীঃ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাকে আমেরিকায় প্রেরণ করা হয় এবং ১৯০৬ খ্রীঃ তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কয়েক বৎসর উত্তর ভারতে নানা তীর্থ পর্য্যটনে ও তপস্যায় অতিবাহিত করেন। দক্ষিণ ভারতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের কার্য্যে সহায়তা করিবার

জন্য তিনি ১৯০৯ খ্রীঃ বেলুড়মঠ হইতে প্রেরিত হন এবং বিশ বৎসরের উপর উক্ত আশ্রমের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার ও মালাবার অঞ্চলে কয়েকটী আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁহার তেজস্বিতা ও বাগ্মিতা ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি বহু ভক্ত ও শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহবসানে সকলেই শোক-সন্তপ্ত।”

(২)

শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক সঙ্কলিত এবং ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ‘জীবনী-কোষ’ অভিধানের চতুর্থ খণ্ডে ১২২৩-২৪ পৃষ্ঠায় স্বামী নির্মলানন্দের নিম্নোক্ত পরিচয় প্রদত্ত।

“শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্য ও লীলা-সহচর। তিনি কলিকাতা বাগবাজারের বসুপাড়া লেনে বিখ্যাত দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দেবনাথ দত্ত। নির্মলানন্দ স্বামীর পূর্ব নাম ছিল তুলসীদাস দত্ত। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকাল হইতে ধর্মে তাঁহার অনুরাগ ছিল। মাত্র আঠার বৎসর বয়সে বাগবাজার বলরাম বসুর মন্দিরে তিনি সর্বপ্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার সংস্পর্শে আসেন এবং ঐ ঘটনার পর হইতে তিনি দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে যাতায়াত করিতে থাকেন। তাঁহার অন্যান্য গুরুভাইদের সহিত মিলিত হইয়া তিনি কাশীপুরের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পরে কয়েকজন গুরুভাইয়ের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তিনি কাশীপুরেই এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ও তাঁহার অন্যতম গুরুভাইয়ের প্রাণপাত পরিশ্রমে এই সংগঠন কার্য্য পরিচালনা করেন। পরে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম যে কার্য-পরিষদ স্বামী বিবেকানন্দের তত্ত্বাবধধানে গঠিত হয়, তিনি উহার প্রথম সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অভেদানন্দজীকে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য তিনি আমেরিকা গমন এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। আমেরিকায় প্রচার কালে তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভারতের নানা তীর্থে পর্য্যটন করিয়া হিমালয় প্রদেশে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। ১৯০৯

খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর রাজ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হইলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক আহূত হইয়া তিনি নবস্থাপিত আশ্রমের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তদবধি দীর্ঘ ঊনত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারা দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে প্রচারে নিরত হন। তিনি যেমন সরল, উদার ও অমায়িক ছিলেন, তেমনি দৃঢ়চেতা, তেজস্বী ও সৎসাহসী ছিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলিকাতায় বিবেকানন্দ মিশন ও রামকৃষ্ণ-সারদামঠ স্থাপিত হয় তখন তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য ও ভক্তবৃন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উহার সভাপতিপদ গ্রহণ করেন এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহার অগণিত সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্য রহিয়াছে। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ (১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) দক্ষিণ ভারতের ওটাপলম্ আশ্রমে তিনি দেহরক্ষা করেন।”

(৩)

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন, তৎপ্রণীত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত’ পুস্তকে (৩৫৪ পৃষ্ঠায়) স্বামী নির্মলানন্দ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত পরিচয় প্রদত্ত।

“যখন বড় একটা লোক থাকতো না, তখন তিনি প্রভুর নিকট যাইতেন ও তাঁহার উপদেশামৃত পান করিতেন। এইজন্য আমরা অনেকে কোন দিনও তাঁহাকে ঠাকুরের কাছে দেখি নাই। বাগবাজার বোসপাড়ায় যে বাড়ীতে বারমাসে তের পার্বণ হইত, তিনি সেই দত্ত বাড়ীর সন্তান। গঙ্গাধর ও হরি ভাই এক পল্লীর ও সমবয়সী। স্বামীজীর আকর্ষণে বরাহনগর মিলন-মন্দিরে তুলসী যোগদান করেন এবং স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি ত্যাগী, সুপণ্ডিত, বাগ্মী ও রহস্যপ্রিয়; এক সময় কালী (অভেদানন্দ) ও ইনি যেন মানিকজোড় ছিলেন। এইজন্য কালীভায়া প্রভুর প্রচারার্থ তাঁহাকে আমেরিকায় লইয়া যান। দাক্ষিণাত্যে ঠাকুরের ভাব-প্রচার-কল্পে ইনি অনেক মঠ স্থাপন করিয়াছেন।”

(৪)

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সেণ্টারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী নিখিলানন্দ ‘শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত’এর যে ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন তাহা Gospel of Sri

Ramkrishna নামে ১৯৪২ খ্রীঃ প্রকাশিত। উহার বিস্তৃত ভূমিকায় ৬৩ পৃষ্ঠায় তুলসী মহারাজ ওরফে স্বামী নির্মলানন্দ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত পরিচয় প্রদত্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যে ক্ষুদ্রদল পরবর্ত্তীকালে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করেন তাহা দুই তরুণ সারদা ও তুলসীর আগমনে সম্পূর্ণ হয়, বুড়ো গোপাল ব্যতীত অন্য ষোলজন বালকমাত্র ছিলেন। লাটু ব্যতীত অন্য সকলেই বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবার হইতে সমাগত, এবং তন্মধ্যে অধিকাংশই স্কুল বা কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ তাঁহাদের উজ্জ্বল ঐহিক ভবিষ্যতের আশা পোষণ করিতেন। শুদ্ধ দেহ, সতেজ মানস ও নিষ্পাপ অন্তর লইয়া তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিয়াছিলেন। সকলেই অসাধারণ আধ্যাত্মিক গুন-সম্পদ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্বীয়সন্তান, স্বজন, সুহৃৎ ও সঙ্গীরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার দিব্য স্পর্শে তাঁহাদের চরিত্র সম্যক বিকশিত হয়। পরবর্তীকালে প্রত্যেকের জীবনে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে ঠাকুরের জীবন প্রতিবিম্বিত হয় এবং তাঁহারা বিদেশে ও সাগরপারে তাঁহার বার্তাবহ হন।" "পুনরায় উক্ত পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠায় আছে, "প্রথমে হরি ও তুলসী বরাহনগর মঠে দর্শকরূপে আসিয়া অবিলম্বে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন এবং ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের তালিকা পূর্ণ করেন।"

(৫)

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ তৎপ্রণীত 'Memoirs of Ramakrishna' নামক ইংরাজি পুস্তকে লিখিয়াছেন :— "ঠাকুরের বালক-শিষ্যদের মধ্যে, সারদা, হরি, গঙ্গাধর, সুবোধ ও তুলসী কিছু পরে মঠে যোগদান পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণান্তে যথাক্রমে ত্রিগুণাতীতানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অখণ্ডানন্দ, সুবোধানন্দ ও নির্মলানন্দ নামে অভিহিত হন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রতি সমান ভাবে করুণা বিতরণ করেন এবং তাঁহাদিগকে কৃপা করিতে সদা প্রস্তুত ছিলেন।"

(৬)

কাশীপুর উদ্যান বাটিতে ১৮৮৬ খ্রীঃ ঠাকুরের অন্তিম অসুখের সময় যেদিন

শিষ্যগণ গুরু সেবা ব্রতী ছিলেন, "তাঁহাদের নামোল্লেখ প্রসঙ্গে" পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ তৎপ্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গের পঞ্চমভাগে ৩২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "পাঠকের কৌতুহল নিবারণের জন্য ঐ দ্বাদশজন সেবাব্রতীর নাম এখানে দেওয়া গেল। যথা—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, গোপাল দাদা. কালী, শশী, শরৎ এবং হুট্কো-গোপাল। সারদা পিতার নির্যাতনে দুই একদিন মাত্র আসিয়া থাকিতে সমর্থ হইত। কয়েক দিন আসিবার পরে গৃহে ফিরিয়া হরিশের মস্তিষ্কের বিকার জন্মে। হরি, তুলসী, (স্বামী নির্মলানন্দ) ও গঙ্গাধর বাটিতে থাকিয়া তপস্যা ও মধ্যে মধ্যে আসা-যাওয়া করিত।"

(৭)

একদা স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী নির্মলানন্দ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "তুলসীকে দেখ। সাধু তার মত হওয়া চাই। তার খুব ভাল মাথা ও জোরাল দেহ আছে। দিবারাত্রি সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। আবার বহু ঘণ্টা সে ধ্যানে মগ্ন থাকতে পারে। সে ভাল গাইতে ও বাজাতে পারে। সে শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও ধর্মপ্রসঙ্গ করতে, বক্তৃতা দিতে ও রান্না করতে পারে। তোমরা সকলে তার মত সব কাজে পটু হবে।"

(৮)

ব্যাঙ্গালোরের ভক্ত শ্রীরাজাগোপাল নাইডুকে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯১১ খ্রীঃ বলিয়াছিলেন,—"তোমরা স্বামী নির্মলানন্দজীকে তোমাদের মধ্যে পেয়ে ধন্য হয়েছ। তারকারাজির মধ্যে তিনি চন্দ্র তুল্য, তিনি এত ত্যাগী যে অন্যের প্রয়োজন হলে নিজ কৌপিনটী পর্য্যন্ত দান করতে পারে।"

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম সহোদর শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত তৎপ্রণীত 'মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান' নামক পুস্তকে (১২৩-১২৬ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন, "বরাহনগর মঠ স্থাপনের অল্প কয়েক মাস পরেই অর্থাৎ এক বৎসরের ভিতরেই তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ) আসেন। তিনি তখন যুবা, কৃশ ও দৃঢ়কায় শরীর বিশিষ্ট, অতি মিষ্ঠভাষী, সর্ব্বদা হাসিমুখ ও অক্লান্ত পরিশ্রমী। তিনি শশী মহারাজের একরূপ ডান হাত হইয়া রহিলেন। কি

হাণ্ডা মাজা, কি পুকুর থেকে জল আনা, যে কাজই হোকনা কেন তুলসী মহারাজ আগুয়ান হইয়া করিতেন। রাত্রে অনেক সময় তিনি রুটী সেঁকিতেন। এই রুটী সেঁকার কথা বড় আনন্দদায়ক। দুই তিন জন লোক ময়দা মাখছে ও বেলছে। একটা কেরোসিন তেলের টিনের উপর একজন বসেছে উনুনে এক একখানা করে রুটী সেঁকছে এবং যে যখন খেতে বসছে তাকে গরম গরম রুটী এক একখানা করে দিচ্ছে, আর মুখে নানা রকম উচ্চ অঙ্গের চর্চ্চা চলছে। সে রুটী সেঁকা ও রান্না ঘরে গিয়ে জড় হওয়া বড় আনন্দের জিনিষ ছিল। হাতেও যেমন সকলে কাজ করছে, মুখেতেও তেমনি সৎ চর্চ্চা এবং সৎ আলোচনা চলছে। সে ভারি এক স্ফূর্তির ব্যাপার ছিল। তরকারী যাই হোক না কেন, গরম রুটী নুন লঙ্কা আর এই সৎ চর্চ্চা ও মাঝে মাঝে খুব হাসি-তামাসা থাকায়, এই রুটী খাওয়া মহা আনন্দের জিনিষ ছিল। মোট কথা, ইহাই আবশ্যক যে এই কঠোর সাধনা, অনাহার ও অনিদ্রা কাহারও মনে কোন কষ্ট বা দুঃখের কারণ বলিয়া বোধ হইত না। একটা আনন্দ ও হাসি-তামাসার ভিতর দিয়া যেন সমস্ত জীবন স্রোত চলিত গোমড়া মুখ, বিষন্ন ভাব, রুক্ষ ভাব-এই সব কিছুই ছিল না। হাস্য-কৌতুকের ভিতর দিয়া মহা কঠোর ও দুঃসাধ্য সাধনা চলিয়াছিল। এই জন্য এই কঠোর সাধনা কেহ কষ্ট বলিয়া মনে করে নাই। আলমবাজার মঠে শশী মহারাজ এবং তুলসী মহারাজ দুইজনেই যেন মঠের অধ্যক্ষ হইলেন। এই দুইজনেই সমস্ত দেখাশুনা করিতেন। এই কয়েক বৎসর তুলসী মহারাজের জীবন একদিকে যেমন কষ্টকর ছিল, অপরদিকে তেমনি আনন্দময় হইয়াছিল। এইটিই পক্ষান্তরে তাঁ'র জীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। এক দিকে নিজের জপধ্যান করিতেছেন ; আবার অবসর পাইলেই পড়াশুনা করিতেছেন। কার্য্যের দিকেও তেমনি তৎপর ছিলেন। আবশ্যক হইলে ঘর-দুয়ার ঝাঁট দিতেছেন এবং বাজারে গিয়া একটা ঝুলি করিয়া আনাজ-তরকারীও কিনিয়া আনিতেছেন। আলাম বাজারের বুড়ীর কাছ থেকে টিকে কিনিয়া ঝোড়াটা নিজে কাঁধে করিয়া লইয়া তুলসী মহারাজ আসিতেন ; আবার এদিকে সমস্ত বাসন, হাণ্ডা চটপট করিয়া মাজিয়া ফেলিতেন। অবশ্য অপরেও তাঁর সঙ্গে কখনও কখনও এই কাজ করিতেন। তাঁহার এই অদ্ভুত কার্যের দৃশ্য এখনও আমার চোখের উপর রহিয়াছে। ভিতর বাড়ীর খিড়কীর দিকে একটা পুকুর ছিল। তুলসী মহারাজ এক কলসী জল কাঁধে আর এক কলসী জল

হাতে লইয়া সমস্ত নীচের বাড়ীটা মাড়িয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে, উপরকার খোলা ছাদের দক্ষিণ দিকের যে পায়খানাটা, সেইটি ধুইয়া ফেলিতেন। তাঁকে প্রণাম করি। তিনি বড় বড় মাটির গামলাতে জল ভরে রাখতেন। জল তুলে তুলে তাঁর বাঁদিকের কাঁধেতে একটা দাগ পড়ে গিছলো। আবার এর ভিতরেও তিনি রান্না ঘরের কাজ করিতেন। কুটনো কাটতেন। আবশ্যক হলে এদিকে রুগীরও সেবা করিতেন। বিরক্তির বা ক্লান্তির ভাব তাঁতে একেবারে ছিল না-সব সময়েই হাস্য মুখ। বাস্তবিক তুলসী মহারাজ বরাহনগর ও আলম বাজার মঠে নিজের শরীরের রক্ত জল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এবং বরাহনগরের মঠ ও আলম বাজারের মঠ সংগঠন ও একীভূত করিবার তিনি এক জন বিশেষ সহায়ক ছিলেন। এই কালে অপর সকলের তপস্যার বলে যেমন মঠের শক্তি সঞ্চয় হইয়াছিল, তেমনি তুলসী মহারাজের তপস্যা ও সেবার বলে মঠ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

(১০)

নির্মলং হৃদয়ং যস্য গুরোরাজ্ঞানুবর্তিণে।
নির্মলানন্দ পাদায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

(১১)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এক সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যখন ব্যাঙ্গালোরে যান, তখন তিনি কোন ভক্তকে স্বামী নির্মলানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"আমি তুলসী মহারাজের নিকট কত ঋণী তা তোমরা জান না। আমরা কাশীতে বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুলে সহপাঠী ছিলাম। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের কাছে আমার যাতায়াতের সব কথা একমাত্র তুলসী মহারাজই জানিতেন। আমি যখন এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ছিলাম তখন তিনি আমার কাছে প্রায়ই আসিতেন এবং অনেক দিন ধরিয়া থাকিতেন। চাকুরী ছেড়ে ঠাকুরের কাজ করিবার জন্য তিনি আমাকে গভীর প্রেরণা, এমন কি খুব চাপও দেন। আমি অবিবাহিত ছিলাম এবং কোন্ পথে চলবো তাহা গভীর ভাবে ভাবিতাম। আমি যখন এই বিষয়ে অতিশয় চিন্তাকুল, তখন ঠাকুর একদিন আমাকে কৃপা-পূর্বক দর্শন দিয়া বলেন, চাকুরী ছাড়িয়া আমার পতাকা বহন কর। পরদিন

প্রাতে তারযোগে আমি পদত্যাগ করি এবং আমার অধীনস্থ কর্মচারীকে কাজের ভার বুঝাইয়া দিয়া আলমবাজার মঠে ছুটিয়া যাই এবং সন্ন্যাসী হই। আমাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ গভীর সম্বন্ধ ও সৌহার্দ্য ছিল।”

(১২)

মালাবারস্থ হরিপাদ সমিতির সভাপতি শ্রীপদ্মনাভ ট্যাম্পিকে মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলিয়াছিলেন, “স্বামী নির্মলানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং কথামৃতে তুলসী নামে অভিহিত! উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীসুব্বারায় আয়ারকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৯১১ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে এই পত্র লিখেন।—“প্রিয় বন্ধু, তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছি। স্বামী নির্মলানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার অসামান্য চারিত্রিক নির্মলতার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নাম নির্মলানন্দ রাখেন। তিনি সমগ্র ভারতে ব্যাপক ভ্রমণ করিয়াছেন এবং হিমালয়ে প্রায় দ্বাদশ বৎসর তপস্যা করেন। চম্বা রাজ্যের মহারাজ তাঁহার এক শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আমাদের সংঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে প্রেরণ করেন। স্বামী নির্মলানন্দ আমেরিকায় এত সুন্দর ভাবে কাজ করেন যে, মার্কিণ ভক্তগণ তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন নাই। কোন জরুরী আহ্বানে তিনি স্বদেশের জাগরণার্থ কর্ম করিবার জন্য ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি কিছুকাল পূর্ববঙ্গ ও আসামে ধর্মপ্রচার করেন। অনন্তর তিনি ব্যাঙ্গালোরে প্রেরিত হন, তথা হইতে তোমরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ। ইতি—

শুভাকাংক্ষী—
রামকৃষ্ণানন্দ

দুই

বাল্যকথা

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে, সত্ত্বনিধি শ্রীহরির অবতারবৃন্দ সংখ্যাতীত। বাংলার ভক্ত-কবি জয়দেব ও কাশ্মীরের মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র ভাগবতোক্ত দশাবতারের সুন্দর স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। অবতার সমূহের মধ্যে রামকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা

সুবিদিত। যুগ-প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে উত্তর ভারতে অবতীর্ণ। তাঁহাদের লীলাকথা যথাক্রমে মহাকাব্যদ্বয় রামায়ণে ও মহাভারতে বিবৃত। এই দুই অবতার ভারতীয় ধর্মভাবের ঘনীভূত লীলা-মূর্তি। ইঁহারা একাধারে বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমন্বয়াচার্য, অবতার-বরিষ্ঠ ও সর্বধর্মস্বরূপ। তাঁহার যে সতের জন সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন তন্মধ্যে স্বামী নির্মলানন্দ অন্যতম। তৎশিষ্যবৃন্দের নেতৃস্থানীয় ছিলেন বেদান্তকেশরী পাশ্চাত্য-বিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী নির্মলানন্দ গুরুভ্রাতৃদ্বয় কায়স্থ জাতীয় দত্তবংশে কলিকাতায় ভূমিষ্ঠ হন এবং বাল্যবন্ধু ছিলেন।

পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত হুগলী জেলার মধ্যবর্তী বিঘাটি গ্রামে স্বামী নির্মলানন্দের পিতামহ ভৈরব দত্ত বাস করিতেন। তিনি কেকিষগোত্রীয় রাজা মানিক দত্তের অধস্তন সপ্তম পুরুষ ছিলেন। মানিক দত্তের পুত্র মুকুন্দ দত্ত, তৎপুত্র পুরুষোত্তম দত্ত, তৎপুত্র রামগোপাল দত্ত, তৎপুত্র রামচন্দ্র দত্ত, তৎপুত্র কালীচরণ দত্ত, তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত এবং তৎপুত্র ভৈরবচন্দ্র দত্ত। তাঁহার গৃহদেবতা ছিলেন রাধাকান্ত ও রাধারাণী। উক্ত দেবতাদ্বয়ের সুন্দর বিগ্রহ অদ্যাপি তাঁহার গৃহে রক্ষিত ও পূজিত হয়। ঐ মূর্তি যুগলের পাদমূলে ক্ষোদিত বাংলা লিপি হইতে জানা যায়, উহা ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। বংশীধারী রাধাকান্তের মূর্তি কৃষ্ণপ্রস্তরের এবং তৎপার্শ্বস্থা রাধারাণীর বিগ্রহ অষ্টধাতুতে গঠিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার দেবালয়ে শালগ্রাম বাণলিঙ্গের নিত্যপূজা হইত। গৃহদেবতা রাধাকান্ত হইলেও ভৈরবচন্দ্র শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ও শক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁহার গৃহে শারদীয়া ও বাসন্তী দুর্গাপূজা এবং দীপান্বিতা কালীপূজা অসামান্য সমারোহে সম্পন্ন হইত। জগদ্ধাত্রী পূজা ও দোলোৎসবের আয়োজনও তিনি করিতেন। এই সকল উৎসব উপলক্ষে বাজী পোড়ান ও নাটকাভিনয় চলিত। প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইত।

কোন গৃহ-বিবাদের জন্য ভৈরব দত্ত বিঘাটিতে পৈতৃক বাসগৃহ ছাড়িয়া কলিকাতায় বাগবাজার পল্লীতে ৩৭৲ টাকা মূল্যে একখণ্ড জমি কিনিয়া তথায় অস্থায়ী গৃহ নির্মাণপূর্বক বাস করিতে লাগিলেন। ভৈরব দত্তের ছয় পুত্র ছিল, তন্মধ্যে প্রথম পুত্রত্রয়ের নাম জানা যায় নাই। তাঁহার চতুর্থ পুত্রের নাম ব্রজলাল দত্ত। ব্রজলাল কলিকাতায় রেলী ব্রাদার্স দোকানের বড়বাবু ছিলেন।

তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, এবং চাকুরী হইতে অবসর লাভান্তে কাশীবাস করেন ও কাশীপ্রাপ্ত হন। ভৈরব দত্তের পঞ্চম পুত্রের নাম হরিনাথ দত্ত। হরিনাথের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। ভৈরবের ষষ্ঠ বা কনিষ্ঠ পুত্রের নাম দেবনাথ দত্ত, দেবনাথ অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও উদ্যমশীল ছিলেন। তাঁহার এত নাড়ীজ্ঞান ছিল যে, তিনি মুমূর্ষুর নাড়ী টিপিয়া মৃত্যুকাল নির্ণয় করিতে পারিতেন। হিন্দুদের গভীর বিশ্বাস এই যে, গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ হয়। সেইজন্য দেবনাথের নাড়ীজ্ঞানে ও ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিবেশীগণ অতিশয় উপকৃত হইতেন। উর্ধ্বগতি বা গঙ্গাযাত্রার কাল নির্দেশে তিনি সুদক্ষ ছিলেন বলিয়া শ্রদ্ধা-প্রীতি সহকারে লোকে তাঁহাকে গতি দত্ত বা গঙ্গা দত্ত বলিয়া ডাকিত। শিল্প-প্রতিভা ও সাহসিকতার বলে তিনি একটি ক্যাষ্টর অয়েল মিল, একটি আটার কল ও একটি সালফিউরিক এসিড ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। প্রথমটি তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে, দ্বিতীয়টি তাঁহার গৃহের সম্মুখস্থ জমিতে এবং তৃতীয়টি কলিকাতার উপকণ্ঠে দমদম সমীপে বাগজলা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। তৎপ্রতিষ্ঠিত এসিড ফ্যাক্টরী কলিকাতায় তথা বাংলা দেশে সর্বপ্রথম। ভাগ্যক্রমে তাঁহার সমস্ত শিল্প-প্রতিভা প্রচুর সাফল্যে সুমণ্ডিত হয়। সুদক্ষ, সফলকাম, শ্রীসম্পন্ন ও দানশীল ব্যক্তিরূপে তিনি পরিগণিত ও সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার বাগবাজারস্থ বাসগৃহে প্রশস্ত পূজামণ্ডপ ছিল এবং তথায় পুরুষানুক্রমে অনুষ্ঠিত দুর্গোৎসবাদি জাঁকজমক সহকারে সম্পন্ন হইত। আতিথেয়তা তাঁহার বংশগত কুলধর্ম ছিল এবং তাঁহার বহির্গৃহে অতিথি অভ্যাগত প্রায়ই আসিয়া থাকিতেন। কাশীধামে গণেশ মোহল্লাতেও তাঁহার একখানি বড় বাড়ী ছিল। তথায় তাঁহারা প্রতিবর্ষে যাইতেন।

কাশীধামের থাকমনি দেবীর সহিত তাঁহার শুভ-বিবাহ হয়। থাকমনি ধর্মপ্রাণা ও বুদ্ধিমতী গৃহকর্ত্রী ছিলেন। তাঁহার আগমনের পরেই দেবনাথের গৃহে শ্রী-সম্পদ বাড়িতে লাগিল। দেবনাথ ও থাকমনির ছয় পুত্র ও চারি কন্যা ছিল। তাঁহাদের ছয় পুত্রের নাম যথাক্রমে ভোলানাথ দত্ত, কালীদাস দত্ত, চুণীলাল দত্ত, কেদারনাথ, তারকনাথ ও তুলসীদাস দত্ত এবং চারি কন্যার নাম যথাক্রমে ভাবিনী, কুমুদিনী, মনোমোহিনী ও বিষ্ণুমণি। দেব-নাথের কনিষ্ঠ পুত্র তুলসীদাসই পরবর্তী কালে স্বামী নির্মলানন্দ নামে ভারত-

বিখ্যাত হন। দেবনাথ ১২৮৪ সালে ৯ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার চতুর্থী তিথিতে (২৩শে নভেম্বর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) বাগবাজারস্থ স্বকীয় ভবনে দেহত্যাগ করেন। ইনি মৃত্যুর পূর্বে চৌদ্দদিন গঙ্গাবাসান্তে গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। ভাগ্যবতী থাকমনি দেবী সধবা অবস্থায় ১২৮০ সালে ১৫ই পৌষ সোমবার শুক্লা একাদশী তিথিতে (১৮৭৩ খ্রীঃ, ৩০শে ডিসেম্বর) কাশীধামস্থ গণেশ মোহল্লাস্থ ভবনে কাশীপ্রাপ্ত হন। তিনি তুলসী দেবীর আরাধনার ফলে কনিষ্ঠ পুত্র লাভ করেন বলিয়া তাঁহার নাম রাখেন তুলসীদাস। কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম তুলসী চরণ, কিন্তু তাহা সত্য নহে। গৃহ-কোষ্ঠী দেখিয়া তুলসীদাস নাম রাখা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। সন ১২৭০ সালে ৯ই পৌষ (খ্রীষ্টীয় ১৮৬৩ অব্দে ২৩শে ডিসেম্বর) বুধবার শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে* রাত্রির প্রথম প্রহরে বিশ সংখ্যক বসুপাড়া লেনে স্বীয় পিতৃগৃহে তুলসীদাস ভূমিষ্ঠ হন। তুলসীর কোষ্ঠীবিচার করিয়া দেখা গেল, চন্দ্র তুঙ্গ স্থানে থাকায় তাঁহার জীবন চন্দ্রবৎ যশোজ্জ্বল হইবে, এবং ধর্মস্থানে বৃহস্পতি থাকায় তিনি ধর্মগুরুর পদ পাইবেন। কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া তিনি মাতা-পিতার অধিকতম স্নেহপাত্র ছিলেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহীন এবং চৌদ্দ বৎসরে তিনি পিতৃহীন হন। তজ্জন্য পঞ্চ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতেন না এবং তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। শুভ জন্ম, মুখশ্রী, উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় ও বুদ্ধিমত্তাদির জন্য তিনি পল্লীবাসীদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। অত্যন্ত আদরে লালিত পালিত হওয়ায় তাঁহার শরীর সবল ও সুদৃঢ় হয় নাই এবং বাল্যে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটে, নিয়মিত ঔষধসেবনেও তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি হইল না। স্বাস্থ্য ভগ্ন হইলেও তাঁহার মনোবল ও ইচ্ছাশক্তি হ্রাস পায় নাই; বরং বাড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর তেজোদ্দীপ্ত ছিল। সেই জন্যই তখনও কেহ তাঁহাকে কোন বিষয়ে বাধা দিতে সাহসী হইত না।

তুলসীদাসের মন্দ স্বাস্থ্য স্কুলে পড়িবার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার সম্পন্ন আত্মীয়-স্বজন প্রয়োজন অনুসারে কলিকাতায় ও কাশীধামে নিবাস করিতেন। প্রত্যেক বৎসর কয়েক মাস তাঁহারা কাশীধামেই

---

* কলিকাতাস্থ ফড়িয়াপুকুর পল্লীর শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদগণের জন্মতিথি সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্বামী নির্মলানন্দের জন্ম ৯ই পৌষ বলিয়া উহা পৌষের শুক্লা চতুর্দশী না হইয়া অগ্রহায়ণের শুক্লা চতুর্দশী হইবে।

কাটাইতেন। মাতার মৃত্যুর পরে তিনি মাতুলের অভিভাবকত্বে স্বীয় গৃহে থাকিয়া স্থানীয় স্কুলে লেখাপড়া করেন। কাশীধামের বাঙ্গালীটোলা হাই স্কুলে এগার বৎসর বয়সে তুলসী পড়িতে আরম্ভ করেন। মেধাবী বালক বিদ্যার্জনে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন এবং এক এক বৎসরে দুই দুই বৎসরের পাঠ শেষ করিলেন। হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। পরবর্তী কালে হরিপ্রসন্ন তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নামে সুবিখ্যাত হন। গৃহে তুলসী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং অচিরে উক্ত ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। বাল্যকালে তিনি কাশীধামে সংস্কৃতে যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ইহার ফলে সন্ন্যাস জীবনে বেলুড়মঠে, দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে এবং এমন কি, সুদূর নিউইয়র্কে গীতা উপনিষদাদি গ্রন্থের অধ্যাপনায় সমর্থ হন।

দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতগণের সহিত সংস্কৃত ভাষায় তিনি অনর্গল আলাপ করিতে পারিতেন। কাশীধামে অবস্থান কালে তিনি হিন্দী ভাষাও আয়ত্ব করেন।

তখন কাশীধামে সিদ্ধ পুরুষ ত্রৈলিঙ্গ স্বামী বাস করিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ত্রৈলিঙ্গ স্বামী সাক্ষাৎ শিব। বালক তুলসী তাঁহাকে কয়েক বার দর্শন করেন। ত্রৈলিঙ্গ স্বামী তখন মৌনী থাকিতেন। তুলসী অন্যান্য বালকের সহিত প্রায়ই তাঁহার কাছে যাইতেন এবং তৎপার্শ্বে খেলাধুলা করিতেন। ত্রৈলিঙ্গ স্বামী কখনও কখনও ক্রীড়ারত বালকবৃন্দকে তাড়াইয়া দিতেন। একদা তিনি অন্যান্য বালকের মধ্য হইতে তুলসীকে ইসারায় ডাকিলেন এবং মৃদু হাস্যে কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে একটু প্রসাদ দিলেন। তিনি মৌনী থাকিলেও মৃতবৎ ছিলেন না। একবার মহা পণ্ডিতগণ কোন জটিল সমস্যা সমাধানে অক্ষম হন। তাঁহারা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর নিকট যাইয়া উহার মীমাংসা প্রার্থনা করেন। স্বামিজী তাঁহাদিগকে একটি শ্লেট ও পেন্সিল আনিতে আদেশ দেন এবং উহা আনীত হইলে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর শ্লেটে লিখিয়া দেন।

তুলসী ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর সম্বন্ধে বা ধর্ম বিষয়ে তখন কিছুই জানিতেন না। তিনি আস্বাদন করিয়া দেখিলেন স্বামিজীপ্রদত্ত প্রসাদ সুমিষ্ট। তুলসী পরবর্তী জীবনে বলিতেন যে দীক্ষা বহুপ্রকারে হয়। তন্মধ্যে এক প্রকার দীক্ষা উদর মাধ্যমে। সম্ভবতঃ ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর নিকট উদর মাধ্যমে তিনি প্রথম দীক্ষা লাভ করেন। যখন তুলসী কাশীধামে ছিলেন তখন তাঁহার পিতা দেবনাথ

তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর শুক্রবার মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতার মৃত্যুর পরে তুলসী কলিকাতায় আসিয়া স্থানীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য পড়িতে আরম্ভ করেন।

ছাত্রজীবনে তিনি অনুভব করেন, উত্তম স্বাস্থ্য একটী অমূল্য সম্পদ। ঔষধসেবনে স্বাস্থ্যোন্নতি না হওয়ায় তিনি নিয়মিত দৈহিক ব্যায়াম আরম্ভ করেন। কয়েক মাসের মধ্যে তিনি অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, ব্যায়ামবিৎ ও স্বাস্থ্যবান্ হন। তিনি কলিকাতার স্বাস্থ্যহীন যুবকগণকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সতেরটি অবৈতনিক ব্যায়ামাগার সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করেন। ব্যায়ামাভ্যাসে একনিষ্ঠ হইলেও অধ্যয়নে তাঁহার অনুরাগ আদৌ কমিল না। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ক্যালকাটা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং অসামান্য বুদ্ধিমত্তার জন্য একটি সার্টিফিকেট ও মেডেল উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত তালচরের রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। উক্ত মেডেল অদ্যাপি কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মঠে রক্ষিত। ইহার একপীঠে লেখা আছে, হিজ হাইনেস্ দি রাজা অব তালচর মেডেল, শ্রীশ্রীসরস্বতী—বিদ্যাহি পরমং ধনম্। ক্যালকাটা স্কুল। ইহার অন্য পীঠে লিখিত আছে—This medal is awarded to Tulsidass Dutta by His Highness the Rajah of Talchor for general proficiency in the Entrance Examination of 1883.

বাগবাজারে তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে স্বামী তুরীয়ানন্দের বাড়ী ছিল। তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ ও তাঁহার পিতা তুলসীর গৃহের একাংশ ভাড়া লইয়া বাস করিতেন। স্বামী নির্মলানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও অখণ্ডানন্দ পরস্পর বাল্যবন্ধু ছিলেন। তুলসীর বাড়ীর উঠানে এই তিন বাল্যবন্ধু খেলাধূলা করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালও তুলসীর পৈতৃক ভবনের এক পাশে স্বীয় গৃহ নির্মাণ করেন।

কাশীধামে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তুলসীদাস কলেজে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য কলিকাতায় আসিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া তখন অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী স্বধর্মে বিশ্বাস হারাইয়াছিল। অনেকে নাস্তিক হইয়া উঠিল, অনেকে সন্দেহবাদী হইয়া পড়িল। কিন্তু কলেজে পড়িয়াও তুলসীদাস পাশ্চাত্য প্রভাবে অভিভূত হইলেন না। তিনি এমন এক গৃহে ভূমিষ্ঠ ও পালিত হন যাহা পুরুষানুক্রমে ধর্মনিষ্ঠ ছিল এবং যথায় নিত্য দেবতার

পূজারতি হইত। উহার পরিবেশে ধর্মভাব প্রবল থাকায় বাল্যকালে হইতেই উক্ত ভাগ্যবান বালক ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং প্রত্যহ ধ্যানাদি অভ্যাস করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার সুপ্ত সৎসংস্কাররাশি জাগ্রত হইল এবং তাহাকে অনুকূল পরিবেশে টানিয়া আনিল। কলেজে অধ্যয়নার্থ তাঁহার বাগবাজারে আগমন, অথবা তৎপূর্বে তাঁহার পিতামহ কর্তৃক কলিকাতার উক্ত পল্লীতে স্বগৃহ নির্মাণ বিধাতার শুভ ইঙ্গিত ছিল। বাগবাজারের প্রায় সব রাস্তা ও গলিতে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদধূলি পড়িয়াছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় প্রায়ই আসিয়া বলরাম বসু প্রভৃতির বাড়ীতে ভক্ত সঙ্গে বসিতেন। বলরাম, গিরিশ, হরিনাথ, তুলসীদাস, গঙ্গাধর, বৈকুণ্ঠনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ বাগবাজারেই বাস করিতেন। পরবর্তী কালে উক্ত পল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ-জননী শ্রীসারদা দেবীর লীলাস্থলে পরিণত হয়। কলেজে পড়িবার জন্য বাগবাজারে আসিবার পর তুলসী-দাসের জীবনে বিপুল পরিবর্তন উপস্থিত হইল। তুলসী-গঙ্গা রামকৃষ্ণ-সাগরে যাইয়া পড়িল।

তিন

গুরুলাভ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজার পল্লীর দীননাথ বসু ও বলরাম বসুর বাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন। এই দুই বাড়ী তুলসীদাসের পিতৃগৃহের সমীপবর্তী ছিল। তুলসী শৈশবে দীননাথ বসুর বাড়ীতে ঠাকুরকে প্রথম দেখেন। দ্বিতীয় দর্শন লাভ হয় ১৮৭৯ খ্রীঃ বলরাম বসুর বাটীতে। কেহ বলেন, আঠার বৎসর বয়সে এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তুলসী ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। সে যাহাই হউক, তখন হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধি পর্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল তাঁহার পূত সঙ্গ লাভের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলসী স্বহস্তে লিখিয়াছেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ তখন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নির্মলানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইংরাজী জীবনী প্রকাশের সময় ঠাকুরের সহিত

তাঁহার সাক্ষাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করেন। উক্ত অনুরোধের ফলে তুলসী মহারাজ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর ত্রিবান্দ্রম প্রবুদ্ধ কেরালম্ কার্যালয় হইতে তাঁহাকে যে পত্র লিখেন উহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"একদিন অপরাহ্নশেষে প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় যখন আমাদের পাড়ার কয়েকটী ছেলের সহিত আমি মাঠে খেলাধূলা গল্পগুজব করিতেছিলাম, তখন হঠাৎ সংবাদ রটিল যে প্রতিবাসী বলরাম বসুর বাটীতে এক পরমহংস আসিয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে আমার মনে হইল, 'আমিও যাইনা কেন ? ইনি কি রকম পরমহংস দেখা যাক।' আমাদের বাড়ী হইতে বলরাম বসুর বাটী মাত্র দুই মিনিটের রাস্তা। আমি গলায় একটি চাদর দিয়া তথায় ছুটিলাম। বলরাম বসুর বাড়ীর দোতলায় উঠিয়া দেখিলাম, বৈঠকখানা ও বারান্দা দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ। বৈঠকখানায় আর জায়গা ছিল না। আমি উঁকি মারিয়া দেখিলাম সুদীর্ঘ বৈঠকখানার মধ্যে একটী তোষকের উপরে কার্পেট পাতা ও একটী মোটা বালিস রাখা আছে ; কিন্তু পরমহংস তথায় নাই। তাঁহার আসনটী শূন্য পড়িয়া আছে। আমার বয়স তখন আঠার কি উনিশ বৎসর। আমি তরুণ এবং অপরিচিত বলিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না যে পরমহংস কোথায়। আমি পশ্চিম বারান্দায় যাইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। পাঁচ সাত মিনিট পরে দেখিলাম মাতালের মত টলিতে টলিতে একটি লোক গৃহমধ্য হইতে পশ্চিমের বারান্দা দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে পাঁড় মাতাল বলিয়া বোধ হইল। কাহারও দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি আত্মভাবে বিভোর ছিলেন। আমি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম সেখানে আসিয়া তিনি আমার দিকে প্রায় আধ মিনিট তাকাইয়া ধীরে ধীরে টলিতে টলিতে বৈঠকখানায় গেলেন। তিনি আমার সঙ্গে একটী কথাও বলিলেন না। আমি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং তাঁহাকে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেলাম। যখন তিনি বৈঠকখানায় ঢুকিলেন তখন আমার হৃদয়ে কি যেন একটা সুড় সুড় করিয়া উঠার মত বোধ হইল, এবং আমার আপাদমস্তক শরীর অসাড় হইয়া গেল। যখন আমার এই অদ্ভুত উপলব্ধি কমিল তখন আমি ছুটিয়া নিজগৃহে গেলাম, এবং কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সুস্থ হইলাম। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

"তখন আমি জানিতাম না যে, তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন এবং তাঁহার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। এই সাক্ষাতের ফলে আমি অনুসন্ধান করি নাই, তিনি কে এবং কোথায় থাকেন। আমার মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত গিরীশ ঘোষের সাক্ষাতের এক বৎসর বা তাহার কিঞ্চিৎ অল্পকাল পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি আমার জীবনের ঘটনাবলীর দিনলিপি রাখি নাই। সুতরাং তারিখ, মাস, বৎসর স্মরণ করিতে পারি না। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে মাধ্যাহ্নিক আহারান্তে আমি হরি মহারাজের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তিনি বাল্যকাল হইতে আমার পরম বন্ধু এবং তাঁহার গৃহ আমাদের গৃহের সন্নিকটে ছিল। তখন প্রায়ই পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইত।

"সেদিন তিনি বলিলেন, দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পরমহংসকে দেখি চল। আমি হরিনাথ ও গঙ্গাধর এবং আরও দুই একটি সঙ্গীসহ রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে বেড়াইতে যাইতাম। সেদিন আমরা বাগবাজার ঘাট হইতে নৌকায় চড়িয়া দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, ইনি অন্য কোন পরমহংস হইবেন এবং যাঁহাকে আমি বলরাম বাবুর বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম তিনি ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ ইতঃপূর্বে আমি তাঁহাকে রাসমণির কালীবাড়ীতে দেখি নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ পরমহংসদেব সেদিন তথায় ছিলেন না, কলিকাতায় গিয়াছিলেন।

"তাঁহার ঘরের দেওয়ালে যে সব দেবদেবীর ছবি ছিল সেগুলি আমরা দেখিতে লাগিলাম। তাঁহার একটি ফটো দেওয়ালে জলের জালার কাছে ঝুলান ছিল। হঠাৎ আমার দৃষ্টি উহার উপর পড়িল এবং আমি উহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। আমাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া হরিনাথ বলিলেন, ইহা পরমহংস-দেবের ফটো। আমি উত্তর দিলাম, আমি এঁকে দেখেছি। হরি মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায়? আমি বলিলাম, বলরামবাবুর বাটীতে, তিনি বলিলেন, ভাল কথা। উক্ত দিনের অল্পকাল পরেই আমি একাকী পদব্রজে বাগবাজার হইতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম। তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা বা বারটা হইবে। আমি বাহিরে অপেক্ষা না করিয়া সোজা পরমহংসদেবের ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, তিনি আহার করিতেছেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে মেজের উপর বসিলাম। ইহাই তাঁহাকে আমার প্রথম প্রণাম। আমি এত অজ্ঞ ছিলাম যে, তিনি যখন আহার করিতেছেন, তখন

তাঁহাকে প্রণাম করা বা তাঁহার পাশে বসা অনুচিত ইহা বুঝি নাই। সে যাহাই হউক, তিনি শিষ্টাচারের এই সকল ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিলেন না। আহার সমাপনান্তে তিনি মুখহাত ধুইয়া খাটে বসিয়া প্রশান্তবদনে পান তামাক খাইতে খাইতে আমার সঙ্গে সহাস্যে কথা বলিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ঘরে অন্য কেহ ছিল না। কেবল মাত্র শ্রীমা সারদা দেবী উত্তর বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিলেন তাঁহাকে খাওয়াইবার এবং তাঁহার অন্যান্য সেবা করিবার জন্য। উত্তর বারান্দা তখন বাঁশের টাট্টিতে ঘেরা ছিল। কয়েকটি প্রাথমিক পরিপ্রশ্নের পরে তিনি আমাকে হঠাৎ অদ্ভুত কিছু বলিলেন, যাহাতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম।

"তিনি বলিলেন, 'সেদিন তোমার মত একটি ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাঁর মধ্যস্থ হতে পারি কিনা।' আমি তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া ভাবিলাম—কেন এরূপ বাজে কথা বলিলেন। আমি নীরব থাকায় তৎক্ষণাৎ তিনি আমার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন—'না না, মধ্যস্থ শব্দের দ্বারা প্রেমস্বরূপ ভগবানের সহিত ভক্তের মিলনকে আমি নির্দেশ করেছিলাম। তিনিই গুরু, তিনিই সব, ঈশ্বরের সহিত তাঁর কোন প্রভেদ নাই।' আমি বুঝিলাম, ইহা তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণ করার ইঙ্গিত মাত্র। কিছুক্ষণ পরে তিনি খাট হইতে নামিয়া কৃপার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার বাম হস্ত আমার কাঁধে রাখিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন এবং আমাকে লইয়া ধীরে ধীরে পঞ্চবটীর দিকে চলিলেন। তথায় যাইতে যাইতে আমাকে গভীর স্নেহভরে বলিলেন—"এখানে মাঝে মাঝে এস।" তখন আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। পুণ্যস্থান পঞ্চবটীতে যাইয়া তিনি যথায় তপস্যা করিয়াছিলেন তথায় প্রণামান্তে নিম্নের সিঁড়িতে বসিলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া জগন্মাতার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার অর্ধস্ফুট কথাবার্তা কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি যে 'মা', 'মা' বলিতেছিলেন তাহা আমার কর্ণগোচর হইল এবং জানিলাম তিনি জগদম্বার সহিত কথা বলিতেছেন। একটু পরে তিনি পঞ্চবটী হইতে নিজ ঘরে ফিরিলেন। তখন আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

"এই ঘটনার পরে আমি মাঝে মাঝে কালীমন্দিরে যাইতাম, কখনও হরি মহারাজের সঙ্গে, কখনও বা একাকী। এতদ্ব্যতীত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন

বলরাম বসুর বাটীতে যাইতেন তখনও তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। ১৮৮৬ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে একদিন সংবাদ পাইলাম, পূর্বরাত্রে তাঁহার মহাসমাধি হইয়াছে, আমি তখনই কাশীপুর বাগানবাড়ীতে যাইয়া তাঁহার স্থূলদেহকে শেষ দর্শন করিলাম এবং তাঁহার পাদপদ্মে মাথা ঠেকাইলাম। অনন্তর কাশীপুর শ্মশান-ঘাটে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে রাত্রি দশটায় বাড়ী ফিরিলাম। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর তাঁহার অভাব গভীর অনুভব করিতাম এবং তাঁহাকে অন্তরের প্রার্থনা জানাইতাম। তিনি কৃপাপূর্বক আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া আর একরূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। সেই স্বামীজীই আমার জীবনসর্বস্ব, আমার জীবনদেবতা, সন্ন্যাস, বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যাদি যাহা কিছু পাইয়াছি—সে সব তাঁহারই অসীম করুণায়। আমি ঠাকুর ও স্বামীজীকে অভিন্ন জ্ঞান করি। যখন আমি ঠাকুরের কাছে যাইতাম তখন স্বামিজীর সহিত পরিচিত হই নাই। আমি তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে কয়েকবার মাত্র দূর হইতে দেখিয়াছিলাম। এই প্রেমমূর্তি করুণাময় মহাপুরুষের কৃপা-লাভের সৌভাগ্য আমার কিরূপে হইয়াছিল তাহা এক সুদীর্ঘ কাহিনী। যদি সুযোগ পাই অন্য সময় তাহা বিবৃত করিব। বরাহনগরে রামকৃষ্ণমঠ স্থাপিত হইবার দুই তিন মাস পরে তিনি আমাকে গৃহ হইতে টানিয়া আনিয়া উক্ত মঠে স্থান দিলেন।"

উক্ত পত্রে স্বামী নির্মলানন্দ এই সকল কথা ঠাকুরের নূতন জীবনীর অন্তর্ভুক্ত করিতে নিষেধপূর্বক সামান্যভাবে উল্লেখ করিতে লিখিয়াছিলেন। এই পত্রের কিয়দংশ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে ১৯৩৬ খ্রীঃ প্রকাশিত শ্রীরাম-কৃষ্ণের জীবনী নামক ইংরাজী পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণে ৪৮৩-৪৮৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত। ১৯২৮ খ্রীঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী স্বামী নির্মলানন্দ কাশীধামস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ছিলেন। উক্ত দিন স্বামী অতুলানন্দ, স্বামী জগদানন্দ, স্বামী বিশ্বরূপানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ তাঁহাকে তুরীয়ানন্দ-স্মৃতিকক্ষে প্রণামপূর্বক তৎসমীপে উপবেশন করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, তিনি বাল্যকালে কাশীধামে লালিত পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া সমবেত সন্ন্যাসিগণের মধ্যে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামিজী, তা'হলে আপনি কিরূপে ঠাকুর স্বামিজীর সাক্ষাৎলাভের সুযোগ পাইলেন ?'

তদুত্তরে স্বামী নির্মলানন্দ বলিলেন, "প্রথমে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিয়াছিলাম, স্বামী বিবেকানন্দের নিকট নহে। এমন কি, তখন আমি স্বামিজীর সঙ্গে পরিচিত হই নাই। এখানকার লেখাপড়া শেষ করিয়া আমি কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতায় যাই। এখন সান্ন্যাল মহাশয়ের গৃহ যথায় অবস্থিত সেই স্থান তোমরা দেখেছ। আমাদের পৈত্রিক ভূসম্পতির উহা এক ক্ষুদ্র অংশ। নিবেদিতা লেন ও সেই পাশের পুকুরটী তখন আমাদের ছিল। এখন বসুপাড়া লেনে বসুগণ কর্তৃক অধিকৃত গৃহের সম্মুখে যে চতুষ্কোণ ময়দান আছে তথায় আমরা বাল্যকালে খেলিতাম, উক্ত স্থানে খেলিতে খেলিতে একদিন আমরা শুনিলাম, নূতন কায়স্থদের বাড়ীতে এক পরমহংস আসিয়াছেন। বলরাম বসু অল্পদিন পূর্বে সেই বাড়ী বাঁড়ুজ্জেদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন, সেইজন্য উক্ত বাড়ী এই নামে অভিহিত ছিল। তৎক্ষণাৎ ক্রীড়ারত বালকগণ ছুটিয়া গেল। আমিও নিজ গৃহে ছুটিয়া গেলাম এবং একখানি চাদর গায়ে দিলাম। কারণ, তখন আমি বসুদের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলাম না। অনন্তর আমি বলরাম বসুর বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম, উহার দ্বিতলে লম্বা হল ঘরটি জনপূর্ণ। উক্ত হলের মধ্যস্থলের একটি ছোট তোষকের উপর একটি কার্পেট পাতা ছিল। কার্পেটের উপর কয়েকটি বালিশ রক্ষিত। তখন পরমহংস তথায় ছিলেন না। আমি ১৭।১৮ বৎসরের বালক বলিয়া হল মধ্যে যাইতে সাহস করিলাম না; কারণ, আমাদের পল্লীর বহু বয়স্ক ব্যক্তি তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। হলের পশ্চিম পার্শ্বে যে বারান্দা আছে উহাতে হেলান দিয়া দাঁড়াইলাম। শুনিলাম পরমহংস অন্দর মহলে গিয়াছেন, যাহাতে উক্ত গৃহের মহিলাবৃন্দ তাঁহাকে দর্শন ও প্রণামের সুযোগ পান। একটু পরে আমি দেখিলাম, গেরুয়া রঙ্গের গামছা পরা একব্যক্তি চামড়ার চটি জুতা পায়ে দিয়া পায়খানার দরজা হইতে আমার দিকে আসিতেছেন। মনে হইল তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অর্ধনিমীলিত এবং কোন দিকে দৃষ্টি নাই—যেন তিনি কোন নেশার ঘোরে আছেন। তাঁহার পশ্চাতে কয়েক জন লোক ছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে চিনিতাম না। আমি যেখানে দণ্ডায়মান ছিলাম হঠাৎ তিনি সেখানে আসিলেন এবং আমার দিকে তাকাইলেন। অনন্তর তিনি হলঘরে ঢুকিলেন। আহা! সেই মুহূর্তে আমি আপাদমস্তকে একটি অলৌকিক শিহরণ অনুভব করিলাম এবং আমার কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। আমি নিজ গৃহে ছুটিয়া যাইয়া বিছানায়

শুইয়া পড়িলাম। আমি ভাবিলাম, উঃ! এ কি রকম পরমহংস!! আমি আর তাঁহার কাছে যাইব না। ইহাই আমার ভাগ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন-লাভ।”

অনন্তর সমবেত সাধুগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী নির্মলানন্দ বলিলেন, “হরি মহারাজ আমাদের পাড়ার লোক ছিলেন। আমি শুনেছিলাম তিনি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস-এর নিকট যাইতেন; কিন্তু আমি তখনও জানিতাম না যে এই পরমহংসই দক্ষিণেশ্বরের। এক একাদশী তিথিতে, সম্ভবতঃ রবিবার, আমাকে তিনি বলিলেন “এস, আমরা গঙ্গা স্নানে যাই। তথা হইতে আমরা দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে দেখিতে যাইব।” তৎকালে তুরীয়ানন্দ একাদশীর দিনে উপবাসী থাকিতেন এবং রাত্রিতে জলযোগ করিতেন। তাঁহার সঙ্গে আমি গঙ্গায় গেলাম এবং স্নানান্তে তিনি যে নৌকা ভাড়া করিলেন তাহাতে চড়িয়া আমরা উভয়ে এবং অন্য কয়েক জন মিলিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় যাইয়া দেখিলাম শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যত্র গিয়াছেন। তুরীয়ানন্দজী এবং অন্য সকলে তথায় ইতঃপূর্বে গিয়াছিলেন। আমরা চারিদিকে বেড়াইয়া মন্দিরাদি ও বাগানবাড়ীর দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি দেখিলাম। সন্ধ্যার পরে বাড়ী ফিরিবার পূর্বে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলাম। ঘরের মধ্যে দেওয়ালে অনেক ছবি ঝুলান ছিল। যেখানে জলের জালা থাকিত তথায় শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ফটোগ্রাফ্ ঝুলান ছিল। উক্ত ফটো দেখাইয়া তুরীয়ানন্দজীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা কাহার ফটো? তিনি উত্তর দিলেন, উহা শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্র। আমি মন্তব্য করিলাম যে, আমি তাঁহাকে ইতঃপূর্বে বলরাম বসুর বাড়ীতে দেখিয়াছি, ইহা শুনিয়া তিনি উৎফুল্ল বদনে বলিলেন, তবে ত তুমি তাঁকে পূর্বে দেখেছ।”

ঠাকুরের শিষ্যদের সন্ন্যাসগ্রহণ সম্বন্ধে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে উক্ত দিন স্বামী নির্মলানন্দ বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের দেহত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে গৃহ হইতে টানিয়া আনিয়া বরাহনগর মঠে লইয়া গেলেন। কয়েক-দিবস যাতায়াত করিবার পর স্বামিজী বলিলেন, “কোথায় আর যাবে? এখানেই থাক।” তখন হইতে বরাহনগর মঠে রহিয়া গেলাম। অনন্তর স্বামিজী একদিন মহানির্বাণ তন্ত্র হইতে সন্ন্যাসগ্রহণের আবশ্যকীয় মন্ত্রাদি সংগ্রহপূর্বক বিরজাহোম করিয়া নিজে সন্ন্যাস লইলেন এবং আমাদের সকলকে সন্ন্যাস

দিলেন। রাখাল, শরৎ, শশী, লাটু, বুড়ো গোপাল, কালী, বাবুরাম প্রভৃতি আমরা সকলে স্বামিজীর নিকটেই সন্ন্যাস লইলাম, কিছুকাল পরে তারক, হরিপ্রসন্ন, নিরঞ্জন ও সারদা ঠাকুরের ঘরে নিজে নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামিজী আমাদের সন্ন্যাস নামকরণও করেন। তিনি শশীর নাম রামকৃষ্ণানন্দ রাখেন এবং বলেন, "আমি নিজেই এই নাম নিতে চেয়েছিলাম; কিন্তু শশীরই এই নাম হওয়া উচিত, কারণ সে ঠাকুরকে সর্বাপেক্ষা বেশী সেবা করেছে।" কথাপ্রসঙ্গে সেদিন স্বামী নির্মলানন্দ বলিয়াছিলেন যে ঠাকুরের সহিত দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের সময় তিনি ঠাকুর ও শ্রীমা উভয়কে একত্রে দর্শন করেন। তিনি বলিলেন, "প্রথম দর্শনের অল্পকাল পরেই আমি একদিন একাকী বাড়ী হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া গেলাম। যখন আমি কালীমন্দিরে পৌঁছিলাম তখন ১১৷৷৹ অথবা ১২টা হইয়াছিল। আর কোথাও না যাইয়া আমি সোজা পরমহংসদেবের কক্ষে গেলাম এবং তাঁহাকে মধ্যাহ্ন ভোজন করিতে দেখিলাম। তাঁহাকে প্রণামান্তে খাটের পাশে তাঁহার সম্মুখে বসিলাম। আমি তখন এত অজ্ঞ ছিলাম যে তিনি যখন খাইতেছেন তখন তাঁহাকে প্রণাম করা বা তাঁহার কাছে বসা অনুচিত তাহা বুঝি নাই। ইহাই তাঁহাকে আমার প্রথম ভূমিষ্ঠ প্রণাম। সে যাহা হউক এই শিষ্টাচারের ব্যতিক্রম তিনি লক্ষ্য করিলেন না। হাসিতে হাসিতে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলিলেন। তাঁহার আহার শেষ হইলে নহবতের দিকের বারান্দা হইতে একটি মহিলা আসিয়া আসন ও থালাদি সরাইয়া লইলেন। তখন ঘরে অন্য কেহ ছিল না। আমি বালকমাত্র ছিলাম বলিয়া তিনি নিঃসংকোচে ঘরে আসিয়া নিজ কার্য করিলেন। পরে আমি জানিয়াছিলাম তিনিই শ্রীমা সারদা। আহারান্তে হাত-মুখ ধুইয়া ঠাকুর প্রফুল্লবদনে খাটে বসিলেন, এবং পান তামাক খাইতে লাগিলেন। কতিপয় প্রাথমিক কথাবার্তার পরে তিনি হঠাৎ এমন কিছু বলিলেন, যাহাতে আমি চমৎকৃত হইলাম। তিনি বলিলেন, "তোমার মত দেখতে একটি বালক সেদিন এখানে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি তাহার ঘটক হইতে পারি কিনা।" আমি তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতে লাগিলাম, তিনি কেন এরূপ অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করিলেন! আমি নীরব থাকায় তিনি আমার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন, "না, না, ঘটক শব্দের অর্থ তিনি, যিনি প্রিয় প্রভুর সহিত ভক্তের মিলন ঘটায়, তিনি গুরু, তিনিই সব, তিনি ও ঈশ্বর অভিন্ন।" আমি বুঝিলাম

তাঁহাকে গুরুরূপে গ্রহণের উহা অস্পষ্ট ইঙ্গিত। কিয়ৎকাল পরে তিনি খাট হইতে নামিয়া আসিলেন এবং অনুগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ আমার কাঁধে বাম হাত রাখিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া ধীরে ধীরে পঞ্চবটীর দিকে চলিলেন। তিনি ঝাউতলার দিকে বাহ্যে গেলেন এবং রামলাল বা অন্য কেহ তাঁহার সঙ্গে গেলেন। ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া সুকোমল কণ্ঠে আমাকে বলিলেন, 'মাঝে মাঝে এখানে এসো।' উহাতে আমার হৃদয় নির্মল আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। পঞ্চবটীতে যাইয়া তাঁহার সাধনার স্থানকে (পঞ্চবটীর আসনকে) প্রণামপূর্বক তিনি নীচের সিঁড়িতে বসিলেন। অনন্তর তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া জগন্মাতার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। অস্ফুট মা, মা শব্দ শুনিয়া আমি বুঝিলাম, তিনি জগজ্জননীর সহিত ভাবমুখে কথা বলিতেছেন। তাঁহার কথার কোন কোন শব্দের অর্থবোধও আমি করিলাম। অল্পক্ষণ পরে সন্ধ্যা সমাগমে তিনি স্বীয় কক্ষে ফিরিলেন। তখন আমি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্বক গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "আবার এসো।" কোন সাধু প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, ঠাকুর আর কি কি বলেছিলেন?" স্বামী নির্মলানন্দ উত্তর দিলেন, "ঐ সব কথা ব্যক্তিগত। তোমরা ঐ সব কথা জানিতে চাও কেন? ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আহা! মানব গুরু মন্ত্র দেয় কানে, জগৎগুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে!' তিনি আরো অনেক কিছু বলেছিলেন; কিন্তু কি সে সব গুহ্য কথা তাহা জানিবার কি অধিকার জগতের আছে? ঐ সব জানিয়া তোমাদের কি লাভ?" উক্ত দিন স্বামী নির্মলানন্দ আরও যে দুটী কথা বলিয়াছিলেন তাহা অন্যত্র পাই নাই। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "কাশীপুরে ঠাকুর একবার কালীপূজা করিয়া আমাদিগকে প্রসাদ দিলেন সারদানন্দজী তখন তথায় ছিলেন না। পরদিন তিনি যখন আসিলেন, তখন তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হইল। একদিন ব্রাহ্মসমাজের বহু ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতে আসেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে গুহ্যতত্ত্ব বলিতেছিলেন। ব্রাহ্ম ভক্তবৃন্দকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "মাঝে মাঝে নির্জনে যাইয়া স্বপাক নিরামিষ আহার করবে এবং একমনে ঈশ্বরকে ডাকবে।" স্বামী অখণ্ডানন্দ পূর্ব হইতেই স্বপাক হবিষ্যান্ন খাইতেছিলেন। ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমি অনেক দিন থেকেই এরূপ করছি।" তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে

বলিলেন, 'তুমি এরূপ করবে কেন? স্বাভাবিক আচরণ তোমার কর্তব্য।' শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তুলসী মহারাজের প্রথম ও দ্বিতীয় দর্শনের বিবরণ বিস্তৃত-ভাবেই বিবৃত হইল। ইহার পর তিনি মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাইতেন। কখনো একাকী, কখনো বা হরি মহারাজের সহিত। পরবর্তীকালে স্বামী নির্মলানন্দ বলিয়াছিলেন, এইরূপে কয়েক বার দর্শনলাভের পর আমি ঠাকুরের নিকট দীক্ষা বা উপদেশ লাভে ধন্য হইলাম। যখন তিনি বলরাম বসুর বাড়ীতে আসিতেন, আমি তাঁহার কাছে প্রায়ই যাইতাম। কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে যখন তিনি অসুস্থ হইয়াছিলেন আমি সেখানেও প্রায়ই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতাম। পূর্বরাত্রে তাঁহার মহাসমাধির কথা পরদিন বৈকালে খবর পাইয়া আমি তৎক্ষণাৎ কাশীপুরে যাইয়া শেষবার তাঁহার স্থূলদেহ দর্শন করি এবং তাঁহার পাদপদ্মে মস্তক নত করি। অনন্তর কাশীপুর শ্মশানঘাটে তাঁহার শবদাহ দেখিয়া রাত্রি দশটায় বাড়ী ফিরি।" অন্যত্র স্বামী নির্মলানন্দ বলিয়া-ছিলেন, "অনেক সময় ঠাকুর কৃপাপ্রার্থীর সম্মুখে নীরব থাকিয়া করুণা কটাক্ষ দ্বারা শক্তি সঞ্চারিত করিতেন। তাঁহার এই দিব্য স্পর্শ অনুভব করিবার পরম সৌভাগ্য আমারও হইয়াছিল।" এইরূপে স্বামী নির্মলানন্দ ১৮৮২ খ্রীঃ হইতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বৎসর ঠাকুরের পূত সঙ্গ লাভে ধন্য হন।

চার

সাক্ষাৎ শিষ্য

পূর্ব অধ্যায়ে যে বিবরণ প্রদত্ত হইল তাহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে স্বামী নির্মলানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন। স্বামী নির্মলানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে নিখিলবঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ মহোৎসবে যে ভাষণ দেন তাহা 'ভারত' পত্রিকায় ১৩৪১ সালে ১লা আষাঢ় প্রকাশিত হয়। উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—"সাম্প্রদায়িকতা ও তজ্জাত ধর্মোন্মত্ততা শান্তিপূর্ণা এই সাগরাম্বরা সুবিস্তৃতা ধরণীকে বারংবার অশান্তির

মহাবাত্যায় বিক্ষোভিত করিয়াছে। অসার গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতা মানবজাতির মধ্যে নানা বিরোধ উপস্থিত করিয়া পরস্পরকে বিদ্বেষানলে বিদগ্ধ করিয়াছে। স্রষ্টার কর্ণে সেই অশান্তিসম্ভূত আর্তনাদ নিশ্চয়ই পৌঁছিয়াছিল। নতুবা 'যত মত তত পথ' রূপ অপূর্ব নতুন মতের প্রবর্তক, জগতের যাবতীয় বিভিন্ন ধর্মমতের সামঞ্জস্যবিধানকারী শ্রীরামকৃষ্ণরূপ পুরুষোত্তমের আবির্ভাব কেন হইল, যাঁহার বিশাল হৃদয় জগতের সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেক মানবের আপন ইষ্টলাভের পথ এমন ভাবে সুগম করিয়া দিয়াছে যে বিরোধ বা বিদ্বেষের অবকাশ নাই।

সত্য সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে সত্যযুগের পুনরভ্যুদয় হইয়াছে, তাঁহার ধর্মমত উদার, সার্বভৌমিক ও বিশ্বজনীন। আমরা যে সম্প্রদায়ভুক্তই হই না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার জ্ঞানালোকপাতে আমাদের ধর্মপথ সুগম হইবে সুনিশ্চিত। তাঁহার অভূতপূর্ব সাধনা, অপূর্ব ত্যাগ-বৈরাগ্য, অলৌকিক তপস্যার পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। এমন কি, তাঁহার জীবন্ত বিগ্রহ অনেকেই দেখিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণতলে বসিয়া অনেক বিভিন্ন মতের সাধক আপন আপন ইষ্টলাভের সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহার ভাগবতী তনুতে সচ্চিদানন্দময়ীর অধিষ্ঠান হইয়াছিল। ধর্ম, পবিত্রতা ও আনন্দ উহাতে প্রকট ছিল। শিশুর ন্যায় অনাবিল মন লইয়া, মাতৃস্নেহের ন্যায় পবিত্র প্রেম লইয়া তিনি জগৎকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সর্বদাই ব্যগ্র ছিলেন। জ্ঞানী-মূর্খ, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, সাধু-পতিত সকলেই তাঁহার নিকট সমান ভালবাসা পাইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সাধক তাঁহার সান্নিধ্যে গিয়া তাঁহার বিগ্রহে নিজ নিজ ইষ্টমূর্তির প্রকাশ দেখিয়াছেন। তিনি গভীর নিষ্ঠার সহিত প্রচলিত ধর্মমতসমূহ নিজে আচরণ করিয়া সকল ধর্মের সারতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'—এই সত্য তাঁহাতে মূর্ত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্রোতস্বিনীর ন্যায় জগতের বিভিন্ন ধর্মমতসমূহ এই সমন্বয়-মহাসাগরে মিলিত হইয়া যে মহাধর্মতরঙ্গ উত্তোলন করিয়াছে তাহার প্রেমের প্লাবনে সমগ্র মানবজাতি নিশ্চয়ই একদিন ভাসিবে। শ্রীভগবান্ এক, অনন্ত তাঁহার রূপ, অনন্ত তাঁহার নাম। ধর্মের চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার হয়—ধর্ম পার্থিব জিনিষের মত নেওয়া যায়, দেওয়া যায়। ধর্ম সত্য, ঈশ্বর সত্য। ত্যাগের দ্বারা চরিত্র গঠন করিলে ও পবিত্রতার দ্বারা মন শুদ্ধ করিলে ধর্মের উপলব্ধি হয়। ধর্ম জাগ্রতভাবে মানুষকে

আহ্বান করে ও মানুষকে আপন স্বরূপ বুঝাইয়া দেয় এবং মানুষকে দেবতা করে। সমন্বয়াচার্যদেবের এই সকল পুণ্যময়ী মহাবাণী জগতের সমস্ত ধর্মবিদ্বেষ ও ধর্মবিরোধিতা সমূলে বিনাশ করিবে ও জীবকে শিব করিয়া তুলিবে। তাঁহার সাধনসিদ্ধ উপদেশ-মঞ্জুষা হইতে যে সকল তত্ত্বকথা মানবের কল্যাণে তিনি বিতরণ করিয়াছেন তাহা জগতের অনেক অজ্ঞান, অবসাদ ও আর্তি নষ্ট করিবে। তাঁহার উপদেশবাণীতে ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব সহজবোধ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ। সেই বাণী সকল ধর্মমতাবলম্বীগণের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই জ্ঞানোদ্দীপক, সকলেরই সহায়ক। পূর্ব পূর্ব আচার্যগণের শিক্ষা-দীক্ষার রত্নভাণ্ডারের মধ্যমণিসমূহ অভিনব সাধনালোকে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হইয়া তাঁহার বাণীতে উজ্জ্বলতর ও জীবন্ত।

তিনি একাধারে জগতের যাবতীয় অবতার পুরুষের প্রতিনিধিরূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞান-ভক্তি-কর্মরূপ তিনটি আপাতঃপ্রতীয়মান বিভিন্ন পথের অপরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে সকলকে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথের প্রশস্ত দ্বার আজ সকল ধর্মাবলম্বী-গণের জন্যই উন্মুক্ত।

আমরা চাই, এই মহাধর্ম-সাগর-সঙ্গমে মিলিত হইয়া শুদ্ধ হই, পবিত্র হই। জগতের সমস্ত ধর্মবিদ্বেষ, মতানৈক্য ও বিরোধিতা চিরদিনের মত কালসাগরে নিমজ্জিত হউক। মহাবীর শ্রীবিবেকানন্দ আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-পতাকা লইয়া জগতের দ্বারে দণ্ডায়মান।”

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পর বরাহনগরে আদি মঠ স্থাপিত হইলে তুলসী-দাস উহাতে যোগদান করেন এবং অন্যান্য গুরুভাইদের সহিত সন্ন্যাস গ্রহণান্তে স্বামী নির্মলানন্দ নামে অভিহিত হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে বরাহনগর মঠ স্থাপনের সময় হইতে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ বৎসর সমগ্র রামকৃষ্ণ সংঘে তিনি ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যরূপে সর্বসম্মতিক্রমে পরিগণিত ছিলেন। শ্রীমহেন্দ্র-নাথ গুপ্ত “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত” গ্রন্থের প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত লিখিয়াছেন। ঠাকুরের প্রধান প্রধান ভক্তের নাম উহাতে লিপিবদ্ধ। তন্মধ্যে তুলসীর নাম উল্লিখিত।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের যে প্রামাণ্য ইংরাজী জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, উহার ১৫৬-১৫৭ পৃষ্ঠায় যে সতের জন

ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যরূপে উল্লিখিত তন্মধ্যে স্বামী নির্মলানন্দ অন্যতম। উক্ত গ্রন্থের ১২৭ পৃষ্ঠায় আছে, যাঁহাদের লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ প্রথম গঠিত হয় তন্মধ্যে তুলসী মহারাজ অবিসংবাদিতভাবে একজন। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন' নামক যে গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় লিখিয়াছেন উহার ইংরাজী অনুবাদ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ঠাকুরের শিষ্যবৃন্দের যে তালিকা প্রদত্ত তাহাতেও তুলসী মহারাজের নাম দৃষ্ট হয়। স্বামী বিবেকানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য বেলুড়মঠবাসী জ্ঞান মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার এবং ঠাকুরের সতের জন সন্ন্যাসী শিষ্যের ফটো একত্রে বেলুড় মঠ হইতে বহু বৎসর পূর্বে প্রকাশ করেন। উহাতে স্বামী নির্মলানন্দের ছবি প্রদত্ত। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড়মঠের সম্পাদক কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসীবৃন্দের যে ইংরাজী তালিকা মঠে বিতরণার্থ প্রকাশিত হয় তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের নামগুলি অপেক্ষাকৃত বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত আছে, তথায় স্বামী নির্মলানন্দের নাম তদনুযায়ী বড় বড় হরফে ছাপা আছে।*

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরের জন্মোৎসবের সময় স্বামী শিবানন্দ বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। উক্ত কালে বেলুড়মঠের অধুনালুপ্ত গোলাপ বাগানে রামকৃষ্ণ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের নিদর্শন স্বরূপ একটি তাম্র ফলক ভূগর্ভে প্রোথিত হয়। তখন স্বামী বিজ্ঞানানন্দও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ফলক প্রায় এক ফুট লম্বা ও চওড়া ছিল এবং উহাতে বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজী তিন ভাষায় ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন ও শিষ্যবৃন্দের নামগুলি খোদিত আছে। উহাতে স্বামী নির্মলানন্দের নাম ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যরূপে উল্লিখিত। বর্তমান সুবৃহৎ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন কালে ঐ ফলক তুলিয়া গর্ভমন্দিরের নীচে পুনরায় প্রোথিত হইয়াছে। উক্ত ঘটনা ও ফলকের অনেক প্রত্যক্ষদর্শী অদ্যাপি জীবিত।

স্বামী সুবোধানন্দ স্বামী নির্মলানন্দকে প্রণাম করিতেন এবং স্বামী নির্মলানন্দ

---

* (১) সন ১৩৬১ সালে ৭ই ফাল্গুন দেশ সাপ্তাহিকে শ্রীসরলাবালা সরকার কর্তৃক লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সূচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত দ্বারা লিখিত ও 'ভারত' পত্রিকায় ১৩৪৪ সালে বৈশাখ মাসে প্রকাশিত 'কোন্‌টি সত্য' (রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাসের এক অধ্যায়) প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

অন্যান্য গুরুভ্রাতার ন্যায় স্বামী সুবোধানন্দকে 'খোকা' বলিয়া ডাকিতেন। স্বামী সারদানন্দ স্বামী নির্মলানন্দকে 'ভাই তুলসী' বলিয়া পত্রে সম্বোধন করিতেন এবং দুজনে এক হুঁকায় তামাক খাইতেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ বেলুড়মঠের অধ্যক্ষ ও স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি ১৯২৪ খ্রীঃ ২৭শে মে বেলুড়মঠ হইতে স্বামী নির্মলানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "আপনারা ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যও ত কয়েকজন মাত্র আছেন। আপনাদের সঙ্গে আমাদেরও টানিয়া লইয়া ঠাকুরের কাছে চলুন।" ১৯১২ খ্রীঃ স্বামী বিরজানন্দ কর্তৃক মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী জীবনীর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থের ৩৮৮—৩৮৯ পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের যে নাম-তালিকা প্রকাশিত তাহাতে স্বামী নির্মলানন্দের নাম আছে কিন্তু বিজ্ঞানানন্দের নাম নাই। ১৯০৮ সালের জুলাই মাসে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত ইংরাজি মাসিক 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার মলাটের চতুর্থ পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের দশজন সন্নাসীশিষ্যের গ্রুপ্ ফটো বিক্রয়ার্থে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত—উহাতেও স্বামী নির্মলানন্দের নাম অন্যতম।

১৯০১ খ্রীঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে বেলুড়মঠের ট্রাষ্টিদের প্রথম অধিবেশন হয়। উহাতে স্বামী প্রেমানন্দ প্রস্তাব করেন যে, স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী নির্মলানন্দ যথাক্রমে বেলুড়মঠের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হউন। স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক সমর্থিত হইলে উক্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বেলুড়মঠের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দও স্বামী নির্মলানন্দকে স্বীয় গুরুভ্রাতারূপে স্বীকার করিতেন। তিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর স্বামী নির্মলানন্দকে যে Power of Attorney (পাওয়ার অব এটোর্ণি) দেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"To all to whom these presents shall come. I, Swami Brahmananda, chela and disciple of Thakur Paramhansa Ramkrishna, of the sect of sannyasis at present residing in Ramkrishna Advaita Ashrama, Mohalla Luxa, in the city of Benares in the United Provinces of Agra and Oudh send greetings, whereas I cannot personally transact all business in connection with the Ramkrishna Ashrama situated in Southern India and more especially in Madras Presidency

and Bangalore, I am desirous of constituting and appointing a General Attorney on my behalf. Now know ye and these presents witnesseth that I the said Swami Brahmananda do hereby nominate, constitute and appoint Swami Nirmalananda —chela and disciple of Thakur Paramhansa Ramkrishna at present in charge of the Ramkrishna Ashrama, Bangalore city, to be my lawful and true Attorney for me and on my behalf to ask, demand and sue, etc."

উহার অনুবাদ—"আমি স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের চেলা ও শিষ্য এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত, বর্তমানে আগ্রা ও অযোধ্যায় যুক্ত প্রদেশে কাশীধামে লাক্ষা মোহল্লায় রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে আছি। দক্ষিণ ভারতে এবং বিশেষতঃ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও বাঙ্গালোরে অবস্থিত সমস্ত রমাকৃষ্ণ আশ্রম সংক্রান্ত কাজকর্ম স্বয়ং সম্পাদনে অসমর্থ। সেজন্য আমি আমার প্রতিনিধি স্বরূপ একজন সাধারণ এটোর্ণি নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি এবং সেই হেতু ঠাকুর পরমহংস রামকৃষ্ণের চেলা ও শিষ্য এবং বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী নির্মলানন্দকে আমার আইনসঙ্গত ও অবিসংবাদিত এটোর্ণি করিলাম, উল্লিখিত আশ্রম সমূহের নিমিত্ত দাবী ও মামলা প্রভৃতি কাজ কর্ম পরিচালনের জন্য।"

স্বামী নির্মলানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণ পরস্পরকে গুরুভ্রাতা বলিয়া ভাবিতেন, এবং প্রগাঢ়ভাবে ভালবাসিতেন। ১৯৩২।৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নির্মলানন্দের সহিত বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষগণের মোকদ্দমা চলিতেছিল তখন বেলুড়মঠের সন্ন্যাসিগণ বাঙ্গালোর সহরে একটি ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতেন এবং বাঙ্গালোর জিলা জজ কোর্টে মোকদ্দমা চালাইতেন; তখন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, যিনি কাশীধামে স্বামী নির্মলানন্দের সহপাঠী ছিলেন ও পরে বেলুড়মঠের অধ্যক্ষ হন, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যাইয়া উক্ত ভাড়া ঘরে উঠেন এবং বাল্যবন্ধু, সহপাঠী ও গুরুভ্রাতা নির্মলানন্দজী বাঙ্গালোর আশ্রমেই তৎকালে আছেন জানিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। নির্মলানন্দজী বিজ্ঞানানন্দজীকে বহুদিন পরে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং প্রেমালিঙ্গনান্তে নিজ চেয়ারে বসাইয়া স্বয়ং সযত্নে কফি তৈয়ার করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন এবং সজল নয়নে বলিলেন "আমি এখানে থাকিতে

তুমি ওখানে উঠলে কেন? স্বামিজীকে যে ভাবে সেবা করতাম ঠিক সেই ভাবেই তোমার সামান্য সেবা ক'রে আজ খুব খুসী হলাম।" উভয় গুরুভ্রাতা কিছুক্ষণ ঠাকুরের কথা বলিয়া ও পরস্পরের স্বাস্থ্য সংবাদ লইয়া কাটাইলেন। স্বামী নির্মলানন্দ গুরুভ্রাতার সঙ্গে আশ্রমের ফটক পর্যন্ত যাইয়া বিদায় দিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দও নির্মলানন্দজীকে স্বীয় গুরুভাই বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার রান্না খাইতে ভালবাসিতেন। স্বামিজী তাঁহার রান্না খাইতে পছন্দ করিতেন বলিয়া তুলসী পরবর্তী জীবনে নিজেকে 'স্বামিজীর পাচক' বলিয়া পরিচয় দিতে আনন্দিত হইতেন। স্বামিজী যখন বিশ্ববরেণ্য হইয়া স্বদেশে ফিরিলেন তখন নির্মলানন্দজী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। একদা স্বামিজী চিকিৎসকের নির্দেশে পরিমিত ও নির্বাচিত পথ্য খাইতে বাধ্য হন। সম্ভবতঃ তিনি তখন বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত ছিলেন। নির্দিষ্ট পরিমাণে মাংসাহার তাঁহাকে করিতে হইত, অন্য কোন পথ্য তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইত না। একদিন যথাসময়ে পরিমিত পথ্য প্রস্তুত ও পরিবেশিত হইল; কিন্তু রান্না এত সুন্দর ও সুস্বাদু হইয়াছিল যে স্বামিজী বালকবৎ বলিলেন, "আর এক টুকরা মাংস দেবে কি?" স্বামিজী এমন কাতরভাবে চাহিলেন যে, নির্মলানন্দজী উহা দিতে অস্বীকার করিতে পারিলেন না এবং আরো দুই এক টুকরা মাংস তাঁহাকে দিলেন। যখন উহা খাওয়া হইল তখন স্বামিজী আজন্ম অভিনেতার মত সহাস্যে বলিলেন, "ডাক্তার যখন পরিমিত পথ্যের ব্যবস্থা দিয়েছেন তখন সেই নিয়ম ভঙ্গ ক'রে তুমি আমাকে বেশী মাংস খাওয়ালে কেন?" ইহাতে ভীত না হইয়া প্রত্যুৎপন্নমতি নির্মলানন্দজী প্রত্যুত্তর দিলেন, "বিশ্ব-জগৎ যাঁর মুষ্টির মধ্যে রয়েছে তিনি যদি এক টুকরা মাংসের প্রার্থী হন, কে তাঁকে তা দিতে অস্বীকার করবে?" ইহাতে উভয়ের মধ্যে হাস্যের রোল উঠিল। আর এক দিন স্বামিজী তাঁহার সুপ্রিয় গুরুভ্রাতা তুলসী মহারাজকে সকাল বেলা ৯টার সময় বলিলেন, "আমরা আজ নয় দশ জন দশটার সময় দার্জিলিং যাত্রা করবো। আমাদের সকলের জন্য খাবার প্রস্তুত করে দাও।" এতগুলি লোকের জন্য এক ঘণ্টার মধ্যে কিরূপে খাবার প্রস্তুত করিবেন, ইহা ভাবিয়া স্বামী নির্মলানন্দ অস্থির হইলেন। কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ না করিয়া স্বামিজীর আদেশ পালনে অসীম সাহসে অগ্রসর হইলেন। অবিলম্বে নয় দশটি ষ্টোভ জ্বালা হইল এবং

সযত্নে বিবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া নির্মলানন্দজী স্বামিজী প্রভৃতিকে যথা-সময়ে খাওয়াইলেন।

একবার বেলুড় মঠে বিজয়া দশমীর দিন রাত্রে প্রতিমা বিসর্জনান্তে সমবেত ভক্তগণ সন্ন্যাসীবৃন্দের শিব নৃত্য দেখিয়া ধন্য হইলেন। গুরুভ্রাতাগণ স্বামী প্রেমানন্দকে শিব সাজিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি নির্মলানন্দজীকে শিব সাজিতে মিনতি জানাইলেন। তাঁহার আগ্রহে স্বামী নির্মলানন্দ শিব সাজিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া গুরুভ্রাতাগণ শিবনৃত্য করিলেন, সমবেত ভক্তগণ এই স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া পরমানন্দ পাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্যবৃন্দের গুরুভ্রাতৃপ্রেম সত্যই অতুলনীয় ও আদর্শ স্থানীয়।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণ তুলসী-দাসের বাড়ীতে মিলিত হইয়া ভজনাদি করিতেন। ভজনের সময় নরেন্দ্রনাথ গান গাহিতেন এবং তুলসী পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেন। বেলা বেশী হইলে নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ তুলসীর বাড়ীতে আহারাদি করিতেন। স্বামী সারদানন্দ বলেন, ঠাকুরের মহাসমাধির পর একদিন তুলসীর বাড়ীতে স্বামিজী গায়ত্রী আহ্বানের শ্লোকটি সুর করিয়া গাহিতেছিলেন। ধ্যানদৃষ্ট প্রাচীন ঋষির সুরে—

আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥

স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন ইহাতে এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে পূর্বাহ্ণ দশটা হইতে অপরাহ্ণ চারিটা পর্যন্ত এই শ্লোকটি বার বার গাহিলেন। চারিটার পরে তিনি স্নানাদি সারিয়া আহার করিলেন। বেলুড়মঠেও তিনি বহুবার উক্ত আহ্বান মন্ত্র বাহ্য সংজ্ঞা হারাইয়া গাহিয়াছেন। কিন্তু সেদিন তুলসী মহারাজের বাড়ীতে তিনি যত বিভোর হইয়াছিলেন তত বিভোর হইতে আর তাঁহাকে কখনও দেখা যায় নাই।

আর একদিন গুরুভ্রাতাগণ তুলসীর গৃহে অনেকক্ষণ ধরিয়া ধর্মচর্চা করিলেন, তৎপরে নরেন্দ্র ভজন গাহিতে এবং তুলসী পাখোয়াজ বাজাইতে লাগিলেন। সকলে ভজন গানে এত মাতোয়ারা হইলেন যে কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা একটি কাষ্ঠমঞ্চের উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং প্রেমানন্দে

আত্মহারা হইলেন। অন্তঃপুরবাসীরা সুমধুর গীতবাদ্যে আকৃষ্ট হইলেন এবং সেই দিব্য দৃশ্য দেখিতে আসিলেন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ স্বামী নির্মলানন্দকে এক দীর্ঘ পত্র লিখেন। উহাতে তাঁহারা তাঁহাকে এই ভয় দেখান যে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই সংঘ যিনি ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহার উপর স্বামিজীর অভিশাপ পড়িবে। উক্ত পত্রের তিন অংশ ছিল। প্রথম অংশ ঠাকুরের শিষ্যগণ কর্তৃক এবং দ্বিতীয় অংশ স্বামিজীর শিষ্যগণ কর্তৃক লিখিত। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য হইয়াও প্রথমাংশে যোগ দেন নাই। তিনিই পত্রের তৃতীয় অংশ লিখিয়াছেন। উক্ত অংশে আছে। "প্রিয় তুলসী মহারাজ, আপনি মহাপুরুষ লোক, যাহাতে বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ সংঘ অক্ষুণ্ণ থাকে ও আপনাকে লইয়া শক্তিবৃদ্ধি করে এমত করিবেন। আপনি পৃথক্ না হন এই আমার প্রার্থনা। ইতি—

আপনার "বিজ্ঞানানন্দ"

শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ সান্যাল ঠাকুরের সাক্ষাৎ গৃহী শিষ্য ছিলেন। তিনি বাঙ্গালোর জজকোর্টে সাক্ষ্যদান কালে বলিয়াছিলেন, 'যেদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী নির্মলানন্দ বরাহনগর মঠে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন সেদিন আমি তথায় গিয়াছিলাম।' ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে স্বামী নির্মলানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের গুরুভাই।

পাঁচ

বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর কাশীপুর বাগানবাড়ীর লিজ (মেয়াদ) আরও কয়েক দিন বাকী ছিল। ঠাকুরের তরুণ শিষ্যদের মধ্যে দুই তিন জন তথায় রহিলেন এবং বাকি সকলে গৃহে ফিরিয়া অধ্যয়নাদি পুনরায় আরম্ভ করিলেন। ইহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার ভার পড়িল স্বভাবতঃই নরেন্দ্রের উপর; কারণ ঠাকুর তাঁহাকেই ইঁহাদের অভিভাবক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রায়ই নরেন্দ্র তাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাদিগকে অধ্যয়ন হইতে টানিয়া তুলিতেন এবং তাঁহাদের অবসন্নপ্রায় চিত্তে বৈরাগ্যের হোমানল জ্বালিতেন। তুলসীদাসের নিকট নরেন্দ্রের এই সকল আগমন অপ্রকাশনীয় ভাবে অভিলষিত ছিল; কারণ তাঁহার নিকট নরেন্দ্রই ভিন্নরূপে ঠাকুর এবং নরেন্দ্র তুলসীকে যারপরনাই ভালবাসিতেন। উভয়ে অন্যান্য গুরুভাইদের সহিত মিলিত হইয়া তুলসীর গৃহে শ্রীগুরুপ্রসঙ্গে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, ভোজনে ও ধূম্রপানে বহু ঘণ্টা কাটাইতেন। উক্ত গৃহ বাগবাজার পল্লীতে বিশেষ বিদিত ছিল এবং গৃহবাসীগণ অতিশয় অতিথিপরায়ণ এবং তুলসীই বাস্তবপক্ষে গৃহস্বামী। নরেন্দ্র এই দলকে গান গাহিয়া শুনাইতেন এবং তুলসী পাখোয়াজ ও অন্যান্য যন্ত্র বাজাইতেন। প্রায়ই তুলসী অন্নব্যঞ্জন বা জলখাবার তৈয়ার করাইয়া গুরুভাইগণকে খাওয়াইতেন। তুলসী গৃহকর্তা বলিয়া যে এই বিষয়ে গৃহবাসীগণ তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিতেন তাহা নহে; পরন্তু নরেন্দ্র প্রমুখ বালকদের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক স্নেহানুরাগ ছিল। স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক কথিত আলোচ্য সময়ের একটি ঘটনা* উল্লেখযোগ্য। ঠাকুরের তিরোধানের পর একদিন স্বামিজী (নরেন্দ্র) তুলসীর বাড়ীতে বসিয়া নিম্নে উদ্ধৃত গায়ত্রী আবাহন সুরতাল সহযোগে গান করিতেছিলেন—'আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী। গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে॥

হরিদ্বারে ধ্যানদৃষ্ট বৃদ্ধ ঋষির মুখে স্বামিজী এই আবাহন যে সুরে গাহিতে শুনিয়াছিলেন ঠিক সেই সুরেই তিনি ঐদিন উহা গাহিতে লাগিলেন। তিনি উহাতে এত তন্ময় হইয়াছিলেন যে ঐদিন সকাল দশটা হইতে বৈকাল চারটা পর্যন্ত প্রায় ছয় ঘণ্টা শুধু এই দুইপদ গাহিয়াছিলেন। চারটার পর স্বামিজী স্নানান্তে আহার করিলেন। বেলুড়মঠেও তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া এই আবাহন বহুবার গাহিয়াছিলেন; কিন্তু সেদিন তুলসী মহারাজের গৃহে তাঁহার যে তন্ময়তা আসিয়াছিল তাহার তুলনা নাই। অন্য একদিন উক্ত দল বিভিন্ন বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করিলেন। অনন্তর নরেন্দ্র সুমিষ্ট স্বরে গান ধরিলেন এবং তুলসী পাখোয়াজ বাজাইলেন। কিছু সময় পরে সঙ্গত এমন জমিয়া গেল যে, সকলে একটি কাষ্ঠমঞ্চের উপরে উঠিয়া নাচিতে লাগিলেন।

---

*শ্রীশ্রীসারদানন্দ-প্রসঙ্গ পুস্তকের ১৪১ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

তাঁহারা ভাবাবেশে আত্মবিস্মৃত হইলেন এবং তাঁহাদের নৃত্য দিব্যানন্দ বর্ষণ করিল। ঐ গৃহের কয়েকজন সঙ্গীত ও নৃত্যে আকৃষ্ট হইয়া নিকটে আসিয়া দেখিতে চাহিলেন। পার্শ্বস্থ কক্ষে একটি ছোট প্রাচীর ও জলের চৌবাচ্চা ছিল। জনৈকা মহিলা (তুলসীর ভ্রাতৃবধূ) দেওয়ালে উঠিয়া জানালা দিয়া উঁকি মারিতেছিলেন। যে কাষ্ঠমঞ্চের উপর নৃত্য হইতেছিল উহার একটি পায়া হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল এবং মঞ্চ উল্‌টিয়া পড়িল। উহার ফলে নৃত্য মাঝখানে বন্ধ হইল। তখন তুলসী জলখাবার চাহিতে পারেন ইহা ভাবিয়া পূর্বোক্তা মহিলা ক্ষিপ্রতার সহিত প্রাচীর হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। এইরূপ করিবার সময় মেঝেতে অবস্থিত একটি ভাঙ্গা বোতলে তাঁহার পা লাগিয়া যায়। কাঁচে তাঁহার পা কাটিয়া গেল এবং খুব রক্ত পড়িতে লাগিল। বেদনায় চিৎকার না করিয়া, এমন কি ঐ কথা কাহাকেও না বলিয়া, তিনি দ্রুতবেগে রান্নাঘরে ছুটিলেন। তথায় নারীগণ তাঁহার পা হইতে প্রচুর রক্ত পড়িতে দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। স্বদলসহ নরেন্দ্র ক্ষিপ্রবেগে রান্নাঘরে উপস্থিত হইলেন এবং পায়ের ক্ষত দেখিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ক্ষত বাঁধিয়া দেওয়া হইলে পর কিছু জলযোগ করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে ফিরিলেন।

ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দের আদিমঠ স্থাপিত হয় বরাহনগরে একটি ভাড়া ঘরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে। তথায় কয়েক দিবস পূর্বে ঠাকুরের ভস্মাস্থি আনীত হইয়াছিল। বয়স্ক গৃহীভক্ত বুড়ো গোপাল ঠাকুরের শয্যা ও অন্যান্য দ্রব্য কাশীপুর বাগানবাটি হইতে আনিলেন। শরৎ তাঁহার সহিত রাত্রিতে যোগ দিলেন। প্রথমতঃ তারক, লাটু ও বুড়োগোপালই সর্বাগ্রে মঠবাসী হইলেন। নরেন্দ্র, শশী, শরৎ, বাবুরাম ও নিরঞ্জন উক্ত মঠে ঘন ঘন আসিতেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তুলসীকে একটি বড় বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মামা নিত্যগোপাল উন্নত সাধক ছিলেন এবং পরবর্তী কালে একটি ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের শাখা কেন্দ্র কলিকাতা ও নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। যদিও নিত্যগোপাল শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন এবং ঘন ঘন তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন তথাপি তিনি তাঁহার দলকে স্বতন্ত্র রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় তুলসীদাসের মধ্যে অসাধারণ আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে স্বীয় দলে যোগ দিতে বলিলেন। আধ্যাত্মিকতায় সমুন্নত বৃদ্ধ মামার অনুরোধ তরুণ তুলসী হঠাৎ

ফেলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র ও ভাগ্যদেবী জয়ী হইলেন। নরেন্দ্রের প্রভাবে এবং তুলসীর দৃঢ়তায় এই প্রতিবন্ধক অতিক্রান্ত হইল। তুলসী নরেন্দ্রের দলেই যোগ দিলেন। একদিন তুলসী গৃহ ও কলেজ ছাড়িয়া এবং সমস্ত ঐহিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ঠাকুরের হোমাপাখীর মত বরাহনগর মঠে উপস্থিত হইলেন।

বরাহনগরের যে গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদিমঠ স্থাপিত হয় তাহা কলিকাতা ও দক্ষিণেশ্বরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। ইহাকে দেখিলে পরিত্যক্ত গৃহ বলিয়া মনে হইত। বহু বৎসর এই গৃহ কেহ ভাড়া লয় নাই। ইহা ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া ছিল এবং ইহাতে মেরামতের প্রয়োজন ছিল। উহা শুধু পুরাতন নহে; পরন্তু ভুতুরে বাড়ী বলিয়া লোকে বলিত। ইহা দ্বিতল হইলেও ইহার একতলা বাসের অযোগ্য ছিল, কারণ, উহা গিরগিটি ও সাপের বাসা হইয়া ছিল; উহার ঘরগুলি অন্ধকার ও স্যাঁতসেতে। উহার ফটক বহু পূর্বে ভূমিস্যাৎ হয় এবং দোতলায় যে বারান্দা ছিল তাহাও ভগ্নপ্রায়।

পশ্চাদ্‌ভাগে যে প্রধান কক্ষ তাহাতে সাধুগণ থাকিতেন। কিন্তু উহার অবস্থাও জীর্ণ শীর্ণ ছিল। বস্তুতঃ ঐবাড়ী কখন পড়িয়া যায় এই ভয়ে কেহ তাহাতে থাকিত না। উহার পূর্বে আর একটি গৃহ ছিল, যাহা দেবালয় রূপে ব্যবহৃত হইত। উহাতে গৃহস্বামীর গৃহদেবতা তথায় বাসকারী পুরোহিত কর্তৃক পূজিত হইতেন। মঠগৃহের পশ্চাতে যে বাগান ছিল তাহা আগাছায় পরিপূর্ণ থাকায় জঙ্গলের ন্যায় দেখাইত। বাগানের মালী একতলায় ভাঙ্গাঘরে থাকিত। বাগানে অনেক আম ও অন্যান্য ফল গাছ ছিল। একটি বিল্ববৃক্ষও শোভা পাইত। বাগানের পশ্চাতে যে পুকুর ছিল তাহাতেও পানা হওয়ায় জল পচিয়া মশার জন্মভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। উক্ত গৃহে যে সকল ভুতুড়ে কাণ্ড বহু পূর্বে ঘটিয়াছিল তৎসম্বন্ধে পার্শ্বস্থ পল্লীতে নানা কথা রটনা ছিল। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ অভীঃ মন্ত্রের উপাসক ছিলেন এবং কদাপি ভুতের ভয় করিতেন না। যাঁহারা মৃত্যু ভয় জয় করিয়াছেন তাঁহারা অন্য ভয়ে ভীত হন না। এই ঘরের ভাড়া অল্প বলিয়া যে তাঁহারা উহা লইয়াছিলেন তাহা নহে। যে বরাহনগর শ্মশান ঘাটে ঠাকুরের স্থূল দেহ ভস্মীভূত হয় তাহা অদূরে বলিয়া উক্ত গৃহ ভাড়া করা হয়।

ঠাকুরের ভস্মাস্থি তাঁহারা পতিতপাবনী সুরধনীর তীরবর্তী স্থানে রাখিতে

ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বরাহনগর মঠ গঙ্গার নিকটবর্তী ছিল। সেখানে সাধুগণ নাগরিক কোলাহল হইতে দূরে নির্জনে থাকিয়া তপস্যায় নিমগ্ন হইতে চাহিতেন।

তুলসীদাস যখন গৃহত্যাগ করিয়া বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন তখন তাঁহার গৃহে হৃদয়বিদারক ক্রন্দনরোল উঠিল। পরিবারস্থ পুরুষগণ ও নারীগণ তুলসীকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য মঠে গেলেন। তাঁহারা তৎসমক্ষে চোখের জল ফেলিলেন এবং ঐ ভুতুড়ে গৃহ হইতে চলিয়া আসিবার জন্য অন্তরের আকুতি জানাইলেন; তাঁহাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কিন্তু তাঁহারা একবার ব্যর্থ হইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, নানাভাবে বহুবার চেষ্টা করিলেন। প্রত্যেক-বারেই বিফলমনোরথ হইয়া সজলনয়নে তাঁহারা গৃহে ফিরিলেন। অবশেষে তাঁহারা তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন সপ্তাহে অন্ততঃ একবার গৃহে যাওয়ার জন্য। তুলসী তাহাতেও স্বীকৃত হইলেন না; কিন্তু তুলসীর প্রতি তাঁহাদের স্নেহ এত অধিক ছিল যে বাগবাজার গৃহ হইতে বরাহনগর মঠ পর্যন্ত প্রায় তিন মাইল পথ হাঁটিয়া তাঁহারা তাহাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহারা শূন্য হস্তে কখনও মঠে যাইতেন না। দুই বৎসর পরে তুলসী একদিন স্বগৃহে যাইয়া আত্মীয়স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি গেরুয়াবৃত দীর্ঘকেশ ও শ্মশ্রুধারী সন্ন্যাসী। তিনি প্রীতিসহকারে তাঁহাদিগকে ধর্মজীবন যাপন করিতে পরামর্শ দিলেন। তুলসীর প্রত্যাবর্তনের আশা তাঁহারা বর্জন করিলেন; কিন্তু মাঝে মাঝে দর্শন দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে, তিনি শুধু তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিবেন তাহা নহে; পরন্তু পূর্ববৎ তাঁহাদের সহিত মিশিবেন; অপিচ সন্ন্যাসীর পক্ষে যতটুকু সমীচীন ও শোভনীয় ততটুকুই তিনি করিবেন, তদধিক নহে। কেবল তুলসী তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহার সন্ন্যাস জীবনের পথে কোন বাধা না দেন। তিনি তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, তিনি অনতিবিলম্বে দীর্ঘকালের জন্য তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইবেন এবং বিদায় গ্রহণকালে তাঁহাদের নিকট হইতে দুইটি কম্বল লইয়া যাইবেন। তাঁহারা কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যের উপহার দিতে চাহিলে উহা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যাত হইল।

অন্যান্য মঠবাসী গুরুভাইগণ তুলসীর আত্মীয়স্বজনের নিকট অপরিচিত ছিলেন না। তাঁহাদের অনেকে তুলসীর গৃহে বহুবার গিয়াছেন এবং বহু ঘণ্টা

আনন্দে কাটাইয়া গৃহবাসীগণের প্রীতিময় আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়াছেন। তরুণ গুরুভাইগণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে এতকাল অভ্যস্ত ছিলেন। আহা, তাঁহারা এখন কি কঠোর জীবন যাপন করেন! তেলাকুচা পাতার ঝোল দিয়া তাঁহারা দুটি ভাত খাইতেন; আবার কোনদিন তাহাও জুটিত না। কোন দিন নুন দিয়া শুধু ভাত খাইতে হইত! যে দিন তাহাও মিলিত না সে দিন সাধুগণ দরজা বন্ধ করিয়া দিবারাত্রি পাঠ, আলোচনা ও জপধ্যানে কাটাইতেন। একখণ্ড উত্তরীয় এবং দুই খণ্ড কটিবস্ত্র ব্যতীত কাহারও অধিক পরিধেয় ছিল না। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? চরম কঠোরতাকে উপেক্ষা করিয়া বৈরাগ্যদীপ্ত মুমুক্ষু সন্ন্যাসীগণ তপস্যায় নিযুক্ত রহিলেন। নবযুগের কঠোর তপস্যা লোকচক্ষুর অন্তরালে পাহাড়ে পর্বতে না হইয়া সহরসমীপে জনসমাজে অনুষ্ঠিত হইল। মলিন সমাজের শুদ্ধি ক্রিয়া ইহার দ্বারাই সম্পন্ন হইল। সমাজে থাকিয়াও তাঁহারা সমাজাতীত চরম বৈরাগ্য সাধনায় নিমগ্ন রহিলেন। শ্রীগুরু স্মরণ এবং তৎপ্রদর্শিত পথে ঈশ্বরলাভই ছিল তাঁহাদের একমাত্র প্রিয় কর্ম। একদা স্বামী বিবেকানন্দ এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা তখন কঠোর তপস্যার প্রবলস্রোতে পড়িয়াছিলাম, ও! কি সব দিন আমরা তখন কাটিয়েছি!! এইরূপ তপশ্চর্য্যা দেখিলে দৈত্যেরাও পালাইত; মানুষের কি কথা?"

উক্ত রূপে কয়েক মাস কাটিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বরাহনগর মঠের অধিবাসীবৃন্দ বাবুরামের মাতা মাতঙ্গিনী ঘোষের আহ্বানে হুগলী জেলায় আঁটপুরে চলিলেন। ২৪শে ডিসেম্বর বড়দিনের পূর্বদিন শ্রীরামকৃষ্ণের নিম্নোক্ত নয় জন শিষ্য তথায় ধুনি জ্বালাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের শুভ সংকল্প করিলেন —নরেন, তারক, কালী, শরৎ, সারদা, নিরঞ্জন, শশী, গঙ্গাধর ও বাবুরাম। এই যুগান্তরকারী সংকল্পদিবস স্মরণার্থ তথায় একটি মর্মরফলক স্থাপিত হইয়াছে। আঁটপুর হইতে নয় জন গুরুভ্রাতা তারকেশ্বর তীর্থে যোগীশ্বর মহাদেবকে পূজা দিয়া বরাহনগরে ফিরিলেন। যদিও অন্তরে তাঁহারা উত্তম সন্ন্যাসী ছিলেন, তথাপি তাঁহারা আনুষ্ঠানিক বাহ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। বোষ্টন বেদান্ত সমিতির ভগিনী বেদমাতা তৎপ্রণীত ইংরাজী পুস্তক "শ্রীরামকৃষ্ণ ও তৎ-শিষ্যবৃন্দ"-এ বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যগণকে মন্ত্রদীক্ষাদানপূর্বক তাঁহাদের অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তিস্থাপন করিলেও আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসদীক্ষা দেন নাই।

Farewell to Swami Abhedananda, sailing for the U.S.A. in 1896, at the Alambazar monastery :

Sitting (L–R) : Swamis Subodhananda, Brahmananda (in the chair) and Akhandananda.

Standing (L–R) : Swamis Adbhutananda, Yogananda, Abhedananda, Trigunatitananda, Turiyananda, Nirmalananda and Niranjanananda.

তিনি প্রথম দীক্ষা দিলেও ভাবী নেতা নরেন্দ্রের উপর দ্বিতীয় দীক্ষার ভার অর্পণ করেন। কখন কি ভাবে বিভিন্ন শিষ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাহা নির্দিষ্টরূপে জানা যায় না। স্বামিজীর গৃহী শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী তৎপ্রণীত "স্বামী-শিষ্য-সংবাদ"-এ (১ম ভাগ ৯৯ পৃষ্ঠা) বলেন, "আমরা শুনিয়াছি রামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরে স্বামিজী সন্ন্যাস গ্রহণের নিয়মাবলী যে সকল উপনিষদে আছে সে সকল উপনিষদ হইতে আবশ্যকীয় মন্ত্রাদি সংগ্রহ করিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি প্রতিকৃতি সম্মুখে রাখিয়া বেদবিধি অনুসারে স্বীয় গুরুভাইদের সহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।" কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত "কালী তপস্বী" নামক স্বামী অভেদানন্দের জীবনীতে (৩৮—৪০ পৃষ্ঠা) আছে, "ক্রমশঃ নরেন্দ্র বরাহনগর মঠে শরৎ, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর, সুবোধ, হরি, তুলসী, সারদা প্রভৃতিকে ডাকিয়া আনিলেন। একদিন নরেন্দ্র গুরুভাইদের সহিত বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। শাস্ত্রানুসারে কালী তপস্বী বিরজা হোম অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পাদুকাযুগল পূজান্তে আচার্যের পদ লইলেন। নরেন্দ্র, কালী, শশী, শরৎ, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন প্রভৃতি গুরুভাইগণ বিরজা হোমে যোগ দিলেন। নরেন্দ্র বিবিদিষানন্দ নাম লইলেন এবং অন্যান্য গুরুভাইগণকে তাঁহাদের চারিত্রিক বিশেষত্ব অনুসারে সন্ন্যাস নাম দিলেন। তারক সেদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন না। যোগীন ও লাটু বৃন্দাবন হইতে ফিরিলে কালী তাঁহাদিগকে বিরজা হোম করাইয়া সন্ন্যাস লওয়াইলেন।" কয়েকদিন পরে হরি ও তুলসী পূর্বোক্ত প্রকারে সান্ন্যাস লইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল তৎপ্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত' নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন, "নরেন্দ্র স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণান্তে ব্রহ্মানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, অভেদানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, নির্মলানন্দ, তুরীয়ানন্দ প্রভৃতিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্মাস্থি এবং প্রতিকৃতির সম্মুখে যাগযজ্ঞ করিয়া সন্ন্যাস দিলেন। সকলে একদিনে সন্ন্যাস লইলেন।"

কাশীধামে কথাপ্রসঙ্গে স্বামী নির্মলানন্দ এই কথা বলিয়াছিলেন "একদিন স্বামিজী মহানির্বাণ তন্ত্র হইতে সন্ন্যাসের মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া আমাদের সকলকে সন্ন্যাস দিলেন। শরৎ, শশী, কালী, লাটু, বুড়ো গোপাল, রাখাল, বাবুরাম প্রভৃতি আমরা সকলে স্বামিজীর নিকট সন্ন্যাস লইলাম। পরে মহাপুরুষজী, বিজ্ঞানানন্দজী, নিরঞ্জনানন্দজী এবং ত্রিগুণাতীতজী নিজেরা

ঠাকুরের ঘরে সন্ন্যাস লইলেন। স্বামিজী আমাদিগকে সন্ন্যাস নাম দিয়াছিলেন।” সুতরাং নরেন্দ্র স্বয়ং বিবিদিষানন্দ হইলেন এবং গুরুভাইদিগকে উপযুক্ত সন্ন্যাস নাম দিলেন। তুলসীদাসকে তিনিই নির্মলানন্দ নাম দিয়াছিলেন তাঁহার অসাধারণ চারিত্রিক পবিত্রতা লক্ষ্য করিয়া। ইহা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অভিমত। বাল্যকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বামী নির্মলানন্দের অসামান্য বৈশিষ্ট্য ছিল চারিত্রিক নির্মলতা, নির্ভীকতা ও দুর্জেয় মনোবল।

সত্যই উক্ত হইয়াছে যে, বরাহনগর মঠে বাস ও অধ্যাত্ম সাধনা একই কথা। বস্তুতঃ বরাহনগর মঠে সেই দিনগুলি চিরকাল স্মরণীয়। উহার ইতিবৃত্ত পাঠে এ্যাসিসিবাসী ফ্র্যান্সিস ও তৎশিষ্যবৃন্দের কথা মনে পড়ে। কঠোর তপস্যা, জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও দিব্যানন্দে বরাহনগর মঠের দিনগুলি কাটিত। যে হোমানল দক্ষিণেশ্বরে জ্বলিয়াছিল তাহাই আবার বরাহনগরে পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল। যীশু খ্রীষ্ট সত্যই বলিয়াছেন যে, মানুষ শুধু অন্নাহারে বাঁচিয়া থাকে না। ইহার গূঢ়ার্থ এই যে, ধর্মসাধন ব্যতীত মানবজীবন অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যবৃন্দের জীবনে সর্বপ্রকারে অর্থপূর্ণ ছিল। দারিদ্র্য ও তপস্যা সমানভাবে তাঁহাদের জীবনে প্রকট হইয়াছিল। মঠের বাতাস যেন উক্ত ভাবে মুখরিত ছিল। মুমুক্ষু সন্ন্যাসীদের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাবে মঠস্থ বৃক্ষরাজি, তৃণভূমি, পক্ষীকুল, দিবালোক ও নৈশান্ধকার যেন উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। সাধুগণ বহির্জগৎ বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। সর্বোচ্চ লোকের সর্বোচ্চ আনন্দ তাঁহারা মর্ত্যলোকেই টানিয়া আনিয়াছিলেন। কেবল ঈশ্বরই তাঁহাদের অন্তর অধিকার করিয়া ছিল। তাঁহারা যে দিব্য অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন তাহা এখনও নির্বাপিত হয় নাই; ইহা কখনও নির্বাপিত হইতে পারে না। কারণ উহা স্বর্গীয়। ইহা বাত্যাবেগে সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং রামকৃষ্ণবাণী প্রচার করিয়াছে। সাধুগণ ছিলেন সেই অগ্নির উৎসারিত স্ফুলিঙ্গ। ঠাকুরের প্রধান শিষ্য সর্বাপেক্ষা দেদীপ্যমান অগ্নিশিখা। প্রকৃতপক্ষে একজন অন্যজন অপেক্ষা বড় কি ছোট এই ভেদ করা দুষ্কর। তাঁহারা সকলে সমানভাবে দিব্যলোকের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হইত, তাঁহারা এই জগতের লোক নহেন। সকলেই মঠের কার্য সম্পাদনে সমভাবে অগ্রণী হইলেও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে সর্বাগ্রণী বলা চলে এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন স্বামী নির্মলানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত "স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী" (১ম ভাগ ২০০—২০১ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে তিনি বলিতেছেন, "সন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এক উষ্ণ দিনে আমি নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে বরাহনগর মঠে যাই। তখন নরেন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরস্থ কোন্নগরে নবাই চৈতন্যের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বৃদ্ধ নবাই শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রায়ই যাইতেন এবং কোন্নগরে এক কুটীর করিয়া তাহাতে সাধন করিতেছিলেন। সেইজন্য নরেন্দ্রনাথ ঘন ঘন সেই বৃদ্ধকে দেখিতে যাইতেন। আমি মঠে যাইয়া দেখিলাম প্রায় ২০।২২ বৎসরের এক তরুণ সাধু মঠে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার দেহ শীর্ণ হইলেও ব্যায়ামাভ্যাসের ফলে শক্ত ছিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় সমুজ্জ্বল, মর্মভেদী, তাঁহার কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট ও আদেশব্যঞ্জক। তখন স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ মঠের অন্যত্র ছিলেন। তাঁহাদের নির্দেশে পূর্বোক্ত যুবক নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া আনিবার জন্য অবিলম্বে নৌকায় উঠিয়া কোন্নগরে গেলেন। উভয়ে রাত্রিসমাগমে মঠে ফিরিলেন। ইহাই স্বামী নির্মলানন্দকে আমার প্রথম দর্শন।"

উল্লিখিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী নির্মলানন্দ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ও অনুভব এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: "যখন আলমবাজারে মঠ উঠিয়া গেল তথায় স্বামী নির্মলানন্দ অন্যতম অধিনায়করূপে বিবেচিত হইতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রধান সহকারীরূপে তিনি মঠের সব কাজ করিতেন। তুলসী মহারাজ নিজেই পায়খানা পরিষ্কার করিতেন এবং পুকুর হইতে কলসী ভরিয়া জল আনিতেন। তাঁহার বামস্কন্ধে একটি বড় জলপূর্ণ কলসী এবং ডান হাতে আর একটি জলপূর্ণ কলসী থাকিত। পায়খানার সম্মুখে যে কলসীগুলি ছিল সেগুলিতে তিনি জল ভরিয়া রাখিতেন শৌচের জন্য। তিনি বাজার করিতেন এবং অন্য কর্মে অগ্রণী হইতেন। আবার অবসর পাইলেই অধ্যয়নে বসিতেন। সাধন ভজনেও তিনি অনলস ছিলেন না। সর্বদা প্রফুল্ল, সুনম্র ও মিষ্টভাষী তাঁহার বহুমুখী শক্তিমত্তা ঐ সময়ে সমধিক প্রকটিত হয়। তিনি সকলকে প্রীতিভরে সেবা করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতেন। সপ্রেম সেবা ছিল তাঁহার স্বভাবগত। সকলের প্রতি তাঁহার অসীম প্রীতি ও দয়া ছিল। এই সম্বন্ধে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মে বা জুন মাসে এক গরম দিনে আমরা

সকলে লোচন ঘোষের ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে যাই। কথাবার্তায় আমরা এত মাতিয়া ছিলাম যে, মঠে ফিরিতে দুপুর অতীত হইল। পথ বালুকাময়, তাই আগুনের মত গরম ছিল। সকলেই খালি পায়ে চলিতেছিলেন। অসহ্য গরম। বাজারের পূর্বদিকে আসিতে না আসিতেই আমার পায়ের তলা পুড়িয়া গেল ও ফোস্কা পড়িল। স্বামী নির্মলানন্দও খালি পায়ে চলিতেছিলেন। তিনি আমাকে কাঁধে তুলিয়া মঠ পর্যন্ত আনিলেন, তাঁহারও পা পুড়িয়া যাইতেছিল। তথাপি তিনি এই কষ্ট গ্রাহ্য করিলেন না। এইরূপ বহু ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে। প্রজ্ঞানে এবং পাণ্ডিত্যেও তাঁহার খুব সুনাম হইয়াছিল। সযত্নে তিনি বহু সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। বাংলা হিন্দি ও সংস্কৃতে তিনি অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। মঠের তরুণ ব্রহ্মচারীগণকে তিনি বেদান্ত, ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্র পড়াইতেন। তাঁহার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি যে সকল স্থান ও দ্রব্য ব্যবহার করিতেন সেগুলি অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। তিনি অভিজ্ঞ রাধুনি ছিলেন এবং পেশাদার পাচক অপেক্ষা ভাল-ভাবে বিবিধ আহার্য প্রস্তুত করিতেন।"

উল্লিখিত গ্রন্থকারের সহিত স্বামী নির্মলানন্দের মহাসমাধির পর দক্ষিণ দেশীয় ভক্তগণ সাক্ষাৎ করিলে ঋষিতুল্য মহেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে তুলসী মহারাজ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিতেন। বুকের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করিয়া তিনি মঠ রক্ষা করিতেন। কল্পনাতীত উপায়ে তিনি উক্ত মঠে আর্থিক ও দৈহিক সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্ভোগ অপেক্ষা সেবাকেই তিনি বেশী ভালবাসিতেন।"

বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে প্রায় দশবর্ষ এই ভাবে স্বামী নির্মলানন্দ গুরুভ্রাতাদের পূত সঙ্গে কঠোর তপস্যায় কাটাইলেন। যে জীবন বিশ্বব্যাপী কর্মক্ষেত্রে অতিবাহিত হইবে তাহা এই ক্ষুদ্র মঠে হাঁপাইয়া উঠিল এবং বহির্জগতে পরিভ্রমণার্থে আকুল হইল। সসীম অসীমে মিলাইয়া গেল।

ছয়

পরিব্রাজক

ভারতীয় অধ্যাত্মসম্পদের উত্তরাধিকারী সাধকগণ বরাহনগর মঠের পরিবেশ সিদ্ধিলাভের পক্ষে উপযুক্ত নয় ভাবিয়া তীর্থভ্রমণের সংকল্প করিলেন। বহির্জগৎ-ব্যাপী তপস্যার প্রভাবে তীর্থস্থান স্বর্গধামে পরিণত ও ঈশ্বর দর্শনের অনুকূল। তীর্থরেণু ব্রহ্মরেণু। এই অপার্থিব মোক্ষধামসমূহ তাঁহাদিগকে নীরব আহ্বান প্রেরণ করিল। এই পুণ্যভূমির তীর্থসমূহ তাঁহাদিগকে ব্যাকুল আন্তরিক আকর্ষণ করিল। প্রাচীন ভারতীয় সন্ন্যাসের আদর্শ তাঁহাদিগকে মঠবাস ও সম্প্রদায় প্রভৃতি ছাড়িয়া পরিব্রাজক জীবন যাপনে উন্মত্ত করিল। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' না হইলে প্রব্রজ্যা সার্থক হয় না। এই অব্যক্ত আহ্বানে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নির্মলানন্দ সর্বপ্রথম তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। ভর্তৃহরি 'বৈরাগ্য শতক' গ্রন্থে সত্যই বলিয়াছেন—

ভূপর্যঙ্ক নিজভুজলতা কন্দুকঃ খং বিতানং
দীপশ্চন্দ্রঃ বিরক্তিঃ বণিতা লব্ধসঙ্গঃ প্রমোদঃ।
দিক্কান্তাভিঃ পবন-চমরৈর্ব্যাজমান সমন্তাৎ
ভিক্ষুঃ শেতে নৃপ ইব ভূবি ত্যক্তসর্বস্পৃহোঽপি॥

অনুবাদ : ভূমিই ভিক্ষু বা সাধুর নিকট শয্যার খাট, স্বীয় বাহুলতা বালিশ, আকাশ গৃহছাদ, জ্যোৎস্নাই দীপালোক, বিরতিই পত্নী ও দশদিকরূপ কান্তাগণ পবনরূপ চামর সর্বদা ব্যাজনকারী। সাধু সর্বস্পৃহা ত্যাগ করিয়াও নৃপবৎ ভূমিশয্যায় শায়িত ও সন্তুষ্ট।

পরিব্রাজক জীবনের স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দতা নির্মলানন্দজীকে পথচারী করিল। বহির্গমনের পূর্বে তুলসী মহারাজের মনে পড়িল তাহার প্রিয়জনের সস্নেহ অনুরোধ। তাঁহার প্রিয়বর্গ তাঁহার দর্শনের অভিলাষী ছিলেন। এখন তিনি এমন এক কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন যাহার সমাপ্তি-সময় নির্ণয় করা সুকঠিন। হয়ত তাঁহারা আর তাঁহার দর্শন পাইবেন না। তিনি একবার স্বগৃহে যাইয়া তাঁহাদিগকে অভীপ্সিত যাত্রার সংকল্প জানাইলেন এবং তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা

দিয়া বিদায় লইলেন। প্রথমে তিনি স্বামী অভেদানন্দ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সহিত সারদা দেবীর পূত সঙ্গে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী যাইয়া কয়েকদিন কাটাইলেন। তথায় শ্রীমার স্নেহাশীষ শিরে ধারণপূর্বক তিনি ও স্বামী অভেদানন্দ হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি তীর্থস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কাষায়বস্ত্র ও কৌপীন, কমণ্ডলু ও কম্বল ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহাদের সঙ্গে রহিল না। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পৌছিয়া তাঁহারা নগ্নপদে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা জুতা, সার্ট বা কোট ব্যবহার করিবেন না। টাকা পয়সা ছুঁইবেন না এবং গৃহমধ্যে ঘুমাইবেন না। দ্বিপ্রহরে চার পাঁচ ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইবেন তাহাতেই উদরপূর্তি করিবেন এবং একাহারী থাকিবেন। ইহাই ছিল তাঁহাদের সংকল্প ও ব্রত। প্রায় চারশত মাইল পথ অতিক্রমান্তে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন গাজীপুরে, যথায় সিদ্ধসাধু পওহারী বাবা বাস করিতেন। গুরু-ভ্রাতৃদ্বয় এই মহাপুরুষের সহিত কথাবার্তা কহিলেন। তথায় এক পুরাতন গুরু-ভাই হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। হরিপ্রসন্ন কাশীধামের পাঠশালায় তুলসীদাসের সহপাঠী ছিলেন এবং তখন গাজীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার। পরবর্তীকালে তিনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নামে অভিহিত হন এবং বেলুড়মঠের অধ্যক্ষপদ অলংকৃত করেন। গাজীপুরে হরিপ্রসন্ন স্বীয় গাড়ীতে তুলসী ও কালীকে তুলিয়া নিজ বাসায় লইয়া গেলেন এবং আহারাদি করাইলেন। অনন্তর তাঁহারা কাশী, অযোধ্যা ও লক্ষ্ণৌ সহর পরিভ্রমণ করিলেন। লক্ষ্ণৌতে এক হিন্দুস্থানী সাধুভক্ত তাঁহাদিগকে হরিদ্বার পর্যন্ত ট্রেন ভাড়া দিতে চাহিলেন; কিন্তু তাঁহারা সেই টাকা লইলেন না। নিরুপায় হইয়া সাধুভক্তটী রেলওয়ে টিকিট কিনিয়া কিছু আহার্যসহ তাঁহাদের হাতে দিলেন। হরিদ্বারে তীর্থদর্শন করিয়া তাঁহারা পদব্রজে হৃষীকেশ গেলেন। পতিতোদ্ধারিণী সুরধুনী তীরে তপস্যাকালে তাঁহারা যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য দেখিয়া-ছিলেন তাহা পরে তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ব্যক্ত করেন। আমেরিকায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক উক্ত ঘটনা এইরূপে উল্লিখিত হয়। কোন ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মা ভাগীরথীর অন্য তীরে বসিয়া 'শিবোঽহম্' 'শিবোঽহম্' এই ব্রহ্মমন্ত্র জপিতেছিলেন। পার্শ্বস্থ জঙ্গল হইতে এক বৃহৎ ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেই হিংস্র পশু তাঁহাকে করাল-কবলে তুলিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বাহ্যসংজ্ঞাহীন ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ ব্যাঘ্রমুখে

চলিয়া যাইতেন ; আবার অজ্ঞাত আকর্ষণে মঠে ফিরিয়া আসিতেন। সংঘবদ্ধ-ভাবে শ্রীগুরুকথিত যুগবাণী প্রচাররূপ মহাব্রত সাধনার্থ তাহারা পুনঃ পুনঃ মঠে মিলিত হইতেন। বরাহনগর মঠে বহু দর্শক আসিতেন। তন্মধ্যে কেহ বা কৌতূহলী অভ্যাগত, কেহ বা অনুরাগী ধর্মপিপাসু। পূর্বাশ্রমের আত্মীয়স্বজনগণও তাঁহাদিগকে তথায় দেখিতে আসিতেন। আবার নানা স্থানের পণ্ডিতগণও আসিয়া তাঁহাদের সহিত তর্কযুদ্ধ করিতেন। মধ্যে মধ্যে দুচারজন পাগলও তথায় আসিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতেন। মঠবাসী সাধুগণের নিকট পাগলদের আগমন উপভোগ্য ছিল। তীর্থ ভ্রমণ হইতে সাধুগণ ফিরিয়া ভ্রমণবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতেন ; আর তপস্যান্তে তপস্বীগণ আসিয়া তাঁহাদের উপলব্ধির কথা বলিতেন। এইরূপে সাধুগণের জীবন উপকৃত ও উন্নত হইত। মঠবাড়ীর মালিক ইহা পুনর্নির্মাণের সংকল্প করায় উক্ত গৃহ ছাড়িয়া তাঁহারা অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইলেন। তখন মঠ উঠিয়া যাইবার আশংকা ছিল ; কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের ভস্মাস্থি ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না। তাঁহার দুর্দম্য সংকল্পের সহায়ক হইলেন স্বামী নির্মলানন্দ। উভয়ের প্রচেষ্টায় দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী আলম-বাজারে পুরাতন ঘড় ভাড়া করিয়া পুনরায় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। যেমন বরাহ-নগর মঠে, তেমনি আলমবাজার মঠে সাধুদের জীবনে সাধনার স্রোত বহিল। উক্ত মঠে, কালী তপস্বী ও তুলসী মহারাজের দুইটি ভিন্ন কক্ষ ছিল। কিছু-কাল মঠবাসের পর গুরুভ্রাতৃদ্বয় পুনরায় তীর্থদর্শনে চলিলেন। গুরুভ্রাতৃবৃন্দ পরিব্রাজক অবস্থায় কখন মঠে, কখন অন্যত্র মিলিত হইতেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহার ভ্রমণের কোন বিবরণ লিখিয়া রাখিতেন না। তিনি এই বিষয়ে তাঁহার শিষ্যবৃন্দ বা ভক্তবৃন্দের নিকটও কিছু বলিতে চাহিতেন না। সেই জন্য তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিচ্ছিন্ন আকারে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী হইতে সংগ্রহ করা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নাই। স্বামী অখণ্ডানন্দের যে ভ্রমণবৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় স্বামী নির্মলানন্দ বৃন্দাবনে স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত মিলিত হন এবং উভয়ে তথা হইতে এটাওয়া গমন করেন। উক্ত স্থানে স্বামী অখণ্ডানন্দ পীড়িত হন এবং স্বামী নির্মলানন্দ কয়েকদিন তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করেন। দৈবক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীত তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহার সহিত স্বামী অখণ্ডানন্দ আগ্রায় চলিয়া যান। স্বামী নির্মলানন্দ অন্য স্থানে ভ্রমণান্তে পুনরায় জয়পুরে এই দুই গুরুভ্রাতার সহিত মিলিত হন। ইতিমধ্যে

আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে দেখিয়া গুরু-ভাইগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। একদিন তাঁহার নাড়ীস্পন্দন হ্রাস পাইল এবং দেহ অত্যন্ত ঘর্মাক্ত হইল। ক্রমশঃ তাঁহার দেহ শীতল এবং নাড়ীস্পন্দন বন্ধপ্রায় মনে হইল, যেন দলপতির অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। অসমতল জমির উপর দুইখানি মোটা কম্বল বিছাইয়া তাঁহার রোগশয্যা প্রস্তুত হইয়াছিল। উক্ত শক্ত শয্যায় শয়ন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সংজ্ঞাহীন হইলেন। তাঁহার গুরু-ভাইগণ দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় অভিভূত এবং কর্তব্যবিমূঢ়। সেই যুগে সুদূর স্থানের মধ্যেও কোন চিকিৎসক বা ঔষধ মিলিত না। গুরুভাইগণ মর্মব্যথায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরকে প্রার্থনা জানাইলেন, যাহাতে দলপতির জীবন রক্ষা হয়। তখন কুঠিয়ার বাহিরে ঘাসের উপর খড় খড় শব্দ শুনা গেল। তাঁহারা দেখিলেন, কুঠিয়ার দরজায় এক অজ্ঞাত সাধু দণ্ডায়মান। তাঁহাকে তাঁহারা সাদরে ভিতরে ডাকিয়া বসাইলেন এবং মর্মবেদনা জানাইলেন। উক্ত সাধু সব কথা শুনিয়া তাঁহার থলি হইতে মধু ও শুঠচূর্ণ বাহির করিয়া একত্রে মিশাইয়া স্বামী বিবেকানন্দের মুখে দিলেন। এই সামান্য ঔষধে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইল এবং রোগী দুই চক্ষু খুলিয়া কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহার মুখের কাছে কান রাখিয়া স্বামীজিকে অস্ফুট অস্পষ্ট ক্ষীণস্বরে বলিতে শুনিলেন "তোরা ভয় পাস্‌নি। আমি মরবো না।" ক্রমশঃ তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পরে তিনি তাঁহার গুরুভাইগণকে বলিয়াছিলেন, "সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় আমি দেখিলাম, আমার জীবনের এক বিশিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। জগতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে আমার বিশ্রাম বা মৃত্যু হইবে না।" সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া স্বামীজি হরিদ্বারে গেলেন এবং সঙ্গীগণও ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ আরও কিছুকাল হৃষীকেশে থাকিয়া আধ্যাত্মিকতায় সমুন্নত হইলেন। হৃষীকেশ হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গাতীরে অবস্থিত তপঃক্ষেত্র। এখানে মন স্বতঃই জগৎ ভুলিয়া অনন্তের দিকে ধাবিত হয়।

অনন্তর স্বামী নির্মলানন্দ বাঙ্গালায় ফিরিলেন এবং সংঘজননী সারদা-দেবীর সঙ্গে শোন নদী তীরে কৈলোয়ারে গেলেন। স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ সেবার শ্রীমার দলভুক্ত ছিলেন। শ্রীমা কৈলোয়ারে থাকিতে থাকিতেই উল্লিখিত গুরু ভ্রাতৃত্রয় বরাহনগর মঠে ফিরিলেন। যখনই এই সকল মুমুক্ষু সন্ন্যাসীদের প্রব্রজ্যার ভাব প্রবল হইত তখনই তাঁহারা তীর্থ ভ্রমণে ও তপস্যায়

চলিয়া যাইতেন; আবার অজ্ঞাত আকর্ষণে মঠে ফিরিয়া আসিতেন। সংঘবদ্ধভাবে শ্রীগুরুকথিত যুগবাণী প্রচাররূপ মহাব্রত সাধনার্থ তাঁহারা পুনঃ পুনঃ মঠে মিলিত হইতেন। বরাহনগর মঠে বহু দর্শক আসিতেন। তন্মধ্যে কেহ বা কৌতূহলী অভ্যাগত, কেহ বা অনুরাগী ধর্মপিপাসু। পূর্বাশ্রমের আত্মীয়স্বজনগণও তাঁহাদিগকে তথায় দেখিতে আসিতেন। আবার নানা স্থানের পণ্ডিতগণও আসিয়া তাঁহাদের সহিত তর্কযুদ্ধ করিতেন। মধ্যে মধ্যে দুচারজন পাগলও তথায় আসিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতেন। মঠবাসী সাধুগণের নিকট পাগলদের আগমন উপভোগ্য ছিল। তীর্থ ভ্রমণ হইতে সাধুগণ ফিরিয়া ভ্রমণবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতেন; আর তপস্যান্তে তপস্বীগণ আসিয়া তাঁহাদের উপলব্ধির কথা বলিতেন। এইরূপে সাধুগণের জীবন উপকৃত ও উন্নত হইত। মঠবাড়ীর মালিক ইহা পুনর্নির্মাণের সংকল্প করায় উক্ত গৃহ ছাড়িয়া তাঁহারা অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইলেন। তখন মঠ উঠিয়া যাইবার আশংকা ছিল; কিন্তু স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের ভস্মাস্থি ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না। তাঁহার দুর্দম্য সংকল্পের সহায়ক হইলেন স্বামী নির্মলানন্দ। উভয়ের প্রচেষ্টায় দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী আলমবাজারে পুরাতন ঘড় ভাড়া করিয়া পুনরায় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। যেমন বরাহনগর মঠে, তেমনি আলমবাজার মঠে সাধুদের জীবনে সাধনার স্রোত বহিল। উক্ত মঠে, কালী তপস্বী ও তুলসী মহারাজের দুইটি ভিন্ন কক্ষ ছিল। কিছুকাল মঠবাসের পর গুরুভ্রাতৃদ্বয় পুনরায় তীর্থদর্শনে চলিলেন। গুরুভ্রাতৃবৃন্দ পরিব্রাজক অবস্থায় কখন মঠে, কখন অন্যত্র মিলিত হইতেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহার ভ্রমণের কোন বিবরণ লিখিয়া রাখিতেন না। তিনি এই বিষয়ে তাঁহার শিষ্যবৃন্দ বা ভক্তবৃন্দের নিকটও কিছু বলিতে চাহিতেন না। সেই জন্য তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিচ্ছিন্ন আকারে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলী হইতে সংগ্রহ করা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নাই। স্বামী অখণ্ডানন্দের যে ভ্রমণবৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় স্বামী নির্মলানন্দ বৃন্দাবনে স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত মিলিত হন এবং উভয়ে তথা হইতে এটাওয়া গমন করেন। উক্ত স্থানে স্বামী অখণ্ডানন্দ পীড়িত হন এবং স্বামী নির্মলানন্দ কয়েকদিন তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করেন। দৈবক্রমে স্বামী ত্রিগুণাতীত তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহার সহিত স্বামী অখণ্ডানন্দ আগ্রায় চলিয়া যান। স্বামী নির্মলানন্দ অন্য স্থানে ভ্রমণান্তে পুনরায় জয়পুরে এই দুই গুরুভ্রাতার সহিত মিলিত হন। ইতিমধ্যে

তিনি সৌভাগ্যক্রমে স্বামী অভেদানন্দকে সঙ্গীরূপে পাইয়াছিলেন। কিছুকাল ভ্রমণ করিয়া স্বামী নির্মলানন্দ আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন। শ্রদ্ধাস্পদ মহেন্দ্রনাথ দত্ত কোন গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে স্বামী নির্মলানন্দ রোগীসেবা খুব ভালবাসিতেন। উহার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। আলমবাজার মঠে অবস্থান কালে তুলসী মহারাজ শুনিলেন বলরাম বসুর গৃহে কোন ব্যক্তি দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি উক্ত রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন ; কিন্তু রোগী বাঁচিল না। স্বামী নির্মলানন্দ সংক্রামক যক্ষ্মা রোগীর সেবা করিয়া নিজেই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার থুথুতে রক্ত পড়িতে লাগিল ও তাঁহার জীবন সংকটাপন্ন হইল। পাছে কেহ এই রোগে পুনরায় সংক্রামিত হয় এইজন্য তিনি মঠ ছাড়িয়া অন্যত্র গেলেন। তিনি আলমবাজার মঠ হইতে যাত্রা করিয়া ভারতের পশ্চিম প্রান্তে বেলুচিস্থানে অবস্থিত মরুতীর্থ হিঙ্গলাজে গেলেন। উক্ত দুর্গম তীর্থগমনের ফলে তিনি যক্ষ্মা রোগমুক্ত হইলেন এবং স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। হিমালয়ে ভ্রমণকালে তিনি চম্বারাজ্যে কিছু কাল বাস করেন। তখন চম্বারাজ এবং তাঁহার পরিবারবর্গ তৎপ্রতি অতিশয় অনুরক্ত হন। নগাধিরাজ হিমালয়ে এবং অন্যত্র পরিভ্রমণ কালে যে সকল ঘটনা স্বামী নির্মলানন্দের জীবনে ঘটিয়াছিল সেগুলি যেমনই অসংখ্য ও অদ্ভুত তেমন মনোরঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত হইবে। স্বয়ং আদর্শ অতিথিসেবক ছিলেন বলিয়া তিনি একদা হিমালয়ে একদল বানরের নিকট যে অত্যাশ্চর্য আতিথেয়তা পাইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে গল্প করিতেন। হিমালয় পর্বতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী দূরে দূরে অবস্থিত এবং একটি হইতে অন্যটিতে যাইবার পথ শ্বাপদসংকুল জঙ্গলের মধ্য দিয়া। তজ্জন্য অরণ্যপথসমূহের মধ্যে পার্থক্য অত্যল্প ছিল। এক বৈকালে তিনি এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে যাত্রা করিলেন। সূর্য অস্তমিত, সন্ধ্যা সমাগত। কোন গ্রাম বা জনমানব দেখা গেল না। আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া তিনি হতাশহৃদয়ে ঘনায়মান অন্ধকারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি দেখিলেন, একটি প্রকাণ্ড হনুমান গাছ হইতে তাঁহার সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল। উক্ত বানরের হাতে এক সরু লাঠি ছিল। স্বামী নির্মলানন্দ মনে করিলেন, বানরটি হয়ত তাঁহার অনিষ্টের অভিপ্রায়ে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই উহা চলিয়া

গেল ও তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বহু বানরের বিকট চীৎকার শুনিতে পাইলেন। উহাতে জঙ্গল কাঁপিয়া উঠিল। পূর্বোক্ত বানর পুনরায় আসিল এই দলের নায়করূপে। এইবার উহার হাতে একখানি জ্বলন্ত কাঠ ছিল। দলপতির ইঙ্গিতে কয়েকটি বানর বৃত্তাকারে স্বামী নির্মলানন্দকে অল্পদূরে ঘিরিয়া বসিল। কেহ কেহ গাছের সরু শাখাখণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল আগুন জ্বালিবার জন্য। স্বামী নির্মলানন্দ ইহার অর্থ বুঝিলেন। জঙ্গলে বন্য জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য আগুন বর্মতুল্য। অবিলম্বে সেই কাঠে আগুন জ্বালা হইল। তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিলেন, বানরগুলি তাঁহার অনিষ্ট করিতে আসে নাই; বরং পরম বন্ধুর কাজ করিতেছে। তাহাদের মনুষ্যোচিত ব্যবহারে তিনি আশ্চর্যান্বিত হইলেন। অনন্তর তাহাদের আতিথেয়তা বিপন্ন সন্ন্যাসীর বিস্ময় অতিক্রম করিল। দলপতির ইঙ্গিতে কয়েকটি বানর পার্শ্বস্থ বৃক্ষ হইতে কিছু ফল আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। সেই ফলগুলি ভক্ষণযোগ্য কিনা না জানিয়া তিনি প্রথমতঃ ঐ সকল খাইলেন না। মানব অতিথির মনোভাব বুঝিয়া দলপতি হনুমান গাছ হইতে নামিয়া দুই একটি ফল তাঁহার সম্মুখে খাইয়া ফেলিল। তখন তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। স্বামীজি বুঝিলেন যে, বানরগুলি এই ফল খাইবার জন্য তাঁহাকে অবোধ্য ভাষায় অনুরোধ জানাইতেছে। স্বামী নির্মলানন্দ নীরবে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া প্রাপ্ত ফল খাইতে লাগিলেন। নিশ্চয়ই তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত প্রসাদরূপে এই বন্যফল ভক্ষণ করিলেন। বানরগুলি সারারাত্রি জাগিয়া তাঁহাকে পাহারা দিল ও ঊষা কালে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। ভগবান যাহার রক্ষক নির্জন অরণ্যেও তাহার বিপদ ঘটে না।

একদা তিনি শীতকালের পূর্বে সমতল অঞ্চলে নামিয়া আসিতে পারেন নাই। স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত তিনি একক উত্তর পর্বতের এক বৃহৎ গুহায় সারা শীতকাল কাটাইলেন। তথায় পাহাড়ীগণ শীতকালের জন্য আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য জমা করিয়া রাখিত। তাহারা ভাত খাইত না বলিয়া কিছু আটা ও মাংস সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা মাংস শুকাইত না রৌদ্রের অভাবে; পরন্তু বরফে জমান বা কাঁচা মাংস সঞ্চয় করিত। বন্য পশু মারিয়া তাহারা গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিত। হিম ও বরফের জন্য উক্ত মাংস পচিয়া যাইত না। উহা হইতে প্রত্যহ মাংস কাটিয়া রান্না হইত। গুহার

সম্মুখে ও চারিদিকে সাত আট ফুট বরফ জমিত। একখণ্ড গুহার মধ্যে আনিয়া গরম করিয়া জল করিত। ঐ জলই তাহারা খাইত। এত আগে কেন পশুগুলি বধ করা হইত? স্বামীজি এই প্রশ্ন করিলে পাহাড়ীরা বলিয়াছিল, শীতকালের কয়েক মাস পশুগুলির খোরাক জোগান অসম্ভব ছিল। তাহারা মৃত পশু খাইতে পছন্দ করে না।

একদা স্বামী নির্মলানন্দ তিব্বতীয় পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণরত ছিলেন। তিন দিন চলিয়াও তিনি কোন গ্রাম দেখিতে পান নাই। তাঁহার সঙ্গে যে কিছু ভাজা ছোলা ছিল সেগুলি খাইয়া তিনি ঐ তিন দিন কাটাইলেন। আর একবার অন্যত্র তিনি প্রায় ছয় মাস রাগীরুটী খাইয়া জীবন যাপন করেন। তখন ডাল, ভাত, তরকারী বা অন্য কিছু জোটে নাই মুখ বদলাইবার জন্য। কোন সময়ে এক তীর্থক্ষেত্রে যাইয়া তিনি ক্ষেত্রোপবাস করেন। ক্ষেত্রোপবাসের অর্থ রাত্রিকালে উপবাস এবং শুধু মেজের উপর শয়ন। তখন ঠাণ্ডা এত অধিক ছিল যে, স্বামী নির্মলানন্দের পদদ্বয় অসাড় ও নীলাভ হইয়া যায়। একবার কঠোর তপস্যার ফলে তাঁহার দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং থোরাক্সের গ্রন্থিবৃদ্ধি হয়। কিছুকাল পরে সমতলভূমিতে আসিয়া জলে স্বদেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া তিনি উহা বুঝিতে পারেন। উক্ত গ্রন্থি বৃদ্ধি প্রায় এক বৎসর স্থায়ী হয় এবং বিনা চিকিৎসায় সারিয়া যায়। সুদীর্ঘ ভ্রমণ নিমিত্ত তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িত, পা ফুলিয়া যাইত। কখনও বা পা ফাটিয়া রক্ত পড়িত। পাথরে ধাক্কা লাগিয়া পা প্রায়ই কাটিয়া বা মচকাইয়া যাইত। কখনও বা হোঁচট খাইয়া তিনি পড়িয়া যাইতেন। কখনও বা পায়ে ব্যাণ্ডেজ না করিয়া একটি পাও চলিতে পারিতেন না। পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি কয়েকবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। একবার তাঁহার মাথায় একটি বড় বিষফোঁড়া হয়। উহাতে অস্ত্রোপচার করিবার জন্য পাহাড় হইতে নামিয়া তাঁহাকে সমীপস্থ সহরে আসিতে হয়। উক্ত অস্ত্রোপচারের পূর্বে সার্জন ক্লোরোফর্ম সহায়ে তাঁহাকে সংজ্ঞাশূন্য করিতে চাহিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ সহাস্যে ডাক্তারকে বলিলেন, "আমার জন্য ইহা অনাবশ্যক। অক্লেশে সংজ্ঞা বজায় রাখিয়া আমি অস্ত্রোপচার সহ্য করিতে পারি।" ডাক্তারের সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও তিনি সন্ন্যাসীর কথায় সম্মত হইলেন; কিন্তু অস্ত্রোপচারের সাফল্য ও নিরাপত্তার নিমিত্ত তাঁহার হাত দুটি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য নির্দেশ

স্বামী বিবেকানন্দ

॰ সাত ॰

স্বামীজির সাহচর্য

আলমবাজার মঠ বরাহনগর মঠের মতই ছিল। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ ছিল যে, স্বামী বিবেকানন্দকে বরাহনগর মঠে প্রায়ই দেখা যাইত; আর আলমবাজার মঠে তিনি অনুপস্থিত। স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য গুরুভাইগণ তীর্থস্থানে অথবা গিরিগুহায় যাইয়া আত্মানুভূতির জন্য তপস্যারত আছেন। ধর্মগুরুরূপে সমাজে আবির্ভূত হইবার পূর্বে তাঁহারা সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যাকুল। আলমবাজারে মঠ উঠিয়া যাইবার পূর্বেই দলপতি নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া একাকী তীর্থভ্রমণ ও তপশ্চর্যা করিতেছিলেন। পরবর্তী বৎসরে তিনি সমুদ্র পার হইয়া আমেরিকা গমন করেন এবং অল্পকাল মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ রূপে বিশ্ববিখ্যাত হন। এই শুভ সংবাদ পাইয়া আলমবাজার মঠে গুরুভাইগণ যারপরনাই আনন্দিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা সত্য হইতে দেখিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাঁহারা এখন বুঝিলেন, কেন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দলপতির পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা নরেন্দ্রনাথের মাহাত্ম্য বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইলেন। দিবারাত্রি নরেন্দ্র প্রসঙ্গে মাতিয়া রহিলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের মনে অপূর্ব প্রেরণা আসিল। ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পূর্বাভাস তাঁহাদের মানসপটে রেখাপাত করিল এবং গুরু দায়িত্ববোধ জাগিল। অন্তরে অন্তরে তাঁহারা বুঝিলেন, ঠাকুর তাঁহাদের জীবনপথের প্রদর্শক এবং ভাগ্য-চক্রের নিয়ামক। দলপতির অদ্ভুত সাফল্যে ও সুখ্যাতিতে তাঁহাদের সাধনা বহুগুণে ঘনীভূত হইল। নরেন্দ্রনাথ পূর্বে তাঁহাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন সেইগুলি এখন নবালোকে প্রতিভাত হইল। অবিজ্ঞাত স্বপ্নাতীত ধর্মরাজ্য তাঁহাদের মানসনয়নে ভাসিয়া উঠিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চাত্য বিজয় করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত মহাভারতকে বিদ্যুদ্বেগে আলোড়িত করিয়া আলমবাজার মঠে আসিলেন। তখন গুরুভ্রাতৃবৃন্দ বিশ্বাস করিলেন, নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্বাণী কত সত্য। স্বামী বিবেকানন্দ যখন

আলমবাজার মঠে বাস করিতেছিলেন তখন তাঁহার সেবাশুশ্রূষাই হইল স্বামী নির্মলানন্দের প্রধান কর্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর হইতে গত দশ বৎসর যাবৎ তিনি নরেন্দ্রের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার চারিত্রিক নির্মলতা, মানসিক সৎসাহস এবং বহুমুখী প্রতিভায় নরেন্দ্রনাথ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তুলসীদাসও বাল্যকাল হইতে নরেন্দ্রকে আদর্শ তরুণ রূপে ভালবাসিয়াছিলেন। আলমবাজার মঠে নানাস্থানে ভ্রাম্যমাণ গুরুভ্রাতৃবৃন্দ আসিয়া দলপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তন্মধ্যে অসীম সামর্থ্য ও প্রতিভা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন তাঁহাদের দলপতিরূপে নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যকর্মের জন্য অবতীর্ণ। স্বামী নির্মলানন্দের গভীর প্রত্যয় জন্মিল যে, যতিরাজ বিবেকানন্দই ভিন্ন রূপে রামকৃষ্ণ। সুতরাং দলপতির প্রতি নির্মলানন্দজীর অনুরাগ ও সম্প্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত ও সুগভীর ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ও নির্মলানন্দ উভয়েই একত্র বসিয়া এক হুঁকাতে তামাক খাইতেন ও পরস্পরের প্রতি রসিকতা করিতেন। নরেন্দ্রও তুলসীর সহিত সর্ববিষয়ে পরামর্শ করিয়া চলিতেন।

পরবর্তী কালে স্বামী নির্মলানন্দ নিজেকে স্বামীজির সেবকরূপে পরিচয় দিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। এই উক্তিও অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। স্বামী নির্মলানন্দ উচ্চ শ্রেণীর সুপাচক ছিলেন। রান্নাদি ব্যাপারে তাঁহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অনতিক্রম্য ছিল। প্রায়ই তিনি বিবিধ আহার্য রান্না করিয়া নরেন্দ্রকে প্রীতিভরে খাওয়াইতেন এবং নরেন্দ্রও তাঁহার রান্না খাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। তখন নরেন্দ্রনাথ পরিমিত মাত্রায় মাংসের ঝোল খাইতেন। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কোন সুচিকিৎসক তাঁহাকে উক্ত পথ্যের ব্যবস্থা দেন। তুলসী প্রত্যহ তদনুযায়ী মাংসের ঝোল রাঁধিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণে নরেন্দ্রকে খাইতে দিতেন। একদিন মাংসের ঝোল এত সুপক্ক ও সুস্বাদু হইয়াছিল যে, নরেন্দ্র বালকবৎ বলিয়া উঠিলেন, "ভাই তুলসী, আর একটুকরা মাংস দিবে কি?" নরেন্দ্র এত জেদ করিলেন যে, তুলসী তাঁহাকে ইহা দিতে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তুলসী তাঁহাকে আর এক টুকরা মাংস দিলেন এবং নরেন্দ্র তাহা সহাস্যে খাইয়া আজন্ম অভিনেতার মত তুলসীকে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যখন ডাক্তার পরিমিত পথ্যের ব্যবস্থা দিয়াছেন তখন তুমি তাহা ব্যতিক্রম করিয়া আমাকে বেশী মাংস খাওয়াইলে?" ইহাতে অপ্রতিভ না হইয়া তুলসী প্রত্যুত্তর দিলেন,

"যাঁহার করতলে সমগ্র বিশ্ব বিরাজিত, তিনি যখন এক খণ্ড মাংসের প্রার্থী হন তখন তাঁহাকে কে তাহা না দিবে ?" উভয়ে এই কৌতুকে প্রাণ ভরিয়া হাসিতে লাগিলেন। অন্য এক সময় নরেন্দ্র নয় দশ জন সঙ্গী লইয়া দার্জিলিঙ যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সকাল প্রায় নয়টার সময় নরেন্দ্র তুলসীকে বলিলেন, "আমরা নয় দশ জন দশটার সময় দার্জিলিঙ যাব, শীঘ্র আমাদের জন্য খাবার তৈরী করে দাও।" এক ঘণ্টার মধ্যে দশ জনের জন্য আহার্য প্রস্তুত করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তুলসী সর্বকার্যে সাহস করিয়া হস্তক্ষেপ করিতেন। তিনি অবিলম্বে নয়-দশটি স্টোভ জ্বালিয়া নানা প্রকার অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া নরেন্দ্র প্রমুখ নয়-দশ জনকে খাওয়াইলেন। তুলসী অন্যান্য গুরুভাই অপেক্ষা নরেন্দ্রের সহিত অধিকতর স্বাধীনভাবে মিশিতেন। একদা মিশনের প্রতীকে হংসমুদ্রার রূপক অর্থ ও অন্তর্নিহিতভাব ব্যাখ্যা করিতে তিনি ও শশীমহারাজ নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে ভাবাবিষ্ট হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম এখানে দেওয়া হইল। "প্রতীকের চারিদিকে কুণ্ডলাকার যে সর্প দেখা যায় তাহা অনন্ত ব্রহ্মের প্রতীক। মধ্যস্থলে দৃশ্যমান সূর্য, হংস, পদ্ম ও তরঙ্গ যথাক্রমে জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্মের প্রতীক। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম বা যোগ মার্গে ব্রহ্মলাভ হয়। এক বা একাধিক মার্গ অবলম্বনে অন্তরস্থ ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।" তুলসীই একদিন হঠাৎ কোন আয়োজন না করিয়া স্বামী শুদ্ধানন্দকে দীক্ষাদানের জন্য নরেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ ওরফে সুধীরমহারাজ পরবর্তী-কালে বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। সুধীর মহারাজ "স্বামীজির কথা" শীর্ষক গ্রন্থে অস্ফুটস্মৃতি নামক অধ্যায়ে স্বীয় গুরুর পুণ্য স্মৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে আছে "১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে আমি আলমবাজার মঠে আশ্রয় গ্রহণ করি। তখন প্রবীণ সন্ন্যাসীদের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ, নির্মলানন্দ ও সুবোধানন্দ তথায় ছিলেন। স্বামীজি দার্জিলিঙ হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও যোগানন্দ এবং কয়েকজন নিজ শিষ্য সমভিব্যাহারে ফিরিলেন। একদিন এক প্রাতে আমি স্বীয় কক্ষে অন্য কার্যে ব্যাপৃত ছিলাম। হঠাৎ তুলসী মহারাজ আমার ঘরে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি স্বামিজীর নিকট হইতে দীক্ষা লইবে কি ?' আমি সহাস্যে সম্মতি জানাইলাম। আমি তৎপূর্বে কাহারও নিকট দীক্ষা লই নাই। যদিও আমি স্বামিজীর

গ্রন্থাবলী পড়িয়াছিলাম, তথাপি আমি তাঁহার নিকট কোন ধর্মোপদেশ বা মন্ত্রদীক্ষা লই নাই বা লইবার চেষ্টা করি নাই। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহার নিকট দীক্ষা চাহিতে আমি সাহস করি নাই। আমার এই ধারণা ছিল যে, আমি যখন তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লইয়াছি, আমার যাহা কল্যাণকর তাহা তিনি অবশ্যই করিবেন। উপরন্তু আমি জানিতাম না, কিরূপে ধর্মোপদেশ বা মন্ত্রদীক্ষা দেওয়া হয়। আমি যখন এইরূপ অবস্থায় ছিলাম তখনই একদিন আমাকে স্বামী নির্মলানন্দ দীক্ষা লইতে পরামর্শ দিলেন। সেইজন্য আমি আদৌ ইতঃস্ততঃ না করিয়া সোজাসুজি তাঁহার পশ্চাতে ঠাকুর ঘরে গেলাম। আমি জানিতাম না যে, সেদিন শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর দীক্ষা হইতেছিল। আমার মনে হয় তাঁহার দীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি দীক্ষার জন্য ঠাকুর ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিলাম। যখন শরৎচন্দ্র বাহিরে আসিলেন, তখন স্বামী নির্মলানন্দ আমাকে ঠাকুর ঘরে লইয়া গেলেন এবং আমাকে দীক্ষা দিবার জন্য স্বামীজিকে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজি আমাকে বসিতে বলিলেন এবং দীক্ষান্তে উপদেশ দিলেন, কিরূপে ভবিষ্যতে আমি জীবন যাপন করিব।" এইরূপ ছিল তুলসী মহারাজের হৃদয়বত্তা এবং নরেন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠতা। দুই জন শিষ্যকে দীক্ষাদানান্তে স্বামীজি উল্লসিত অন্তঃকরণে তুলসী মহারাজের নিকট মন্তব্য করিলেন "তুলসী, আজ দুইটি বলি হল।"

স্বামী নির্মলানন্দ শুধু যে নরেন্দ্রনাথের পাচক ও সেবক ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি মঠে নবাগত ব্রহ্মচারী-দিগের ব্রহ্মসূত্রাদি বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহায় মহৎ অন্তঃকরণ ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকা সত্বেও তাঁহার মধ্যে রসিকতার অভাব ছিল না। স্বামী বিবেকানন্দের কোন শিষ্য তুলসী মহারাজের সহিত আলোচিত বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিলেন। স্বামীজি স্বয়ং দোতলা হইতে নামিয়া স্বশিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা নির্মলানন্দের সহিত কি আলোচনা করিতেছিলে?"

শিষ্য—স্বামীজি, তিনি বলিলেন, তোমরা এবং তোমাদের স্বামীজি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে জান। অন্যপক্ষে আমরা জানি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। ইহার অর্থ শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান।

স্বামীজি—তোমরা কি বললে?

শিষ্য—আমি বলিলাম, আত্মাই সত্য ও নিত্য। কৃষ্ণ একজন আত্মজ্ঞ পুরুষ। স্বামী নির্মলানন্দ অন্তরে বেদান্তে বিশ্বাসী হইয়াও বাহিরে দ্বৈতবাদীর পক্ষাবলম্বনপূর্বক বিচার করিতেছেন। তাঁহার প্রথম ধারণা সম্ভবতঃ সাকার ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিবার পর ক্রমশঃ যুক্তি সহায়ে নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপের ধারণা দৃঢ়ীভূত করা। কিন্তু যখনই তিনি তাঁহাকে বৈষ্ণব বলেন তখনই আমি তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই এবং তাঁহার সহিত উষ্ণ আলোচনা করি।

স্বামীজি—সে তোমাকে ভালবাসে এবং সেজন্য তোমাকে চটিয়ে দিয়ে মজা পায়; কিন্তু তুমি তাঁর কথায় চটে যাও কেন? তুমিও বলবে, মশায়, আপনিও নাস্তিক।*

স্বামী নির্মলানন্দ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে তাঁহার গুরুদেবের সহিত কথোপ-কথনের সারমর্ম লিখিয়া রাখিতে উৎসাহিত করেন। ইহার ফলে শরৎচন্দ্র কর্তৃক 'স্বামী শিষ্যসংবাদ' নামক গ্রন্থ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার শরৎচন্দ্র স্বীকার করেন যে, এই শিষ্যকে স্বীয় গুরুর সহিত কথোপকথনের সারাংশ লিপিবদ্ধ করিতে বেলুড়মঠের স্বামী নির্মলানন্দ উৎসাহ দেন। উক্ত শিষ্য মাষ্টার মহাশয় এবং স্বামী নির্মলানন্দ—এই দুই মহাপুরুষের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

দলপতি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গলাভ করিলে শিক্ষা, প্রেরণা ও উৎসাহ পাওয়া যাইত। তৎকালে ইহা বিশেষভাবে সত্য ছিল। স্বীয় জীবনব্রত উদ্‌যাপনার্থ নরেন্দ্রনাথ গুরুভাইগণকে তৈয়ার করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিশ্বধর্ম বেদান্তের বার্তাবহরূপে গড়িতেছিলেন। একদা তিনি এই উদ্দেশ্য প্রকাশ-পূর্বক বলেন, "বর্তমান ভারতের যুগ-প্রয়োজন পূরণার্থ এমন এক নবীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করা দরকার যাহারা স্বীয় মুক্তি উপেক্ষা করিয়া অন্যের সেবা ও সাহায্য করিবার জন্য আবশ্যক হইলে নরকেও যাইবে।" এই সন্ন্যাসাদর্শ সম্পূর্ণ নূতন, অতিশয় বিপ্লবসূচক ও হৃদ্‌কম্পদায়ক। সকলে ইহা সহসা গ্রহণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু যাঁহারা ইহার মর্মার্থ গ্রহণে সমর্থ হইলেন তন্মধ্যে তুলসী ছিলেন অন্যতম। কথোপকথনে তুলসীর অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া দলপতি তাঁহাকে সুবক্তারূপে গড়িতে ইচ্ছা করিলেন। কিরূপে তিনি এই

---

* ১৯২২ খ্রীঃ কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত "স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী"তে (ইংরাজী, সপ্তম খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা) উল্লিখিত।

উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে লিখিতেছি। যখন নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ছিলেন তখন কোন সমিতি কর্তৃক তিনি বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হন। তিনি উক্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং নির্দিষ্ট দিবসে হঠাৎ তুলসীকে বলিলেন, "আমার পরিবর্তে তুমি সভায় গিয়ে আজ বক্তৃতা দাও। আমার শরীর ভাল নয়।" ইহা শুনিয়া তুলসী বিনয়সহকারে স্বীয় অক্ষমতা জানাইয়া বক্তৃতা দিতে অস্বীকার করিলেন। তখন দলপতি বলিলেন, "বেশ, তাহলে আমি কিছুই খাব না, জল পর্যন্ত না।" যখন তুলসী তাঁহার জন্য জলখাবার আনিয়া তৎসমক্ষে রাখিলেন তখন তিনি তাহা খাইলেন না। এই সম্বন্ধে পরবর্তীকালে স্বামী নির্মলানন্দ বলিয়াছিলেন, "অবাধ্যতার জন্য যদি তিনি আমাকে মঠ হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিতেন, আমি অবশ্যই চলিয়া যাইতাম; কিন্তু তাঁহার অনাহারের ভাবনায় আমি ব্যথিত হইলাম। তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য আমি সব কিছু করিতে পারিতাম। সে জন্য আমি বক্তৃতা দিবার জন্য যাইতে সম্মত হইলাম। ইহাতে তিনি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন এবং জলখাবার খাইলেন।" স্বামী নির্মলানন্দ উক্ত সমিতিতে যাইয়া বক্তৃতার প্রারম্ভে বলিলেন, "আপনারা সকলেই জানেন, আমি বক্তা নই; কিন্তু স্বামীজির আদেশে আপনাদিগকে দুই চারিটি কথা বলিতে আসিয়াছি। স্বামীজি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন এবং সভায় আসিতে না পারায় দুঃখিত হইয়াছেন।" যখন স্বামী নির্মলানন্দের বক্তৃতা শেষ হইল তখন সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দ একবাক্যে বলিলেন, তাঁহার বক্তৃতা জোরাল ও অতি দ্রুত হইয়াছিল। তুলসী দলপতির নিকট ফিরিবার পূর্বেই এই শুভ সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল। ইহা শুনিয়া তিনি যারপরনাই প্রীতিলাভ করিলেন এবং তুলসীর পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "বা! বেশ! তুলসী, আমি জানিতাম, তোমার মধ্যে বাগ্মিতা শক্তি আছে।" তুলসী তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দকে বলিতেন ইহাই ছিল স্বামীজির শিক্ষাদানের অভিনব পদ্ধতি। কর্মে প্রবৃত্ত না হইলে কর্মকৌশল অবগত হওয়া যায় না।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে মঠ আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটীতে উঠিয়া যায়। এখানেও বরাহনগর মঠের মত তপস্যানল প্রজ্জ্বলিত হইল। দলপতির সাহচর্যে গুরুভাইগণ পুনরায় জপ-ধ্যান, ভজন-কীর্তন, অধ্যয়ন-আলোচনায় জগৎ ভুলিলেন। দিবারাত্র ধর্মপ্রসঙ্গ ও শাস্ত্রচর্চার স্রোত বহিল। দলপতি শ্রোতাদিগকে ধর্ম বা দর্শন বিষয়ে সন্দেহগুলি

প্রকাশ করিতে বলিতেন এবং স্বয়ং ঐ সকলের আলোকপ্রদ সমাধান দিতেন। এই সকল প্রশ্নোত্তর সম্মিলনে তুলসী এত দ্রুত অথচ যথাযথ ও মর্মস্পর্শী উত্তর দিতেন যে, তাহা শুনিয়া নরেন্দ্রপ্রমুখ গুরুভাইগণ বিস্মিত হইতেন। এই প্রসঙ্গে বেলুড়মঠের প্রাচীন সাধু জ্ঞানমহারাজের কথাগুলির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পূজনীয় জ্ঞানমহারাজ স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। তিনি বলেন, "আমি তুলসী মহারাজকে ভালরূপ জানি। সে সকল বিগত দিনেও আমি দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছি। তাঁহার দেহ-মন বেশ সবল ছিল। তখন তিনি বেশ স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ছিলেন। তিনি নিজে ব্যায়াম করিতেন এবং অন্যকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। যখন স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গীত করিতেন তখন সাধারণতঃ তিনি পাখোয়াজ ও তবলা বাজাইতেন। যদিও তিনি ঐ সকল বাদ্যযন্ত্রে সুদক্ষ ছিলেন না তথাপি তিনি এই সকল যন্ত্র বেশ বাজাইতে পারিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রতি অতিশয় বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন ও তাঁহাকে খুব পছন্দ করিতেন। আমাদের মধ্যে কেহ কোন বিষয়ে ভুল করিয়া বসিলে স্বামীজি তুলসী মহারাজের নিকট অভিযোগ করিতেন। তুলসী মহারাজ স্বামীজির সহিত এবং আমাদের সহিত খেলা করিতেন। আমরা তখন হাডুডু, ফুটবল, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি ক্রীড়া করিতাম। স্বামীজির স্বাস্থ্য মন্দ থাকায় তিনি আমাদের সহিত তুলসী মহারাজের মত সর্বদা খেলিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার উপস্থিতি অতিশয় উৎসাহপ্রদ ও আনন্দদায়ক ছিল। তুলসী মহারাজ আমাদের সহিত মঠের বাগানে ও মাঠে কাজ করিতেন। তিনি অতিশয় শ্রমশীল ছিলেন এবং কর্মকৌশল জানিতেন। তিনি কখনও কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে চেষ্টিত হইতেন না। তিনি আগাগোড়া স্বাধীনচেতা সাধু ছিলেন। তিনি সরল ও তেজস্বী লোককে পছন্দ করিতেন। তিনি যেমন প্রীতিপ্রবণ তেমনি স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি মঠে ও বাহিরে এমন মনোনীত বন্ধুদের সহিত মিশিতেন, যাঁহাদের প্রকৃতি তাঁহার মতই ছিল। আমরা মঠে ও অন্যত্র তাঁহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়াছি। তিনি জটিল দার্শনিক সমস্যার খুব সহজ ও সুস্পষ্ট সমাধান দিতেন। কথোপকথন ক্লাশে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার প্রশ্নোত্তর ক্লাশ গুলিও অতুলনীয় ও শ্রবণযোগ্য ছিল। কেহ তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিলে তিনি উহা সাধারণ ব্যক্তি অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভাবে উত্তর দিতেন। তাঁহার উত্তর অপ্রত্যাশিত ও সন্দেহনাশক হইত।

তিনি আমাদের সহিত এবং এমন কি, স্বামীজির সহিতও কৌতুক করিতেন। তিনি আমাদিগকে নৃত্য-গীত করিতে উৎসাহ দিতেন; কিন্তু স্বয়ং কখনও নৃত্যে যোগদান করেন নাই। তিনি সঙ্গীত ভালবাসিতেন এবং ভাল গাহিতে পারিতেন। তবে আমার মনে পড়েনা, তিনি আমাদের সঙ্গে কখনও গান করিয়াছিলেন কিনা। তিনি খুব পরিষ্কার পরিছন্ন থাকিতেন এবং অতিশয় মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার মধুর স্বভাব সত্বেও তাঁহার তেজস্বিতার জন্য লোকে তাঁহাকে ভুল বুঝিত। যখন তিনি আমেরিকা হইতে ফিরিলেন তখন তাঁহাকে পূর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যবান ও বলবান দেখা গেল। তখনকার দিনে তিনি বেলুড়মঠে ঠাকুর-পূজা করিতেন, কিন্তু সর্বদা নহে। তিনি কিছু কাল বেলুড়মঠের ম্যানেজারও ছিলেন। কোন কিছু তাঁহার অপছন্দ হইলে তিনি সরলভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিতেন এবং তাহা হইতে দূরে থাকিতেন। তিনি সরল-স্বভাব ও স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং অনেকে তাঁহাকে পছন্দ করিতেন ও ভালবাসিতেন। তিনি বহু বার তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন।”

বেলুড় গ্রামে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগান বাড়ীতে যখন মঠ ছিল তখন দলপতি ব্রাহ্মণেতর হিন্দুগণকে ব্রাহ্মণত্ব দানের জন্য সাহসপূর্বক এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। গঙ্গাস্নানান্তে উপবীত ও গায়ত্রী মন্ত্র দিয়া তিনি বহু ভক্তিমান অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ দক্ষিণ ভারতে স্বামীজির এই মত কার্যে পরিণত করেন। মালাবার প্রদেশে ওট্টপালম্ নামক স্থানে বহু ভক্তিমান অব্রাহ্মণকে তিনি গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত ও উপবীতে ভূষিত করিরা ব্রাহ্মণপদে উন্নীত করেন। বেলুড় গ্রামে ভাড়া বাড়ীতে যখন মঠ ছিল তখন স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশী মহিলা, গোঁড়া হিন্দুর চক্ষে ম্লেচ্ছ নারী, কুমারী মার্গারেট নোবেলকে বৈদিক প্রথায় ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দেন। এই ঘটনা বেলুড়মঠের ইতিহাসে অসাধারণ ও অভূতপূর্ব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা অপেক্ষা আরও স্মরণযোগ্য ঘটনা, কিরূপে সারদাদেবী ইউরোপীয় স্ত্রীভক্তগণকে আদর আপ্যায়ন করিতেন এবং গোপালের মা অঘোরমণি কিরূপে তাঁহাদের সঙ্গে খাইতেন ও থাকিতেন। আবার এখানে দলপতি প্লেগ রোগে আক্রান্ত রোগীদের সেবাকার্য কলিকাতায় আরম্ভ করেন এবং বলেন, অর্থাভাব হইলে রোগী সেবার জন্য মঠের জমি-বাড়ী বিক্রয় করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন যে, তুই

আমাকে মাথায় করে যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেখানেই থাকব।" যখন বেলুড় মঠের জমি কেনা হইল তখন নরেন্দ্রনাথ তাঁহার গুরুভাইগণ ও শিষ্যবৃন্দ ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ঠাকুরের পূত ভস্মাস্থি ডান কাঁধে বহিয়া নিয়া নব-নির্মিত ঠাকুরঘরে স্থাপন করিলেন। এই উৎসর্গানুষ্ঠান সুগম্ভীর ও স্মরণীয়। প্রিয় শিষ্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঠাকুর এখানে সাক্ষাৎ বিরাজ করিতে লাগিলেন। পূজনীয় নাগমহাশয় বেলুড়মঠে আসিয়া স্বামীজিকে বলিয়াছিলেন, "রাণী রাসমণির কালী-বাড়ী থেকে এখানে এসে দেখলাম, ঠাকুর সেখানে নেই, এখানে এসে বসেছেন। আপনি তাঁকে এখানে এনে বসিয়েছেন। আপনি যেখানে তাঁকে বসাবেন তিনি সেইখানেই থাকবেন।" এই সকল অনুষ্ঠানে স্বামী নির্মলানন্দ দলপতির দক্ষিণহস্ত হইতেন। তিনি স্বামীজির সর্বকার্যের সচেতন দ্রষ্টা ছিলেন। স্বামীজির প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক চিন্তা তিনি সযত্নে গ্রহণ ও অনুধাবন করিতেন ও অভিভূত হইতেন। এই ছাঁচেই তিনি গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কাঁচপোকা যেমন ভয়ে আরসোলাকে ভাবিতে ভাবিতে আরসোলাই হইয়া যায় তেমনি তুলসী স্বামীজির সপ্রেম ভাবনায় তদ্রূপ হইয়া গেলেন। তিনি এবং হরি মহারাজ মঠবাসী ব্রহ্মচারীগণকে সংস্কৃত পড়াইতেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা দিতেন। হরি মহারাজ কাথিয়া-বাড় ও সুদূর পাশ্চাত্যে চলিয়া যাইবার পর এই কাজ প্রধানতঃ তুলসীর উপর পড়িল। স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত দিনলিপি হইতে জানা যায়, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতা হইতে বেলুড়মঠে স্বামী শিবানন্দের সহিত ফিরিলেন এবং স্বামী নির্মলানন্দকে মঠের কার্যভার লইতে বলিলেন। তুলসী মহারাজ কর্তৃক উক্ত দায়িত্ব গ্রহণের দুইদিন পরে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে যথাক্রমে গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ে ঠাকুরের বাণী প্রচার করিতে পাঠাইলেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নির্মলানন্দ রাজপুতনায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীগণের সেবাকার্য করিতে যান। সেই বৎসর দলপতি দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশ গমনার্থ সমুদ্রযাত্রা করেন এবং পর বৎসর মঠে কোন সংবাদ না দিয়া ফিরিয়া আসেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর বেলুড়মঠে রাত্রিতে যখন গুরুভাইগণ খাইতে বসিয়াছেন তখন মঠের মালী ফটকের চাবি চাহিতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "এক সাহেব এসেছেন।" এই সংবাদে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল।

সাহেব কে হইতে পারেন ? এই সম্বন্ধে যখন আলোচনা চলিতেছিল তখন সাহেব স্বয়ং তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইলেন ! স্বামীজি চাবির জন্য অপেক্ষা না করিয়া বালকের মত ফটকের দরজা ডিঙ্গাইয়া আসিলেন ! অল্প দেরীও তাঁহার সহ্য হইল না। নৈশ ভোজনের ঘণ্টা তিনি শুনিয়াছেন। সত্বর না গেলে পাছে তাঁহার জন্য খাবার না থাকে, সে জন্য তিনি ছুটিয়া আসিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন, এই সাহেব তাঁহাদের প্রিয়তম দলপতি নরেন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন, তখন তাঁহার অপ্রত্যাশিত আগমনে তাঁহারা আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হইলেন। অবিলম্বে আসন পাতিয়া তাঁহাকে খিচুড়ী খাইতে দেওয়া হইল। শ্রদ্ধেয় অতিথি পরম আনন্দ ও কৌতুক সহকারে উহা ভোজন করিলেন। সারারাত্রি কথাবার্তা, গান-বাজনা, আনন্দ এবং উত্তেজনায় অতিবাহিত হইল। বলরাম-মন্দিরের নরেশচন্দ্র ঘোষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "স্বামীজিরা সমস্ত রাত্রি গল্প করিয়া ও আনন্দে মাতিয়া কাটাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে গভীর প্রীতির টান দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী নির্মলানন্দ একত্রে তামাক খাইতে খাইতে হাসি তামাসা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ গল্প গুজব করিবার পর স্বামী বিবেকানন্দ গান ধরিলেন এবং স্বামী নির্মলানন্দ পাখোয়াজ বাজাইলেন।"

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণের প্রথম অধিবেশন স্বামী বিবেকানন্দের উপস্থিতিতে বসিল। ইহাতে সর্ব-সম্মতিক্রমে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী নির্মলানন্দ যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। স্বামী নির্মলানন্দ এই অতিরিক্ত কার্যভার অসাধারণ যোগ্যতা ও ক্ষিপ্রতাসহকারে সম্পন্ন করেন। পর বৎসর যখন দলপতি সম্ভবতঃ মায়াবতীতে যান তখন তুলসী মহারাজ এই কার্য হইতে অবসর লইয়া তপস্যার্থে তাঁহার প্রিয় স্থান হিমালয়ে প্রস্থান করেন। দীর্ঘকাল অতীত হইবার পরও যখন দেখা গেল, তিনি ফিরিলেন না তখন স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারকার্য করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিলেন। তপস্যারত গুরুভাই উত্তর দিলেন, "আমি আরও কিছু কাল তপস্যা করিতে ইচ্ছা করি।" স্বামীজি তাঁহাকে আবার লিখিলেন, "ভারতে ভ্রাম্যমাণ ভবঘুরে সন্ন্যাসীর অভাব নাই, আমার ইচ্ছা নয় যে, তুমি তাহাদের দলভুক্ত হও"। কিন্তু তপস্বী সন্ন্যাসী স্বামীজির সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া রহিলেন। ইহার কিছু

কাল পরে একদিন বেলুড়মঠ হইতে তাঁহার নিকট এক দুঃসংবাদ বহনপূর্বক টেলিগ্রাম আসিল। হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইহা প্রত্যাগমনের জরুরী আহ্বান; কিন্তু যখন তিনি ইহা খুলিয়া পড়িলেন, তখন তিনি দুঃখে ও শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। ইহা ঘোষণা করিল, তাঁহার প্রিয়তম গুরুভাই, দলপতি ও জীবন-সর্বস্বের মহাসমাধি। ইহা দুঃসহ সংবাদ অপেক্ষাও মর্মদাহী ছিল। তিনি যেন বজ্রাহত হইলেন এবং অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। দলপতির অদর্শনে তাঁহার জীবন দুর্বহ বোধ হইল। মধ্য রাত্রে তাঁহার এক অলৌকিক অনুভূতি হইল। তাঁহার শিবতুল্য গুরুভাই তৎপার্শ্বে যাইয়া তাঁহার রোগ-শয্যায় বসিলেন এবং পূর্ববৎ মিষ্ট বাক্যে বলিলেন, "তুলসী, তুমি ভেবেছ, আমি তোমাকে ত্যাগ করেছি। না ভাই, আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে আছি। সাহসে বুক বেঁধে উঠে পড়।" ইহাতে শোকসন্তপ্ত গুরুভ্রাতা আশ্বস্ত হইলেন এবং অচিরে রোগশয্যা হইতে উঠিলেন। অনন্তর তিনি বেলুড়মঠে না ফিরিয়া কাশ্মীরে গেলেন এবং তথায় সাংঘাতিক ভাবে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলেন

আট

আমেরিকায় তিন বৎসর*

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সতের জন সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে যে ছয়জন সাগরপারে আমেরিকায় যাইয়া গুরুবাণী প্রচার করেন তাঁহাদের নাম স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ ও নির্মলানন্দ, ইঁহাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সর্বাগ্রণী ও দলপতি ছিলেন এবং ১৮৯৩ খ্রীঃ চিকাগো নগরীস্থ মহাধর্ম সম্মেলনে তাঁহার সাফল্য দ্বারা আধুনিক হিন্দুধর্মের বিজয়াভিযান সূচিত

---

* কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকাতে' ২২শে পৌষ ১৩৬১ (৭ই জানুয়ারী ১৯৫৫ খ্রীঃ) স্বামী নির্মলানন্দের ৯২তম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত। ইহার ইংরেজী অনুবাদ ৭ই জানুয়ারী ১৯৫৫ খ্রীঃ কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইংরাজি দৈনিক 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ড'-এ প্রকাশিত হয়। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইংরাজি মাসিক 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার ১৯৫৫ মার্চ সংখ্যায় এই সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হয়। স্বামী অভেদানন্দ এইজন্য পঁচিশ বৎসরাধিক আমেরিকায় ছিলেন এবং সতের বার আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত সানফ্রান্সিস্কোস্থ হিন্দুমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং পনের বৎসর অক্লান্ত কর্ম করিবার পর তথায় দেহত্যাগ করেন। তিন জন স্বামীজি দুই তিন বৎসর তথায় বেদান্ত প্রচারান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে স্বামী নির্মলানন্দ কাশ্মীরে ছিলেন। কঠিন নিউমোনিয়া রোগে ভুগিয়া তিনি দুর্বল হইয়া পড়েন। কাশ্মীরের তৎকালীন দেওয়ান নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ধর্মপত্নী তাঁহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়া দেন এবং বেলুড়মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে পত্রে এই সংবাদ জানান। বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটী ভাড়া লইয়া ১৮৯৭-৯৮ খ্রীঃ শ্রীরামকৃষ্ণমঠ আলমবাজার হইতে প্রথমে তথায় আনা হয়। স্বামী নির্মলানন্দের অসুখের সংবাদ পাইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ তারযোগে নব্বই টাকা তাঁহাকে পাঠান এবং অবিলম্বে কলিকাতায় আসিতে লিখেন। গুরুভ্রাতা কর্তৃক প্রেরিত পাথেয় পাইয়া স্বামী নির্মলানন্দ সত্বর কলিকাতায় আসেন। তখন বেলুড়মঠের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তিনি শ্রীরামকৃষ্ণমঠ ও মিশনের এক ট্রাষ্টি নির্বাচিত হন; কিন্তু তিনি উক্ত ট্রাষ্টি পদ গ্রহণ না করিয়া পূর্ববৎ সঙ্ঘসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। সাত বৎসর পূর্বে স্বামী অভেদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে আমেরিকায় যাইয়া নিউইয়র্ক মহানগরীতে বেদান্ত প্রচার করিতে-ছিলেন। গুরুভ্রাতা বাল্যবন্ধু নির্মলানন্দকে সহকর্মীরূপে পাইবার জন্য তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে পত্র লিখেন। উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী নির্মলানন্দকে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারার্থ যাইতে বলেন। তদনুযায়ী স্বামী নির্মলানন্দ ১৯০৩ খ্রীঃ ১৩ই অক্টোবর বেলুড়মঠ হইতে বোম্বাই যাত্রা করেন এবং তথা হইতে ১৫ই অক্টোবর জাহাজে উঠিয়া ইটালি দেশের নেপল্স বন্দরে উপস্থিত হন। তথা হইতে তিনি জেনেভায় যাইয়া এক আন্তর্জাতিক ধর্মসভায় যোগ দেন এবং পুনরায় জাহাজে চড়িয়া আটলান্টিক মহাসাগর পার হইয়া ২৫শে নভেম্বর বুধবার নিউইয়র্কে উপস্থিত হন। স্বামী অভেদানন্দ জাহাজঘাটে যাইয়া গুরুভ্রাতাকে সাদর সম্ভাষণ জানান। অনন্তর তিনি তথায় স্বামী অভেদানন্দ ও নিউইয়র্ক-বেদান্ত-সমিতির সভ্যগণের সাদর অভিনন্দন লাভ করেন। উক্ত সমিতির কার্য বহুমুখে প্রসারিত

হওয়ায় স্বামী অভেদানন্দ একাকী তাহা সারিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। বেদান্ত প্রচারার্থ স্বামী অভেদানন্দকে প্রায়ই আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে এমন কি ইউরোপের নানা দেশে যাইতে হইত। নিউইয়র্ক-সমিতির নিয়মিত অধিবেশনাদি সেজন্য বন্ধ থাকিত এবং অন্যান্য কার্যও ব্যাহত হইত। স্বামী নির্মলানন্দের উপস্থিতিতে সমিতির কার্যসূচী অব্যাহতভাবে চলিতে লাগিল। স্বামী অভেদানন্দের উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে স্বামী নির্মলানন্দ যথাক্রমে সহকারী ও অধ্যক্ষরূপে সমিতির কার্যচালনা করিতেন। অসীম উদ্যম ও অনন্ত আগ্রহ সহকারে কার্য করিয়া স্বামী নির্মলানন্দ অচিরে বহু সভ্যের শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্জন করেন। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিলেন তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন যে, তাঁহার দ্বারা সমিতির সমুন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কর্মকুশল আমেরিকা-বাসী অপেক্ষাও তিনি অধিকতর কর্মপটু ছিলেন এবং অনুরাগী সভ্যগণের সহিত নিত্য ধ্যানাভ্যাস প্রচলন করিলেন। ইহাতে ধর্মপিপাসু সভ্যগণ অতিশয় উপকৃত হইলেন। ১২ই ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃতশিক্ষার জন্যও একটি ক্লাশ খুলিলেন। তাঁহার কর্মপটুতার প্রথম সাফল্যের বিবরণ 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরাজী মাসিকের নবম বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী মঙ্গলবার নিউইয়র্ক-বেদান্ত-সমিতিতে বাৎসরিক বিবেকানন্দ স্মৃতিসভা তাঁহার নায়কত্বে সুসম্পন্ন হয়। উল্লিখিত 'প্রবুদ্ধ-ভারত' পত্রিকায় উহার যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহাতে আছে,—'সন্ধ্যার পর যে স্মৃতিসভা হয় তাহাতে স্বামী নির্মলানন্দ অনন্তর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রোতাদের নিকট ইহা বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। কারণ ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের এমন কতকগুলি ঘটনা বিবৃত ছিল, যাহা তাঁহার মার্কিণী বন্ধুদের অজ্ঞাত। ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস জীবনের প্রথম ভাগের ঘটনাবলীও সংক্ষেপে বর্ণিত ছিল। স্বামীজি পরবর্তীকালে যে দিগ্বিজয় ও সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন তাহার সার্থক প্রস্তুতির শিক্ষাপ্রদ বিবরণ উহাতে পাওয়া যায়। বেদোপনিষদের যে যে অংশ স্বামীজীর অতি প্রিয় ও নিত্যপাঠ্য ছিল সেগুলি উক্ত সভায় মিষ্ট সুরে তিনি বৈকাল তিনটা হইতে ছয়টা পর্যন্ত সানুবাদ আবৃত্তি করিলেন। পরিশেষে স্বামী অভেদানন্দ সভার কার্য সাঙ্গ করিবার সময় স্বামী নির্মলানন্দের কর্মকুশলতার প্রশংসা করেন এবং তিনি সমিতির নানাদিকে যে প্রেরণা দিয়াছিলেন তাহাও উল্লেখ করেন।'

ঐদিন দুই গুরুভ্রাতা সারাদিন উপবাস করিয়া রাত্রে আহার করেন। দুই-তিন মাস পরে সমিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের সময় তিনি বৈকালে ৩॥টা হইতে ৫টা পর্যন্ত দেড় ঘণ্টা ধরিয়া পূজাপাঠ ও ভজনাদি করেন। নিউইয়র্কে উপস্থিত হইবার দুই-তিন মাস পরেই তাঁহাকে সমিতিতে যোগ ক্লাশের ভার গ্রহণ করিতে হয়। ইহার ফলে স্বামী অভেদানন্দ অন্যত্র যাইয়া বেদান্ত প্রচারের অবসর পাইলেন। ২৬শে ফেব্রুয়ারী স্বামী অভেদানন্দ ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আক্রান্ত হইলে স্বামী নির্মলানন্দের উপর যোগ ক্লাশের ভার পড়ে। তিনি সমিতিতে স্থায়ীভাবে অবস্থানপূর্বক অব্যাহতভাবে যোগ ক্লাশাদি পরিচালনা করায় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সমিতি স্থাপিত হইবার পর সর্বপ্রথম গ্রীষ্মকালের কার্যসূচী সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হয়। যে সভ্যগণ গ্রীষ্মাবকাশে নগরীর বাহিরে যাইতে পারেন নাই এবং যাঁহারা অন্য স্থান হইতে নিউইয়র্ক নগরে অল্প অল্প সময়ের জন্য আসিতেন তাঁহাদের পক্ষে উহা অতিশয় হিতকর ও সন্তোষজনক হইয়াছিল। ইহার ফলে সভ্যদের মধ্যে গোষ্ঠীভাব পরিপুষ্ট, সমিতির কর্মক্ষেত্র পরিবর্ধিত এবং প্রত্যেকের উৎসাহ সমৃদ্ধ হয়। এই সংবাদ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার দশম বর্ষে একাধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই এবং ১৬ই মার্চ স্বামী নির্মলানন্দ ব্রুকলিন এ্যাসেমব্লি হলে যথাক্রমে বেদান্ত-দর্শনের সার্বভৌমিকতা এবং আত্মজ্ঞানের রহস্য সম্বন্ধে ভাষণ দেন। উক্ত বৎসর ৫ই মার্চ 'নিউইয়র্ক মেল ও এক্সপ্রেসে' একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী নির্মলানন্দের প্রচার এবং তজ্জন্য আমেরিকায় বেদান্ত প্রসারের জন্য ভীতি প্রকাশই উক্ত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত প্রবন্ধের এক অংশে ছিল, "অনেকে ইহা জানিয়া চমৎকৃত হইবেন, যদিও ভীত হইবেন না যে, দুইজন হিন্দু সন্ন্যাসী আমেরিকায় তাঁহাদের ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা যে হিন্দুধর্ম প্রচার করেন তাহা তাঁহাদের গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের আলোকে ব্যাখ্যাত হয়। নিউইয়র্ক নগরের বহু নাগরিক তাঁহাদের অনুরাগী হইয়াছেন এবং অনুরক্ত নাগরিকদের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধমান। উক্ত সন্ন্যাসীদ্বয় কোন কোন গীর্জা ও ক্লাবের আকারে একটি সমিতি গঠনে সমর্থ হইয়াছেন এবং উক্ত সমিতির জন্য ১০পূর্ব ৫৮ ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন। উল্লিখিত সমিতি-ভবনে মন্দির ও দেব-

মূর্তি বিদ্যমান। একজন সন্ন্যাসী নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ ধ্যান শিক্ষা দেন। যাঁহারা ধ্যানাভ্যাস করিতে চাহেন তাঁহারাই নিমন্ত্রিত হন। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে পৌত্তলিকগণ কর্তৃক আমেরিকা আক্রমণ বলা যায়। ব্যক্তিগত ধর্মশিক্ষাও সর্বপ্রার্থীকে তাঁহারা অকুণ্ঠচিত্তে দিয়া থাকেন। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মত অভেদানন্দ ও নির্মলানন্দ স্বামীদ্বয় মনোরোগ চিকিৎসা করিয়া থাকেন।"

উক্ত বর্ষের মধ্য ভাগে স্বামী অভেদানন্দ ইউরোপে গমন করেন এবং ৬ই অক্টোবর নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসেন। স্বামী নির্মলানন্দ ষ্টেসনে যাইয়া প্রত্যাগত গুরুভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তিনিই তৎপর রবিবাসরীয় ধ্যান শিক্ষারও ভার গ্রহণ করেন ১লা নভেম্বর হইতে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারী সমিতি-ভবনে স্বামী বিবেকানন্দ স্মৃতি-সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বামী নির্মলানন্দ ইহাতে উপনিষৎ পাঠ করেন। ৩০শে জানুয়ারী স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী নির্মলানন্দ ব্রুকলিনে যাইয়া একটি বেদান্ত-কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং স্বামী নির্মলানন্দ উহারও পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন। ৫ই ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্ক-বেদান্ত-সমিতিতে 'বেদে ঈশ্বরবাদ' সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দেন উহা শ্রোতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রশংসিত হয়। উক্ত বর্ষে ৮ই মার্চ সমিতি-ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। উহাতে স্বামী নির্মলানন্দ মধ্যাহ্নে ১১টা হইতে ১টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা কাল ধ্যানাভ্যাস পরিচালনা করেন এবং স্বামী অভেদানন্দ চণ্ডী পাঠ করেন। উহাতে স্বামী নির্মলানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। উক্ত বর্ষের শেষার্দ্ধে স্বামী অভেদানন্দ মেক্সিকো দেশে গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্বামী নির্মলানন্দ নিউইয়র্ক-সমিতির সকল ক্লাশ ও বক্তৃতা দক্ষতা সহকারে পরিচালনা করেন। স্বামী অভেদানন্দের প্রত্যাগমনের পরেও স্বামী নির্মলানন্দ প্রত্যেক সোমবার ও বুধবার সমিতিতে উপনিষদের ক্লাশ করিতেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারী বিবেকানন্দ-স্মৃতি-সভায় স্বামী নির্মলানন্দ বিশ্ববরেণ্য গুরুভ্রাতার জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন, ইহা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ আনন্দ প্রকাশ করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে স্বামী অভেদানন্দ কানাডায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহূত হন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্বামী নির্মলানন্দ নিউইয়র্ক-বেদান্ত-সমিতির কার্যভার গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি প্রথম রবিবাসরীয় বক্তৃতা দেন। উক্ত ভাষণের বিষয় ছিল উপনিষদে ঈশ্বরতত্ত্ব। তাঁহার ভাবধারার সুস্পষ্টতা

ও শক্তিমত্তা এবং উহা প্রকাশের সাবলীলতা ও দ্রুতবেগ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিল যে, তিনি একজন সুপণ্ডিত ও সুবক্তা। নিউইয়র্কের অধ্যাপক পার্কার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণও তাঁহার বক্তৃতায় ও ক্লাশে শ্রোতারূপে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। ভারতীয় দার্শনিক কপিলের প্রতি পার্কার গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি মহোৎসাহসহকারে স্বামী নির্মলানন্দকে বলিতেন, "স্বামিজী, আপনাদের কপিল মুনি কি অদ্ভুত মনীষী ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনের জনক ছিলেন। অধ্যাপক পার্কার তাঁহার ছুটির দিনেও অবসর সময় স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী নির্মলানন্দের সান্নিধ্যে সমিতিতে কাটাইতেন। তাঁহারা তিন জন প্রায়ই একত্রে আহার করিতেন এবং ক্রিসেন্ট অ্যাথলেটিক ক্লাবে যাইয়া জলখাবার খাইতেন। যথা-সময়ে ব্রুকলিন সহরে একটি বেদান্ত-সমিতি স্থাপিত হয়। স্বামী নির্মলানন্দ উহার কার্যভার প্রাপ্ত হন। উহার যোগ ক্লাশ পরিচালনার্থ স্থানীয় ঐতিহাসিক সমিতির এক কক্ষ ভাড়া করা হয়। ব্রুকলিন সমিতির কার্য অচিরে তাঁহার অধ্যক্ষতায় প্রসার লাভ করিল। সমিতির সভ্যগণ ও বন্ধুবৃন্দ ও সর্বশ্রেণীর সত্যান্বেষীসমূহকে সকল প্রকার সাহায্য ও পরামর্শ দানে তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার পূত স্পর্শে আসিতেন তাঁহারা ধর্মজীবনে অতিশয় উপকৃত হইতেন। যোগ ক্লাশ পরিচালন, বক্তৃতা প্রদান এবং সংস্কৃত শিক্ষাদান ব্যতীত তিনি উৎসাহী সভ্য-সভ্যাগণকে উপনিষৎ পড়াইতেন। বেলুড়মঠে অবস্থান কালেও তিনি সাধু-ব্রহ্মচারীগণকে লইয়া উপনিষদাদি বেদান্ত গ্রন্থের অধ্যাপনা করিতেন। নিউইয়র্ক-বেদান্ত-সমিতির সভ্যগণকে ধর্মশিক্ষা দান প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব সাধনাবলী এবং তৎশিষ্যগণের তপস্যা এবং সাধারণভাবে ভারত-সংস্কৃতির কথা বলিতেন। তাঁহারা স্বামী নির্মলানন্দের কথাপ্রসঙ্গ মনোযোগসহকারে শুনিতেন। জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "স্বামী নির্মলানন্দ এত পরিষ্কারভাবে এবং এত আগ্রহের সহিত এই সকল বিষয় ব্যক্ত করিতেন যে, আমরা ইহা শুনিয়া মনে মনে ভারতে উপস্থিত হইতাম।" শ্রোতৃবৃন্দ, ছাত্রবর্গ ও বন্ধুগণের মনে তিনি যে রেখাপাত করিতেন তাহা দীর্ঘকালেও মুছিয়া যাইত না। সুদীর্ঘ সময় নীরব থাকিবার পর তাঁহার ভূতপূর্ব মার্কিন ছাত্র মিষ্টার চার্লস এস. গ্রে., এ. আই. ই. ই., ধর্মপথে উপদেশ চাহিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। যেমন

স্বামী নির্ম্মলানন্দ — জেনেভায়

স্বামী নির্মলানন্দ শিক্ষাদানে প্রস্তুত ছিলেন তেমনি তিনি শিক্ষালাভেও উৎসুক ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, সখি, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। এই বাক্য ঠাকুরের শিষ্যগণের জীবনেও গভীরভাবে রূপায়িত হইয়াছিল। একদা যখন জনৈকা পরিচারিকা স্বামী নির্মলানন্দের জন্য পথ্য আনিয়াছিল, তখন তিনি বলিলেন যে, তিনি উক্ত পথ্য পছন্দ করেন না। উক্ত পরিচারিকা তাঁহার কথার অর্থ বুঝিয়া বলিল, "স্বামীজি, আপনি কি বলিতে চান যে, আপনি উহার প্রয়োজন স্বীকার করেন না?" অবিলম্বে স্বামী নির্মলানন্দ উভয় উক্তির সামান্য পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া পরিচারিকাকে সংশোধনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

যখন স্বামী নির্মলানন্দ উত্তর ভারতে তীর্থভ্রমণ ও তপশ্চর্যা করিতেন তখন হিমালয়ে চম্বারাজ্যে কয়েক বৎসর ছিলেন। চম্বার তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীকরম সিংহ ও রাজন্যবৃন্দ তৎপ্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। নিউইয়র্ক হইতে তিনি শ্রীকরম সিংহকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে চারখানি স্বামী ত্রিপুরানন্দ কর্তৃক চম্বা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই চারখানি পত্রের মধ্যে তিনখানি ইংরাজিতে এবং একখানি হিন্দিতে লিখিত। বাংলায় অনূদিত হইয়া ইংরাজি পত্রত্রয় নিম্নে উধৃত হইল। প্রথম পত্র ১৯০৪ খ্রীঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক হইতে এই ভাবে লিখিত:—"প্রিয় করমসিং, ২২শে জুলাই তারিখে লেখা তোমার প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি যথাসময়ে পাইলাম এবং উহা পড়িয়া সুখী হইলাম। তুমি ও তোমার বন্ধুগণ ওখানে বেশ ভাল আছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আশা করি, নূতন রাজা ভূরি সিংহের রাজত্বকালে চম্বারাজ্যে সর্ববিষয়ে উন্নতি সাধিত হইবে এবং প্রজাবৃন্দ পূর্বাপেক্ষা সুখী ও শ্রীসম্পন্ন হইবে। তুমি তোমার নবজাত শিশুপুত্রকে হারাইয়াছ জানিয়া দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বর তোমাকে আর এক পুত্র দান করুন, যে দীর্ঘজীবী হইবে এবং তোমাকে শান্তি দিবে। তোমার পিতা কাপ্তেন শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি সকলকে আমার শুভাশীষ দিও। এখানে রোজই শীত বাড়িতেছে এবং এই বৎসর এখানে খুব শীত পড়িবে, মনে হইতেছে। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি তোমাদের—স্বামী নির্মলানন্দ।"

স্বামী নির্মলানন্দ ১৯০৫ খ্রীঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্ক হইতে শ্রীকরম সিংহকে যে পত্র দেন উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—"প্রিয় করমসিং, তোমার পত্র পাইয়া এবং তোমরা সকলে পূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেছ জানিয়া খুবই প্রীত

হইলাম। তুমি যে ধূপকাঠি ও চম্বা সহরের ফটো প্রভৃতি পাঠাইয়াছিলে তাহা গতকাল নির্বিঘ্নে আমার হস্তগত হইয়াছে। এইগুলি পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি, এবং এই সকল প্রেরণের জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। মার্কিন যুক্তরাজ্যে সম্প্রতি বেলুড়মঠের চারজন সন্ন্যাসী আছেন। এই বৎসর এখানে খুব শীত পড়িয়াছে এবং নগরের রাস্তাগুলিতে ৫।৬ ফুট গভীর বরফ জমিয়াছে। আমি জানি না, আমাকে এই দেশে আর কতকাল থাকিতে হইবে। হয়ত আরও ৫।৬ বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া আমি ভারতে ফিরিব। চম্বা সহরের চৌত্রা মহল্লাস্থ আমার বন্ধুগণ ভাল আছেন জানিয়া সুখী হইলাম। তাহাদের প্রত্যেককে আমার ভালবাসা দিও এবং তুমিও আমার ভালবাসা জানিও। আমি এখানে ভালই আছি। এই পত্র যখন পাইবে তখন ভাল থাকিবে, আশা করি। ইতি—তোমাদের স্বামী নির্মলানন্দ।"

১৯০৫ খ্রীঃ ২০শে অক্টোবর। নিউইয়র্ক হইতে স্বামী নির্মলানন্দ শ্রীকরমসিংহকে যে পত্র ইংরাজিতে লিখেন তাহার বঙ্গানুবাদ এখানে দেওয়া হইল:—"প্রিয় করমসিং, গত ৯ই সেপ্টেম্বর আমাকে যে পত্র দিয়াছিলে তাহা পাইয়া সুখী হইলাম। দুঃখের বিষয়, ১০ই জুলাই তুমি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলে তাহা আমি পাই নাই। তুমি আমাকে যে সব পত্র দিবে তাহার খামের উপর আমার নাম ও ঠিকানা সযত্নে স্পষ্ট করিয়া লিখিবে। যদি পত্রের ঠিকানায় রাস্তার বা গৃহের সংখ্যাগুলিতে একটিও ভুল থাকে তাহা হইলে পত্র আমার হস্তগত হইবে না। তুমি ও তোমার বন্ধুবর্গ ভাল আছ এবং নূতন রাজা ভূরি সিংহের শাসনে চম্বারাজ্য অপেক্ষাকৃত সমুন্নত হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। এই যুগে আমেরিকা সর্ব প্রকারে সমৃদ্ধ দেশ। এমন সুসভ্য জাতির বিশেষত্ব বর্ণনা করা এই ক্ষুদ্র চিঠিতে সম্ভব নহে। যদি নিরাপদে ভারতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি, হয়ত কোন দিন তোমাকে সব বলিব, এই দেশ সম্বন্ধে আমি যাহা জানি। চৌত্রাদল ও তোমার বন্ধুগণকে আমার ভালবাসা জানাইবে এবং তুমিও জানিবে। ইতি—তোমাদের শুভাকাংক্ষী—স্বামী নির্মলানন্দ।"

বেদান্তের শিক্ষক:কোন অদ্ভুত পোষাক পরিধান করেন না, যোগীগুরু কোন রহস্যজনক মুখভঙ্গী করেন না। সরল প্রফুল্ল শিশুতুল্য স্বাধীন ও সানন্দ ছাত্রবৎ স্বামী নির্মলানন্দ যেখানে যাইতেন সেখানে প্রশান্ত আলোকসম্পাত

করিতেন। তাঁহার অনাড়ম্বর বাহ্য ভাবের আড়ালে কঠোর তপস্বী ও তেজস্বী সন্ন্যাসী ছদ্মবেশে থাকিতেন। তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি খুব মোটা মুখোসকেও ভেদ করিত এবং অত্যন্ত চালাক ধূর্তও ধরা পড়িত। নিউইয়র্ক সহরে একটি সাইকিক গবেষণা সমিতি ছিল। উহাতে ভূতপ্রেতগণ সমাহূত ও প্রদর্শিত হইত। কতিপয় বন্ধুর সহিত স্বামী নির্মলানন্দ তথায় একবার গমন করেন। উহার স্বত্বাধিকারিণী ছিলেন কুমারী মিলার নাম্নী এক মহিলা। মিলারের মুখমণ্ডল ভূতের মত বীভৎস ছিল। স্বামী নির্মলানন্দ ও তৎসঙ্গীগণ উক্ত সমিতিতে উপস্থিত হইলে মিস মিলার তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোন্ প্রেতাত্মা দেখিতে চান?" স্বামী নির্মলানন্দ বলিলেন যে, "তিনি কোন রেড্ইণ্ডিয়ানের প্রেতাত্মা দেখিতে ইচ্ছা করেন।" মিলার তাঁহাকে এক কক্ষে লইয়া যান, তথায় একটি মলিন নীলাভ আলোক জ্বলিতেছিল। অবিলম্বে একটি প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইল। দুঃসাহসী নির্মলানন্দ হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া ঐ ভূতকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং আন্তরিক-ভাবে উহার করমর্দন করিলেন। স্বামীজি নিজেকে দুঃসাহসী দৈত্যবীর বলিয়া বর্ণনা করিতেন। এখানেও তাঁহার অসাধারণ দুঃসাহসের পরিচয় পাইয়া সঙ্গীগণ চমৎকৃত হইলেন। স্বামী নির্মলানন্দ দেখিলেন করধৃত প্রেতাত্মার শরীর বায়বীয় ও অননুভবনীয় নহে; বরং উহা লৌহবৎ সুকঠিন ও স্পর্শযোগ্য ছিল। স্বামীজি উক্ত ভূতকে তিনবার উহার হাত ধরিয়া উক্ত কক্ষমধ্যে ঘুরাইলেন। স্বেচ্ছায় নড়িবার সামর্থ্য উক্ত ভূতের ছিল না। এইরূপে মিলারের ধূর্ততা বহু-জনের সমক্ষে প্রকটিত হইল। যে বৈজ্ঞানিক বন্ধু স্বামী নির্মলানন্দের সহিত তথায় গিয়াছিলেন তিনি একটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের প্রেতাত্মা দেখিতে চাহিলেন। মিলারের নির্দেশে আর এক ভূত যথাসময়ে উপস্থিত হইল। যখন তাহাকে এক সুবিদিত বৈজ্ঞানিক ফরমুলার কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, সে বলিতে পারিল না। সুতরাং সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যে, উল্লিখিত প্রেতগণ সত্য সত্যই প্রেত নহে। এইরূপে অনেক চিত্তাকর্ষক অভিজ্ঞতা স্বামী নির্মলানন্দ আমেরিকায় লাভ করেন। তিনি আমেরিকায় প্রায় তিন বৎসর অবস্থানপূর্বক আন্তরিকভাবে এত কঠোর পরিশ্রম করেন যে, তাঁহার বন্ধুবৃন্দ ও ছাত্রগণ তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন নাই। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তিনি ভারত যাত্রা করেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কথায়

বলিতে হয়, স্বদেশের জরুরী আহ্বান পাইয়া তিনি মাতৃভূমির জাগরণার্থে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। পূর্বাপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিয়া তিনি ভারতে পৌঁছিলেন। নূতন জগতের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে তাঁহার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয় এবং তিনি গুরুবাণীর গভীরার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের যুগবাণী বর্তমান ভারত ও আধুনিক জগতের জটিল সমস্যা সমাধানে বিশেষ কার্যকরী হইবে।

আমেরিকা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া স্বামী নির্মলানন্দ উপযুক্ত সংবর্ধনা পাইলেন। শালকিয়া অনাথবন্ধু সমিতি এক ধর্মসভায় তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক বলিলেন, "আমি আমেরিকায় বিশেষ কিছু করি নাই, যাহার জন্য আপনাদের নিকট এইরূপ সম্মান পাইতে পারি। আমি শুধু আমার গুরুতুল্য অগ্রদূত স্বামী বিবেকানন্দের পদাংক অনুসরণ করিয়াছি। বেদান্তপ্রতিপাদ্য বিশ্বধর্ম প্রচারার্থ আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। এই বেদান্ত ভারতের মেরুদণ্ড ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরবিরোধী নহে; পরন্তু একে অন্যের পরিপূরক। এই তমোগুণের যুগে রজোগুন বর্ধনার্থ তীব্র কর্ম প্রয়োজন। মানুষের সেবা করিলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়; কারণ সর্বভূতে তিনিই বিরাজমান।" পশ্চিম হইতে ফিরিয়া তিনি স্বদেশে যে প্রথম বক্তৃতা দিলেন তন্মধ্যে তাঁহার ভবিষ্যত কর্মসূচীর প্রধান সংকেত বিদ্যমান। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে বেদান্ত-বাণী প্রচার এবং জীবরূপী শিবের সেবাধর্মের জন্য তাঁহার জীবন উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বিশ্বস্ত ও অক্লান্তভাবে এই দিব্যকর্মের জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি কখনও ক্লান্ত হইতেন না বা বিশ্রাম লইতেন না। অদম্য উৎসাহে অম্লানবদনে তিনি কাজ করিতেন, তাঁহার কর্ম উপাসনায় পর্যবসিত হইয়াছিল। কর্ম উপাসনায় পরিণত হইলে যে আনন্দ লাভ হয় তাহার জন্য তখন কর্মে ক্লান্তি আসে না।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অন্যান্য গুরুভাইদের মত তুলসীও স্বামী বিবেকানন্দকে গুরুরূপে গণ্য করিতেন। মহীশূর রাজ্যের ভূতপূর্ব মহারাজার সহিত সাক্ষাৎকালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে মাননীয় মহারাজা বলিয়াছিলেন, "আমি আজ স্বামী বিবেকানন্দের এক শিষ্যকে সংবর্ধনার দুর্লভ সুযোগ পাইলাম।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইহাতে কোন প্রতিবাদ না করিয়া মৌন সম্মতি জানাইলেন এবং পরবর্তীকালে কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন যে, এক অর্থে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যই। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে মহীশূরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের যে বিস্তৃত ইতিহাস পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় তাহাতে ডাঃ পি. ভেঙ্কটরঙ্গম্ এই ঘটনা উল্লেখ করেন। গুরুভাইগণ তাঁহাদের দলপতি নরেন্দ্রনাথকে কেন গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিতেন তাহার কারণ, শ্রীগুরু স্বয়ং ইহা করিতে শিক্ষা দেন এবং নরেন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্বও অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য ও চিন্তাকে প্রভাবিত করিত। কোন কোন সন্ন্যাসী স্বামীজিকে ঠাকুরের মুখপাত্ররূপে শ্রদ্ধা করিতেন। কেহ কেহ ভাবিতেন, স্বামীজির আদেশ পালন করিলে ঠাকুর সন্তুষ্ট হইবেন। আবার অন্য কেহ কেহ ঠাকুরের প্রতি যেমন অনুরক্ত ছিলেন তেমনি স্বামীজির প্রতিও ছিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই গুরুভাইগণ স্বামীজিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক বুঝিতে পারিলেন এবং তন্মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাশক্তি প্রকটিত দেখিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণাতেই গুরুভাইগণ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক সংঘবদ্ধ হইলেন এবং ঠাকুরের ভাব প্রচারে আত্মোৎসর্গ করিলেন। বিশেষতঃ স্বামী নির্মলানন্দের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় বিবেকানন্দরূপে অবতীর্ণ। স্বামী নির্মলানন্দ বলিতেন, "স্বামীজি ঈশ্বরকোটি নহেন, কিন্তু অবতার; আর শ্রীগুরু মহারাজ অবতার নহেন, স্বয়ং জগন্মাতা।" ঠাকুরের চারি ঈশ্বরকোটি শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, যোগানন্দ এবং নিরঞ্জনানন্দের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থ তুলসী মহারাজ কর্তৃক দক্ষিণ ভারতে চারিটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বেলুড়মঠে কিছুকাল থাকিবার পর স্বামী নির্মলানন্দ গুরুভাই প্রেমানন্দজীর সহিত পূর্ববঙ্গ ও আসামে ধর্মপ্রচারে গমন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া তিনি হিমালয়ের অব্যক্ত আহ্বান অন্তরে শুনিলেন এবং নির্জনে তপস্যার্থ প্রস্থান করিলেন। বিলাসভূমি আমেরিকায় তিন বৎসর অবস্থানের পরেও তাঁহার কঠোর তপস্যার ভাব কমে নাই। তিনি তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্য ও পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ-তপস্যার মন্দাকিনী তাঁহার অন্তরে প্রবহমান ছিল। তিনি কাশ্মীর ভ্রমণান্তে পূর্বপাঞ্জাবস্থ চম্বারাজ্যে উপনীত হন।

নয়

চম্বারাজ্যে

আমেরিকা যাত্রার পূর্বে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নির্মলানন্দ কাশ্মীর হইতে ৺মনমহেশজী দর্শনার্থ পূর্ব-পাঞ্জাবে চম্বারাজ্যে গমন করেন। পাঠানকোট রেল স্টেশন হইতে ডালহাউসি বাহান্ন মাইল পথ এবং ডালহাউসি হইতে চম্বা একুশ মাইল দূরে। এখন ডালহাউসি পর্যন্ত মোটর হইয়াছে, কিন্তু তখন মোটর রোড্ ছিল না। অদ্যাপি ডালহাউসি হইতে চম্বায় পদব্রজে বা অশ্ব-পৃষ্ঠে যাইতে হয়। স্বামী নির্মলানন্দ পাঠানকোট হইতে পদব্রজে তিয়াত্তর মাইল পথ অতিক্রম করিয়া চম্বায় উপস্থিত হন। চম্বা সাড়ে তিন সহস্রাধিক ফুট উচ্চ পর্বতোপরি ছোট জেলা-সহর। তখন চম্বা যাইবার রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম ছিল। স্বামী নির্মলানন্দ আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতেন এবং বিশেষ বস্ত্রাদি সঙ্গে রাখিতেন না। তিনি চম্বায় উপনীত হইয়া সহরের উত্তর প্রান্তে কোন মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। চম্বার উজির (ম্যাজিষ্ট্রেট) শ্রীকরম সিংহ, বৈদ হরিবল্লভ প্রভৃতি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিলেন। সেই সময় শ্রীশ্যাম সিংহ মহোদয় চম্বার রাজা ছিলেন। তিনি গভীর রাত্রে সাথে মাত্র দুই একজন ভৃত্য লইয়া সহর পরিদর্শন করিতেন। তখন প্রচণ্ড শীতকাল। স্বামী নির্মলানন্দ মন্দিরে শুইয়া শীতে কাঁপিতে-ছিলেন। রাজা শ্যাম সিংহ অতিশয় সাধুভক্ত ছিলেন। তিনি তেজস্বী বিরক্ত সন্ন্যাসী নির্মলানন্দজীকে তদবস্থায় দেখিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন এবং পর দিন প্রাতে তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে ডাকাইয়া ও তাঁহার সাথে আলাপ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করেন। অনন্তর রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং সেই দিন হইতে তাঁহার সেবার ভার লইলেন। রাজা শ্রীশ্যাম সিংহের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীভূরি সিংহ চম্বার রাজা হন। তিনি স্বামী নির্মলানন্দের একনিষ্ঠ মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। শ্রীশ্যাম সিংহ এত দানশীল ছিলেন যে, তিনি যখন সিংহাসন ত্যাগ করেন তখন কোষাগারে ধনদৌলত কিছুই ছিল না। মিতব্যয়ী শ্রীভূরি সিংহের প্রাণপাত পরিশ্রমে চম্বারাজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত ও প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল।

চম্বা সহর হইতে ভ্রমাউর আটত্রিশ মাইল দূরবর্তী, ভ্রমাউর হইতে ৺মনমহেশজী আরও বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত। ভ্রমাউর হইতে সতের মাইল রাস্তা ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া যায়, বাকী পাঁচ মাইল খাড়া চড়াই ও দুর্গম পথ। ৺মনমহেশ পর্বত আঠার হাজার ফুট উচ্চ। প্রথম তের হাজার ফুট উচ্চ পর্বত অবধি যাত্রীরা চড়াই করিয়া দেখে তথায় একটি ছোট হ্রদ। তের হাজার ফুট উচ্চ পর্বতে উক্ত হ্রদ অবস্থিত বলিয়া বার মাসই উহা বরফে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্মকালে উহার কিয়দংশ গলিয়া যায়। যাত্রীগণ সেই বরফগলা জলে স্নান করে। উক্ত হ্রদের পূর্ব ভাগে যে পাহাড় আছে তাহা দেখিতে সুবিশাল সুমনোহর মন্দিরতুল্য। উহার শিখরে অতি বৃহৎ গ্লেসিয়ার (তুষার স্তূপ) সর্বদা বিদ্যমান। উহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, যেন শিবজী একটি স্ফটিক মুকুট মাথায় পরিয়া আছেন। তীর্থযাত্রীরা সমস্ত পাহাড়টিকে শিবমূর্তি রূপে পূজা করিয়া থাকে। কোন কোন সাধু বা ভক্ত এই পাহাড়কে পরিক্রমা করেন। হিমালয়ের কৈলাস প্রভৃতি কোন কোন পর্বত বিরাট শিবরূপে পূজিত হন। কৈলাসের ন্যায় ৺মনমহেশেও শত শত যাত্রী ভারতের নানা স্থান হইতে শিবদর্শন করিতে ভাদ্রমাসে গিয়া থাকেন।

স্বামী নির্মলানন্দ ৺মনমহেশ দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং তথা হইতে চম্বায় ফিরিয়া কিছুকাল অবস্থানান্তে কলিকাতায় আসিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে ফিরিবার কিছুদিন পরে চম্বারাজ শ্রীভূরি সিংহের আহ্বানে তিনি পুনরায় তথায় যান এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোর যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত দুই তিন বৎসর তথায় থাকেন। চম্বারাজ শ্রীভূরি সিংহ, উজির শ্রীকরম সিংহ ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি স্বামী নির্মলানন্দের নিকট নিয়মিতভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিতেন। কোন কোন স্কুলের ছাত্রও তাঁহার নিকট সংস্কৃত পড়িত। হিমালয় প্রদেশের রাজ্যসভার বর্তমান স্পীকার পণ্ডিত জয়ন্তরাম স্বামী নির্মলানন্দের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। চম্বারাজ্যে অবস্থান কালে স্বামী নির্মলানন্দ তথাকার সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করেন এবং সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চ সাচ পাশ অতিক্রম করিয়া পাঙ্গী লাউলস্থ ৺ত্রিলোকনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনান্তে সাড়ে ষোলহাজার ফুট উচ্চ কুক্তী পাশ পার হইয়া ভ্রমাউর দিয়া চম্বায় ফিরিয়া আসেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামঠের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী ত্রিপুরানন্দজী চম্বায় গমনপূর্বক এই সব তথ্য সংগ্রহ

করেন। তিনি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে পুনরায় চম্বায় যাইয়া পাঙ্গীতে প্রায় নয় বৎসর অতিবাহিত করেন। পাঙ্গী সাড়ে আট হাজার ফুট উচ্চ পর্বত। তথায় সাচ পাশ (Sach Pass) পার হইয়া যাইতে হয়। তিনি বলেন, চম্বায় প্রাচীন লোকেরা এখনও স্বামী নির্মলানন্দের পুণ্যস্মৃতি শ্রদ্ধাসহকারে বহন করেন। স্বামী নির্মলানন্দ যখন চম্বা হইতে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের ভার লইয়া যান তখন রাজা শ্রীভূরি সিংহ তাঁহার রান্না ও সেবাদির জন্য সুদক্ষ পাচক পণ্ডিত মনসারামকে তৎসঙ্গে পাঠাইয়া দেন। পণ্ডিত মনসারাম চম্বার ফরেষ্ট বিভাগের প্রাচীন ফরেষ্টার ছিলেন। তিনি সুপাচক এবং নির্মলানন্দজীর অনুরাগী ভক্ত ছিলেন বলিয়া রাজা শ্রীভুরি সিংহ তাঁহাকেই রাজগুরুর সেবক নিযুক্ত করেন। চম্বার সমীপে রাজার যে সকল ফলফুলাদির বাগান ছিল তাহার উন্নতির জন্য স্বামী নির্মলানন্দ সাধ্যমত পরিশ্রম করিতেন এবং রাজা শ্রীভূরি সিংহ সব বিষয়ে তাঁহার সুপরামর্শ লইতেন।

দশ

ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের প্রচেষ্টায় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোরে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী উক্ত আশ্রমের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন বেলুড়মঠের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ। পর পর কয়েকজন সন্ন্যাসী কার্যভার লইয়া উহা চালাইতে না পারিয়া সরিয়া পড়িলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বুঝিলেন, কোন যোগ্য সাধুর হস্তে ইহার পরিচালন ভার অর্পিত না হইলে ইহার উন্নতির সম্ভাবনা নাই। ব্যাঙ্গালোর হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মাদ্রাজমঠে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সহিত পরামর্শান্তে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী নির্মলানন্দকে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমেয় কার্যভার দিবার সংকল্প করিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের চিঠি চম্বারাজ্যে নির্মলানন্দজীর নিকট উপস্থিত হইল। তৎপূর্বে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল—চম্বার এক গণক ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, অচিরে নির্মলানন্দজী চম্বা ছাড়িয়া দক্ষিণ ভারতে যাইবেন। যদিও উক্ত গণক দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে

একেবারে অজ্ঞ ছিলেন তথাপি নির্মলানন্দজীর গন্তব্যস্থানের হুবহু বর্ণনা তিনি দিলেন। তাহার বর্ণনা নির্ভুল দেখিয়া নির্মলানন্দজী বিস্মিত হইলেন এবং ব্রহ্মানন্দজীর পত্র প্রাপ্তির পর গণকের ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তিনি মঠাধ্যক্ষের পত্র পাইয়া বেলুড়ে আসিলেন এবং সংঘজননী সারদাদেবীর পাদবন্দনা করিয়া এবং স্নেহাশীষ শিরে ধরিয়া মাদ্রাজ চলিলেন। মাদ্রাজে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত তিনি ব্যাঙ্গালোরে গমন করেন এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ব্রহ্মচারী নারায়ণ-রাওজীর নিকট হইতে আশ্রমের কার্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ব্যাঙ্গালোর যাইয়া নবোদ্যমে কার্য করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহার প্রথম বক্তৃতা হইল হিন্দীতে এবং ইহা শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক প্রশংসিত হয়।

অনন্তর স্বামী নির্মলানন্দ আশ্রমে, ক্যান্টনমেন্টে, সিঃ ভিঃ এসঃ স্কুলে, উলসুর বিবেকানন্দ-আশ্রমে এবং ব্যাঙ্গালোর সহরের অন্যান্য স্থানে নিয়মিত ধর্মচর্চার কেন্দ্র খুলিলেন। প্রতি রবিবার আশ্রমে তিনি রাজযোগ ব্যাখ্যা করিতেন। ইহা ছাড়া তাঁহাকে রান্নাদি কাজও করিতে হইত। ভাষাগত অসুবিধা, আর্থিক অভাব এবং অন্যান্য বিঘ্ন তাঁহার কর্মপথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। আশ্রমে দীর্ঘকাল কোন পাচক বা সেবক রাখা সম্ভব হইল না। তিনি সর্বকর্ম স্বহস্তে করিতেন। কিছুকাল পরে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তাঁহার সহকর্মীরূপে বেলুড়মঠ হইতে আসিলেন। মহাপণ্ডিত ও মহান্ বাগ্মীরূপে তাঁহার সুখ্যাতি চারিদিকে রটিল। আশ্রমে একজন সহকর্মী পাইবার পর তিনি স্বচ্ছন্দে দূর দূর স্থান হইতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। মে মাসে কুরুক্ষুড়-রাইতে সাধুসঙ্ঘ মহাসভার ষষ্ঠবার্ষিক সম্মেলনে পৌরোহিত্য করিবার জন্য তিনি আহূত হইলেন। তিনি উক্ত আহ্বান গ্রহণপূর্বক তথায় যাইয়া ইংরাজীতে 'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি' সম্বন্ধে উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি সুবৃহৎ সম্মেলনে 'সাধু কে ?' শীর্ষক বক্তৃতা দেন। উক্ত বক্তৃতা অতিশয় শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। কারণ, তিনি ইহাতে খাঁটি সাধুর চারিত্রিক মহিমা নির্দেশপূর্বক ভণ্ড সাধুর সহিত তাঁহার পার্থক্য বর্ণনা করেন। সন্ধ্যায় তিনি উক্ত সভায় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে কর্ম ও উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরদিন তিনি বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত জাতীয় চিহ্নের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং তিরুনামমের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায়

তিনি মানবাত্মা সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন। সম্মেলনের চতুর্থ দিবসে ২রা জুন তিনি মাদ্রাজ যাত্রা করেন এবং যাত্রাকালে উক্ত স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সশ্রদ্ধ বিদায় দেন।

৬ই জুন হইতে ব্যাঙ্গালোরে তাঁহার কার্য তিনি পুনরারম্ভ করেন। এখানে তিনি সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসর ধর্মপ্রচার করিয়া স্থানীয় সহর ও সমাজের উপর গভীর ও স্থায়ী দাগ কাটিয়া যান। ব্যাঙ্গালোরকে কেন্দ্র করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যের চারিদিকে তাঁহার অদ্ভুত প্রজ্ঞার প্রভা বিকীর্ণ করেন। তাঁহার কাজের জন্য তিনি কোন প্রশংসা চাহিতেন না, কোন মৌলিকতা দাবী করিতেন না। শ্রীগুরুমহারাজ এবং স্বামী বিবেকানন্দের হস্তস্থিত যন্ত্ররূপে তিনি সর্বকার্য করিতেন। তিনি তাঁহাদের ভাবরাশি বিস্তার করিতেন, তাঁহাদের কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিতেন এবং তাঁহাদের বাণীর সত্যতা ও কার্যকারিতা স্বীয় জীবনে দেখাইতেন। সর্বপ্রকার কর্মক্ষেত্রে তিনি অসামান্য পারদর্শী ছিলেন। ধর্মীয় ও ঐহিক ব্যাপারে তিনি আজন্ম শিক্ষদাতা ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সহকর্মী হইয়াছিলেন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, তিনি অতুলনীয় কর্মযোগী ছিলেন। তীব্র কর্মের মধ্যেও তাঁহার জীবনে সাধন-ভজনের ফল্গুধারা লোক-চক্ষুর অন্তরালে প্রবাহিত হইত। কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামঠের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী ত্রিপুরানন্দ বহু বর্ষ স্বামী নির্মলানন্দের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং তৎসঙ্গে ভারতের নানা স্থানে ও ব্রহ্মদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "স্বামী নির্মলানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাকে অভিন্নভাবে দেখিতেন ও শক্তি উপাসক ছিলেন। তিনি গভীর রাত্রিতে প্রত্যহ উঠিয়া শেষ বয়স পর্যন্ত নিয়মিত সাধন-ভজন করিতেন। নিত্য স্নানাদি সারিয়া তিনি ঠাকুরঘরে যাইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতেন। ইহা তাঁহার নিত্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গভীর রাত্রিতে দুই-তিনটার সময় জাগিয়া আমি দেখিয়াছি, স্বীয় শয্যায় বসিয়া তিনি ধ্যানস্থ আছেন। এমন কি, ট্রেনে ও জাহাজে ইহার ব্যতিক্রম দেখি নাই।"

স্বামী নির্মলানন্দ যে সকল ধর্মীয় আলোচনা-সভা ব্যাঙ্গালোরে আরম্ভ করেন সেইগুলি অতিশয় আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের খোরাক ছাত্র-গণ যতটুকু হজম করিতে পারিত তিনি ততটুকুই তাহাদিগকে সরবরাহ করিতেন। ব্যাঙ্গালোরের প্রায় সকল উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁহার আলোচনা-সভায় যোগ দিতেন। ডেপুটি কমিশনার শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার, মেটিয়োরোলজিক্যাল বিভাগের

প্রধান অফিসার শ্রীভেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার, মহীশূর কাউন্সিলের সদস্য শ্রীবাল-সুন্দরম্ আয়ার, জেলা জজ রাওসাহেব শ্রীচেন্নাইয়া, কো-অপারেটিভ সোসাইটি সমূহের রেজিস্ট্রার শ্রীরামাইয়া, সরকারী প্রেসের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট শ্রীপুট্টাইয়া, প্রধান সহকারী ইলেকটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীকৌশিক, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শ্রীগোপাল স্বামী আয়েঙ্গার, সার্ভে বিভাগের কর্মচারী শ্রীরাজাগোপাল নাইডু, কণ্ট্রোলার অফিসের অধ্যক্ষ শ্রীনারায়ণ স্বামী আয়েঙ্গার, মহীশূর মহারাজা মিলসমূহের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীদেবরাও শিবরাম, উদ্যান-রোপণ বিদ্যার ডিরেক্টার রাওবাহাদুর শ্রীজাভারিয়া, শিল্পাধ্যক্ষ আপ্পাদূরে মুদালিয়ার, হাইকোর্টের জজ শ্রীশঙ্কর নারায়ণ রাও, এ্যাড্‌ভোকেট শ্রীভেঙ্কটপাতি, মিলের মালিক ও ব্যবসায়ী শ্রীরামচন্দ্র রাও সিন্ধিয়া, ব্যবসায়ী শ্রীনরসি হাইয়া, সার্ভে বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীআপ্পান্নার আয়েঙ্গার, সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীগোবিন্দ পিলে এবং শ্রীমুরগেশ পিলে প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বামী নির্মলানন্দের শাস্ত্রালোচনার নিত্য শ্রোতা ছিলেন। যাঁহারা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার আলোচনা শুনিতে আসিতেন তাঁহারাও অনুরাগী ছাত্র ও শ্রোতা হইয়া থাকিতেন এবং তাঁহার একনিষ্ঠ বন্ধু হইতেন। তাঁহাদের গৃহের পরিজন-বর্গও স্বামী নির্মলানন্দের ভক্ত হইয়া পড়িতেন। তিনি তাঁহাদের পরিবারবর্গের পরামর্শদাতা ও ধর্মশিক্ষকরূপে বিবেচিত হইতেন। তাঁহাদের পারিবারিক ধর্মানুষ্ঠানগুলিও আশ্রমেই অনুষ্ঠিত হইত। শিশুকন্যার জন্মতিথি, অন্নপ্রাশনাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানও আশ্রমে সম্পন্ন হইত। প্রত্যেক ভক্ত ভাবিতেন, তৎ-প্রতি স্বামীজির স্নেহ অতুলিত, অথবা অনতিক্রান্ত। ভক্তবৃন্দ পারিবারিক ব্যাপারেও তাঁহার পরামর্শ ও উপদেশ চাহিতেন, এবং উন্মুক্ত অন্তরে তাঁহাদের বিপদ-আপদের কথাও তাঁহাকে বলিতেন। তাঁহাদের নিকট তিনি উৎকৃষ্ট, সুমহৎ, শুভাকাঙ্ক্ষী—যিনি কণামাত্র স্বার্থলেশ ব্যতীত তাঁহাদিগকে ভাল-বাসিতেন। শুধু ইহাদের উপর নহে, পরন্তু সর্বশ্রেণীর ভক্তদের উপর তাঁহার স্নেহ-শিশির ঝরিয়া পড়িত। যেখানে তিনি যাইতেন সেখানে এক চুম্বকতুল্য প্রভাব বিস্তার করিতেন এবং তথায় স্বতঃই এক ভক্তগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিত। সর্বজাতির বিভিন্নভাবের উচ্চ-নীচ, পুরুষ-মহিলা এবং শিশুগণও তাঁহার প্রতি সমান আকর্ষণ অনুভব করিত। স্বামীজির জীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহার্থ যাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইয়াছেন তাঁহারা অনেকেই বলেন, "হায়,

তাঁহার সম্বন্ধে আমি কি জানি। তিনি আমাকে অসীম স্নেহ করিতেন, এবং কোন প্রতিদানের আশা না করিয়া সব কিছু দিয়াছেন।” অন্য কেহ কেহ বলেন, “তিনি শুধু নিঃস্বার্থ প্রীতির দ্বারা আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। এবং আমরা তাঁহার সন্তান হইয়া গিয়াছি।” দক্ষিণ ভারতে বা উত্তর ভারতে এই প্রেমিক সন্ন্যাসী সম্বন্ধে ভক্তসমাজে এই ব্যাপক ধারণা বিদ্যমান।

ব্যাঙ্গালোরে কতিপয় ভক্তের মধ্যে শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার প্রথম হইতেই সর্বাপেক্ষা অনুরক্ত ছিলেন। আশ্রমের সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধানে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। ডেপুটী কমিশনার পদে উন্নীত হইবার পরে সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণপূর্বক বেলুড়মঠের সন্ন্যাসী হইয়া স্বামী শ্রীবাসানন্দ নামে তিনি পরিচিত হন। শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার স্বামীজির ব্যক্তিগত সেক্রেটারী হইয়া শেষ পর্যন্ত কর্ম করেন। স্বামীজি যখন ব্যাঙ্গালোরে যান তখন শ্রীরাজাগোপাল নাইডু বালকমাত্র ছিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন এবং সেই বালক বড় হইয়া আশ্রমের একনিষ্ঠ সেবক হইলেন। শ্রীচেন্নাইয়াও তৎপতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার ভাব ভঙ্গ হয় নাই। উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ বা উচ্চতর মধ্যবিত্ত ভক্তগণ অনেকেই স্বামীজির প্রভাবে পড়িয়াছিলেন। নিম্নতর মধ্যশ্রেণীর লোকেরাও তাঁহার প্রভাবাধীন হইয়াছিল। স্বামীজির সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধও প্রীতিপূর্ণ ছিল। উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকদের মত তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও তাঁহারা আশ্রমের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেন। তাঁহারা স্ব স্ব সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আশ্রমের জন্য অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিতেন। জন্মোৎসব এবং অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি লইয়া যাইবার জন্য শ্রীভেঙ্কট রামানাপ্পা, শ্রীনাঞ্জাপ্পা, শ্রীপাপ্পন্না, শ্রীসিদ্ধাপ্পা প্রভৃতি মধ্যবিত্ত ভক্তগণ তিনশত টাকা ব্যয়ে এক রথ নির্মাণ করাইলেন।

স্বামীজির বিশেষ স্নেহপাত্র ছিল তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তবৃন্দ। পাঞ্চামা, কেরিয়া প্রভৃতি নিম্নতম শ্রেণীর নরনারীগণের কথাই আমরা বলিতেছি। সর্বপ্রকার উৎসব উপলক্ষে স্বামীজি স্বয়ং অপরিষ্কার অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে তাহাদের বাসস্থানে যাইয়া তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। যদি কেহ কোন কারণে আসিতে না পারিত তিনি তাহার জন্য প্রসাদ রাখিয়া দিতেন বা স্বয়ং তাহাকে দিয়া আসিতেন। তন্মধ্যে আদিমূলম্ নামক এক পাঞ্চামা স্বামীজির নাম উল্লেখ-

মাত্র অশ্রু বিসর্জন করিত। মধুরাম্ পিলে নামক আর একজন আশ্রমে থাকিত এবং নানা ভাবে স্বামীজির সেবা করিত। আরও অনেকে অনুরূপ ভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া উল্লিখিত হইল না। স্বামীজির করুণা কাহারও দোষত্রুটি দেখিত না, সকলের ভুল উপেক্ষা করিত এবং সকলের অপরাধ মার্জনা করিত। কিন্তু তিনি অসাধুতা ও ভণ্ডামির প্রশ্রয় দিতেন না। আশ্রমের ব্যাপারে এবং সাধুদের উপর গৃহস্থগণ কর্তৃত্ব করিতে চাহিলে তিনি খড়্গাহস্তে তাহা বাধা দিতেন। স্বীয় ক্ষেত্রে তাঁহার স্বাধীনতা তিনি সর্বপ্রকারে অব্যাহত রাখিতেন এবং সে ক্ষেত্রে কাহারও বাধা ও প্রভুত্ব, সে যতই উচ্চপদস্থ ও সেবাপরায়ণ হউক না কেন, তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। স্বামী নির্মলানন্দের জীবনে স্বাধীনতার আদর্শ এইরূপে মূর্ত হইয়াছিল। তাঁহার মর্মবাণী ছিল, "তুমি নিজে মুক্ত হও এবং অন্যকে মুক্তি দাও। প্রত্যেককে স্থান দাও এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেককে বসাও।" শুক্র-নীতিতে আছে—

অমন্ত্রম্ অক্ষরং নাস্তি নাস্তি মূলম্ অনৌষধং।
অযোগ্যঃ পুরুষো নাস্তি, যোজকস্তত্র দুর্লভঃ॥

অনুবাদঃ—এমন বর্ণ নাই, যাহা মন্ত্র হইতে পারে না। এমন শিকড় নাই, যাহার কোন ভেষজ গুণ নাই। জগতে কোন পুরুষই অযোগ্য নহে; কিন্তু যে যে কাজের যোগ্য তাহাকে সেই কাজে লাগাইবার লোক দুর্লভ।

ধর্মশিক্ষা ও ধর্মপ্রচারের শ্রেষ্ঠ উপায় যদি ধর্মজীবন যাপন হয় তবে স্বামী নির্মলানন্দ উত্তম ধর্মপ্রচারক ও ধর্মগুরু ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র কর্ম, তাঁহার প্রত্যেক আচরণ, তাঁহার সমগ্র সত্তা লোকশিক্ষা দিত; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সেই ভাব ও ভাষা বুঝিতে সমর্থ ছিলেন, তাঁহারাই সেই শিক্ষা লাভ করিতেন। অবশ্য এইরূপ বোদ্ধাদের সংখ্যা অধিক ছিল না। সাধারণ মানুষ চায় উচ্চারিত শব্দ, শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা, আলোচনা ও সূক্ষ্ম বিচার। এই সকলও প্রচুর পরিমাণে তিনি দান করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে নিয়মিত আলোচনা করিতেন। বাগ্মিতাপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাও তিনি অসংখ্য দিয়াছেন। তিনি প্রশ্নোত্তর সভার আয়োজন করিয়াছেন। বর্তমান লেখক বেলুড়মঠে তাঁহার প্রশ্নোত্তর সভায় যোগদানের সৌভাগ্য একাধিকবার লাভ করিয়াছেন। বেলুড়মঠের পুরাতন ভিজিটার্স

ক্রমে এক বৈকালে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া তিনি প্রশ্নোত্তর সভায় বসিয়াছিলেন। তখন বেলুড়মঠে ইলেকট্রিক পাখা বা আলো হয় নাই। দুইজন সেবক দুইটি বড় বড় তালপাতার হাত পাখা লইয়া তাঁহার দুই দিকে দাঁড়াইয়া ব্যজন করিতেছিলেন। কোন শ্রোতার মুখে একটি মাত্র প্রশ্ন শুনিয়াই তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া উত্তর দিলেন। তিনি যখন ভাবাবিষ্ট হইয়া এমনভাবে ধর্ম প্রসঙ্গ করিতেছিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর সিংহ গর্জন তুল্য গুরুগম্ভীর শোনা যাইতেছিল। উক্ত উত্তর শুনিয়া শুধু প্রষ্টার কেন, সমবেত সর্বশ্রোতার সন্দেহ নিরসন হইল। আমরা সকলে তাঁহার ধর্মালোচনা শুনিয়া অপূর্ব আলোক ও গভীর প্রেরণা পাইলাম।

ব্যাঙ্গালোরে স্বামী নির্মলানন্দ ইংরাজী রামকৃষ্ণ সাহিত্য স্থানীয় কথ্য ভাষা কানাড়ায় অনুবাদ করাইলেন। নিরক্ষর জনগণের জন্য তিনি নিয়মিত অর্চনা, ভজন ও শোভাযাত্রাদির আয়োজন করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। শহরের বিভিন্ন পল্লী হইতে কীর্তনদল আসিয়া এই সকল উৎসবে গান করিত এবং সহস্র সহস্র ভক্ত প্রসাদ পাইতেন। এক বা একাধিক কীর্তনদল প্রত্যেক সপ্তাহে আশ্রমে যাইয়া ভজন গাহিত। নবরাত্রি, শিবরাত্রি, বিভিন্ন জয়ন্তী প্রভৃতি প্রধান প্রধান হিন্দুপর্বগুলি যথাযথ ভাবে আশ্রমে অনুষ্ঠিত হইত। এই সকল উৎসব বৎসরের পর বৎসর বৃহত্তর আকার ধারন করিত এবং হাজার হাজার নরনারী এই সকল উৎসবে যোগদান করিয়া ধন্য হইত। ভাগবতে আছে, ভক্তগণ উৎসবাৎ উৎসবং যান্তি। ভক্তগণ যেখানে বাস করেন সেখানে উৎসবের পর উৎসব লাগিয়া থাকে। তাঁহারা এক উৎসব শেষ করিয়া অন্য উৎসবে যোগ দেন।

দক্ষিণ ভারত দীর্ঘকাল হইতে আগমিক ক্রিয়া কাণ্ডের কবলে পড়িয়াছিল এবং ভাব ভক্তি অপেক্ষা আচারানুষ্ঠানকে অযথা বেশী আদর দিয়াছিল। অস্পৃশ্যতাও তথায় কূর্মবৎ সুকঠিন আবরণ পরিয়াছিল। স্বামী নির্মলানন্দের মত অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ উহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারিতেন না। সমাজ হইতে অস্পৃশ্যতা অপসারণ দক্ষিণ ভারতে স্বামী নির্মলানন্দের এক অক্ষয় কীর্তি ও অদ্ভুত কৃতিত্ব। উল্লিখিত উৎসব সমূহে আশ্রমে যখন উচ্চতম ও নিম্নতম বর্ণের নরনারীগণ সাধারণের সমক্ষে একত্রে মিলন ও আহারাদি করিত তখন কি স্বর্গীয় দৃশ্য দেখা যাইত! উচ্চতম শ্রেণীর ধর্মাচার্য হইয়াও তিনি কত

বড় সমাজসংস্কারক ছিলেন তাহা এই সকল উৎসব দিবসে বোঝা যাইত। সাধারণতঃ যে ব্যাপারসমূহ ঐহিক বিবেচিত হইত সেগুলির প্রতিও স্বামী নির্মলানন্দ অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি প্রথমতঃ আশ্রমের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানে যত্নশীল হইলেন। ইহাকে স্বাবলম্বী, শক্তিশালী, সেবাশীল, সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য তিনি কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন। শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার এবং তৎপরে অন্যান্য ভক্ত আশ্রমের জন্য অকুণ্ঠভাবে মুক্ত হস্তে অর্থদান করিতেন; কিন্তু প্রয়োজনের পরিমাণে অর্থাগম হইত না। সেই জন্য কখন কখন স্বামীজি স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইতেন এবং থালা-বাসনাদি ধুইতেন। তিনি এই সকল কাজকে কখনও নিন্দনীয় ও তাঁহার মর্যাদানাশক মনে করিতেন না। এইজন্য তিনি তাঁহার মূল্যবান সময় ব্যয় করিতে বাধ্য হইতেন এবং অন্যান্য দরকারী কাজে হাত দিতে পারিতেন না। যাঁহাকে মহত্তর হিতকর কর্মে ব্যাপৃত ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে তাঁহার পক্ষে এই সকল ক্ষুদ্র কর্ম হইতে নিস্কৃতি লাভই বাঞ্ছনীয়। পাচকাদি রাখিতে হইলে নিয়মিত অর্থাগম প্রয়োজন। তিনি কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী কিন্তু ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া তিনি প্রায় ছয় সাত হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন। শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার প্রায় দশ হাজার টাকা দিলেন। শ্রীভেঙ্কট রামানিয়া তিন হাজার টাকা এবং পঁচিশ একর জমি দিলেন। সংগৃহীত অর্থ স্থায়ী তহবিলরূপে ব্যাঙ্কে জমা দিয়া মাসে মাসে কিছু কিছু সুদ পাওয়া যাইত। সেই সুদ এবং ভক্তদের নিকট হইতে এককালীন দান ও মাসিক চাঁদা দ্বারা অবশেষে আশ্রমের সাধারণ খরচ চলিয়া যাইত।

তখন ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের জমির পরিমাণ ছিল সাড়ে তিন একর বা প্রায় দশ বিঘা। স্বামী নির্মলানন্দ অর্থসংগ্রহ কার্যের সহিত আশ্রম ভূমির সংস্কার সাধনে মনোযোগ দিলেন। আশ্রম ভূমির অধিকাংশ কাঁটাগাছ ও অন্যান্য বন্যবৃক্ষে সমাকীর্ণ ছিল। স্বামীজি উহাকে পরিষ্কার ও সমতল করাইলেন এবং স্বীয় হস্তে বিভিন্ন ফল-ফুল গাছ রোপণ করিয়া একটি অতি সুন্দর বাগান তৈয়ার করিলেন। শহরতলী হইতে রোজ বহু লোক এই সুন্দর উদ্যান দেখিবার জন্য আশ্রমে আসিতেন। এইরূপ ফলফুলে সুশোভিত ও পুষ্পগন্ধে সুবাসিত ও চিত্রবৎ সুসজ্জিত বাগান খুব কমই দেখা যায়। বৃক্ষরোপণ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ রাওবাহাদুর জাভারিয়া ইহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং কতিপয় উপলক্ষে এই আশ্রম হইতে ফুলগাছ লইয়া লালবাগ পুষ্প প্রদর্শনীতে দিয়াছেন।

মহীশূর রাজ্যের সরকারী কাউন্সিলের সদস্য শ্রীঅনন্তরমণ এবং অন্যান্য অনেকে ঘন ঘন এই বাগান দেখিতে আসিতেন। ইউরোপীয় দর্শকবৃন্দও উক্ত উদ্যানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। স্বামীজি স্বভাবতঃই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও চারু শিল্প ভালবাসিতেন। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে ফুলের বাগান দেখিয়া তিনি উহার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই পুষ্পোদ্যানে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পুষ্প চয়ন করিতেন। তিনি বলিতেন, ফুল দেবভোগ্য পবিত্র বস্তু। সুগন্ধি ফুলের মালা ঠাকুরের গলায় দিলে তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। এই জন্য পুষ্পোদ্যান স্বামী নির্মলানন্দের এত প্রিয় বস্তু ছিল। আমেরিকায় ও ভারতে তিনি অনেক উদ্যান পরিদর্শনপূর্বক তথ্যসংগ্রহ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি পুষ্পোদ্যান রচনায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। সবল সুদক্ষ হস্তদ্বয় ব্যতীত তিনি অনেক প্রয়োজনীয় মূল্যবান যন্ত্রপাতি এই জন্য কিনিয়াছিলেন। বাগানটি গড়িয়া তুলিবার পর স্বামীজি আশ্রমের পরিবর্ধনে এবং নূতন গৃহনির্মাণে মনোযোগী হইলেন। নবগৃহ ও ফুলের বাগান হইবার পর আশ্রম রমণীয় ও দর্শনীয় হইল। তখন আশ্রমপ্রাঙ্গণ বৃহত্তর করার প্রয়োজন হইল। আরও প্রায় বিশ একর সংলগ্ন জমি ক্রীত, পরিষ্কৃত ও কর্ষিত হইল। দুইটি কূপ খনন করা হইল—একটি আশ্রমের জন্য এবং অন্যটি পার্শ্ববর্তী দরিদ্র গ্রামবাসীদের ব্যবহারার্থে। কূপ খনন সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। শ্রীরাজাগোপাল নাইডু কূপ খনন কালে কিছু অর্থের অভাবে পড়িলেন। আবশ্যকীয় উপাদান পাওয়া গেলে ইটগুলি বিক্রয় করিয়া তিনি অনায়াসে উক্ত অর্থ পাইতে পারিতেন। স্বামীজি তাঁহাকে কূপ খনন করিতে এবং উহার মাটি দিয়া ইট তৈয়ার করিতে পরামর্শ দিলেন। ইট পোড়াইবার জন্য যে কাঠ দরকার তাহা সরবরাহ করিতে স্বামীজি স্বয়ং সম্মত হইলেন। এক শুভদিনে নাইডু যাইয়া পূজাদির আয়োজন করিতেছেন। যেখানে জল উঠিবায় সমধিক সম্ভাবনা সেই স্থানটি তিনি খুঁজিতেছেন। স্বামীজি দৈবাৎ তথায় উপনীত হইলেন এবং সব কথা শুনিয়া অন্তর্দৃষ্টিবলে একটি স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন ও তথায় কূপ খননার্থ নাইডুকে বলিলেন। তথায় কূপ খুঁড়িতে খুঁড়িতে প্রায় পঁচিশ ফুট গভীর স্তরে জল পাওয়া গেল। ইহা আরও গভীর করা হইল। ইহাতে বৎসরের সর্ব ঋতুতে পঁচিশ ফুট জল থাকিত। প্রত্যহ প্রায় পাঁচ শতাধিক নরনারী উহা হইতে জল ব্যবহার করিয়া থাকে। আশ্রমকে

প্রসারিত ও সুশোভিত করিবার পর তিনি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও বাসনকোসন আনিয়া আশ্রমকে সাজাইলেন। এই সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে দেড়হাজার টাকা দামের নারিকেলী গদি বারান্দায় পাতিবার জন্য স্বামীজির এক ভক্ত আল্লেপ্পী শহরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শেঠ খাটাউ খিম্‌জী পাঠাইলেন। এইসকল দ্রব্য ব্যতীত একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার খোলা হইল। ইহাতে সংস্কৃত, ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী ও দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা-সমূহে লিখিত প্রায় চার হাজার ধর্মগ্রন্থ রক্ষিত হইল। এককালে যাহা জঙ্গলে বেষ্টিত অতি ক্ষুদ্র ধর্মস্থান ছিল তাহা আদর্শ আশ্রমে পরিণত হইল স্বামী নির্মলানন্দের প্রচেষ্টায়।

এগার

কেরলে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব

ব্যাঙ্গালোর আশ্রম এবং স্বামী নির্মলানন্দের সুখ্যাতি সমগ্র কেরল প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তস্থ গণ্ডগ্রাম হরিপাদ হইতে স্বামীজির নিকট এক আহ্বান আসিল। বিশাল ভারতের দক্ষিণ প্রান্তস্থ পুণ্য-তীর্থ কন্যাকুমারী উক্ত রাজ্যে অবস্থিত। হিন্দুধর্মের সর্ব সম্প্রদায়ের ভক্তগণ, সাধুবৃন্দ, তপস্বীকুল ও যোগীগণের নিকট এই পুণ্যতীর্থ অতি প্রিয়। তথায় জগজ্জননীর পাদপদ্মে তাঁহারা হৃদয়ের ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া থাকেন। ইহার ফলে তাঁহারা পরম সান্ত্বনা ও দিব্যদর্শনাদি লাভে ধন্য হইয়া থাকেন। বর্তমান যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য স্মৃতি ইহাতে বিজড়িত থাকায় উক্ত তীর্থ আমাদের নিকট প্রিয়তর হইয়াছে। ব্রহ্মর্ষি স্বামীজি সমুদ্রমধ্যস্থ কন্যা-কুমারী মন্দিরে ধ্যানমগ্ন হইয়া যে দিব্যদর্শন ও দিব্যপ্রেরণা পাইলেন তাহার ফলে তাঁহার জীবনে যুগান্তর আসিল। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের এক প্রাচীন রাজা কুলশেখর পেরুমল ভক্তবীর ছিলেন। তিনি ছিলেন নবদ্বীপের প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সমসাময়িক। উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ ও আলিঙ্গন ঘটিয়াছিল এবং উভয়ে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে প্রিয় প্রভুর নামকীর্তন করিয়াছিলেন।

ত্রিবাঙ্কুর আচার্য শঙ্করের জন্মভূমি ও ধর্মরাজ্য হইলেও ইহা সর্বাপেক্ষা পুরোহিত-কবলিত প্রদেশ। গোঁড়ামির চরম প্রকাশ এই প্রদেশে দেখা যায়। বাংলার চণ্ডীদাস গাহিলেন "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই", আর ত্রিবাঙ্কুরের মানুষ মানুষকে শুধু অস্পৃশ্য করিল না, অদৃশ্যও করিয়াছে। কিন্তু ত্রিবাঙ্কুরের এক বিশেষত্ব এই যে, ভারতের যেখানে যখন ধর্মজাগরণ আসিয়াছে তাহাতে ত্রিবাঙ্কুর আন্দোলিত হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর সর্ববিধ ধর্মান্দোলনে শুধু অংশ গ্রহণ করে নাই, অধিকন্তু অশেষ অবদানও করিয়াছে। ইহা শ্রীচৈতন্যের সময়ে যেমন সত্য ছিল, আধুনিক যুগেও তেমনি সত্য। বাংলা ও কেরলের মধ্যে কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ ও সংযোগ বিদ্যমান। ইহা বহির্দৃষ্টিতে বোধগম্য না হইলেও অন্তর্দৃষ্টিতে বেশ ধরা পড়ে। বঙ্গদেশের পরশুরাম যে কেরলে যাইয়া বসবাস করেন ইহা কাল্পনিক হইতে পারে, কিন্তু বাংলা ও কেরলের মধ্যে যে কতগুলি নিকট সাদৃশ্য বিদ্যমান তাহা অস্বীকার করা যায় না।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো শহরে স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের বিজয়পতাকা উড়াইয়া যে যুগান্তকারী বক্তৃতাবলী দিলেন উহার সশ্রদ্ধ শ্রোতা কেরল প্রদেশে সংখ্যাতীত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত কালীপদ ঘোষ কর্মোপলক্ষে ত্রিবান্দমে ছিলেন। তাঁহার সপ্রেম আহ্বানে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবান্দমে যান এবং তথায় উল্লিখিত গুরুভ্রাতার অতিথিরূপে কয়েক মাস অবস্থান করেন। তিনি গভীর আধ্যাত্মিকতা, মর্মস্পর্শী ধর্মালোচনা, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মভাষণ, গীতাব্যাখ্যা এবং সর্বোপরি অনতিক্রম্য গুরুভক্তি ও বলিষ্ঠ আদর্শনিষ্ঠার দ্বারা অনেকের অন্তঃকরণে ধর্মভাব উদ্বুদ্ধ করেন। ইহার ফলে হরিপাদ প্রভৃতি স্থানে ধর্মসমিতি গঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলী অধ্যয়ন ও আলোচনার জন্য এই সকল সমিতির নিয়মিত অধিবেশন হইত। শ্রীরামকৃষ্ণের আর এক সাক্ষাৎ শিষ্যের পুতসঙ্গলাভ এবং অমৃতবাণী শ্রবণার্থ হরিপাদ সমিতি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্বামী নির্মলানন্দকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সমিতির সভাপতি শ্রীপদ্মনাভ থাম্পি ইতঃপূর্বে মাদ্রাজ মঠে স্বামী নির্মলানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পদ্মনাভকে স্বামী নির্মলানন্দের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া বলেন, "ইনি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং কথামৃতে তুলসী নামে উল্লিখিত।" স্বামী নির্মলানন্দ হরিপাদ সমিতির

আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণপূর্বক তথায় উৎসবে পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া সমিতির সভ্যগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং স্বামীজিকে অভিনন্দন পত্র দিয়া স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতে ইচ্ছা করিলেন। অভিনন্দনপত্রে স্বামী নির্মলানন্দের কার্যাবলী উল্লেখ করিবার জন্য সমিতির সম্পাদক স্থানীয় উকিল শ্রীসুব্বারায় আইয়ার মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে পত্র দিলেন। এই পত্র পাইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে লিখিলেন—

"আমার প্রিয় বন্ধু,

আপনার পত্রের জন্য অনেক ধন্যবাদ। স্বামী নির্মলানন্দজী ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাস লইয়াছেন। তাঁহার চারিত্রিক নির্মলতার নিমিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নাম নির্মলানন্দ রাখিয়াছেন। তিনি সারা ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং প্রায় দ্বাদশ বৎসর হিমালয়ে তপস্যায় কাটাইয়াছেন। চম্বারাজ্যের মহারাজা তাঁহার অন্যতম অনুরাগী গুণগ্রাহী হইয়াছিলেন। আমাদের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেদান্ত প্রচারার্থ তাঁহাকে আমেরিকা পাঠাইয়াছিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ আমেরিকায় এত উত্তমরূপে প্রচারকার্য করেন যে, তথাকার ভক্তগণ তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন নাই। কিন্তু স্বদেশের জরুরী আহ্বানে তিনি মাতৃভূমির পুনর্জাগরণের জন্য কর্ম করিতে আসিতে বাধ্য হন। তিনি কিছুকাল পূর্ববঙ্গ ও আসামে প্রচার করিয়াছেন। অনন্তর তিনি ব্যাঙ্গালোরে প্রেরিত হন এবং তথা হইতে তোমরা তাঁহাকে আনাইতেছ। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

রামকৃষ্ণানন্দ"

স্বামী নির্মলানন্দের পাথেয় বাবদ হরিপাদ সমিতি চল্লিশ টাকা পাঠাইলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি এর্নাকুলম রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিলেন। সমিতির সম্পাদক ও এক সভ্য তথায় আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে একটি সেবকসহ আসিবেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, তিনি তৃতীয় শ্রেণীর

গাড়ী হইতে নামিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে কোন সেবক নাই। যখন তিনি অব্যয়িত পাথেয় তাঁহাদিগকে ফেরৎ দিলেন, তাঁহারা আরও বিস্মিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা তাঁহাকে ষ্টীমারে করিয়া এল্লেপ্পিতে লইয়া গেলেন। তিনি ষ্টীমার ঘাটে নামিতেই স্থানীয় উকিলগণ, সরকারী কর্মচারীগণ এবং সনাতন ধর্ম বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে সংবর্ধনা করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া গেলেন। তথায় অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি ভক্তি ধর্ম সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত বাগ্মিতা-পূর্ণ ও প্রেরণাপ্রদ ভাষণ দিলেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন, "ভক্তি তিন প্রকার—প্রথম সকাম ভক্তি। উহা নিষ্কাম ভক্তিতে পরিণত হয় এবং অবশেষে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ হয়।" এল্লেপ্পিতে নামিবার পর হইতে হরিপাদ যাত্রার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহাকে তথায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতে স্বামী নির্মলানন্দ দেশীয় বোটে হরিপাদ যাত্রা করিলেন। তথায় নামিবার সময়ে সমিতির সভ্যগণ, স্থানীয় উকিলবৃন্দ, কর্মচারীগণ এবং বহু ভদ্র-লোক কর্তৃক তিনি অভিনন্দিত হন। সংস্কৃতে ও ইংরাজীতে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। তাঁহাদিগকে অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া তিনি বলেন, "এই দুই পত্রে আপনারা আমাকে সম্মানিত করেন নাই ; পরন্তু আমার শ্রীগুরু মহারাজের প্রতি আপনাদের গভীর ভক্তি দেখাইয়াছেন।" স্বামীজি স্বীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দান কালে এত ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বাক্‌রোধ হয় এবং তিনি অশ্রুবর্ষণ করেন। ইহা দেখিয়া সমস্ত শ্রোতৃবৃন্দের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হয়। পরদিন বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এই উপলক্ষে সারা সকাল তথাকার দেবমন্দিরে ভজন-কীর্তনে অতিবাহিত হইল। শোভাযাত্রার পরে প্রায় আড়াই হাজার সর্বশ্রেণীর দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষ-পূর্বক খাওয়ান হইল। পুলায়া এবং অন্যান্য তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর অস্পৃশ্যগণকে তিন স্থানে বসাইয়া খাওয়ান হইল। অনন্তর স্বামীজি "হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি" সম্বন্ধে একটি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন। সভার অধিকাংশ শ্রোতা ইংরাজী জানিত না বলিয়া স্বামীজির বক্তৃতা মালয়ালাম্ ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। সান্ধ্য ভজনারতির পর তিনি যে ধর্মবিষয়ক কথোপকথন করিলেন, তাহা অত্যন্ত প্রেরণাপদ ও শক্তিদায়ক।*

---

* 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (ষোড়শ বর্ষ, ৯৫ পৃষ্ঠায়) ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত।

পরদিন প্রাতঃকালে স্বামীজি শনুথ বিলাস স্কুলের ছাত্রবৃন্দকে সংক্ষেপে উপদেশ দেন, বিভিন্ন ধর্মবিষয়ে আলোচনা করেন, সমিতিতে ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করেন এবং ধ্যান শিক্ষা দেন। সন্ধ্যায় তিনি উক্ত হাই স্কুলে ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। সমিতির কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে উহার সভ্যগণকে মূল্যবান উপদেশদানান্তে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন এবং কুইলন দিয়া ব্যাঙ্গালোরে ফিরিয়া আসেন। এই প্রথম গমনে স্বামীজি কতিপয় ভক্তের হৃদয়ে কত গভীর ও স্থায়ী দাগ কাটিয়াছিলেন ও কিরূপে তাঁহাদের জীবন চিরতরে পরিবর্তিত হইয়াছিল তাহা নিম্নোক্ত কয়েকটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা হইতে স্থায়ীভাবে জানা যায়। সমবেত শ্রোতাদের মধ্যে একজন "নীলকণ্ঠ ভক্ত আপনাকে প্রণাম করছে" বলিয়া এক লাফে স্বামীজির চরণপ্রান্তে যাইয়া পড়িলেন এবং ভক্তিভরে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। স্বামীজি উক্ত ভক্তকে সপ্রেমে তুলিয়া বলিলেন, "ইনি নীলকণ্ঠের পরম ভক্ত। আমি ইহার প্রণাম লইবার যোগ্য নহি।" স্বামীজি তাঁহার ভক্তির উচ্চ প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার নাম ভক্ত রাখিলেন। এই নামে উক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত পরিচিত ছিলেন। তিনি পরে বেলুড়মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকট মন্ত্র দীক্ষা লইয়া ব্রহ্মচারী হইলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণান্তে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ নামে অভিহিত হন। অনন্তর তিনি হৃষীকেশের অদূরে বশিষ্ঠ গুহাতে থাকিয়া তপস্যা করিলেন। সম্ভবতঃ ১৯৪৪ সালে কন্‌খল সেবাশ্রমে বর্তমান লেখকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়।

অন্য এক ভক্ত অবিরত অশ্রুজল ফেলিতেছিলেন বলিয়া স্বামীজি তাঁহার নাম রাখিলেন রোরুদ্যমান বালক। পরবর্তী কালে তিনি ব্যাঙ্গালোর হইতে উক্ত সমিতিতে যে সকল পত্র লিখিতেন তাহাতে তাঁহার রোরুদ্যমান বালকের বিশেষ যত্ন লইবার জন্য নির্দেশ দিতেন। এই ভক্ত কেরল প্রদেশে প্রথম রামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপনের জন্য ভূসম্পত্তি দান করেন। তিনি উক্ত আশ্রমের ব্রহ্মচারীরূপে বাস করেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হন এবং স্বামী নির্মলানন্দের নিকট সন্ন্যাস লইয়া স্বামী চিৎসুখানন্দ নাম গ্রহণ করেন। উকিল শ্রীসুব্বারায় আইয়ার মিশনের কার্যের জন্য স্বামীজিকে এক হাজার টাকা দান করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু স্বামী নির্মলানন্দ উক্ত অর্থ হরিপাদ সমিতির জন্য জমা রাখিতে বলেন। হরিপাদ আশ্রমের ভিত্তি স্থাপনার্থ

ইহাই আদি দান। ইহা সুস্পষ্ট যে স্বামীজি হরিপাদের পরিবেশ আশ্রমের পক্ষে অনুকূল বুঝিয়া ঠাকুর ঘর নির্মাণার্থ উক্ত অর্থ রাখিয়া যান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ যখন হরিপাদ পরিদর্শন করেন, তখন উহার আধ্যাত্মিক পরিবেশ অনুভবপূর্বক ভূয়সী প্রশংসা করেন। তখন শ্রীসুব্বারায় আইয়ার নিঃসন্তান ছিলেন এবং তিনি সন্তান লাভের সকল আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বামী নির্মলানন্দের আশীবলাভের পর তিনি তিন পুত্র লাভ করেন।

হরিপাদ হইতে স্বামী নির্মলানন্দ কুইলনে যাইয়া একটি বক্তৃতা দেন। তথায় কোন দর্শক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "সাধ্যমত সাধন করিয়াও আমি আধ্যাত্মিক উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না কেন?" স্বামীজি উত্তর দিলেন, "কোন পরিক্ষার্থী ছয়বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলেও সপ্তমবারে সে কৃতকার্য হইতে পারে। ধর্মসাধনেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে।" বাস্তব পক্ষে এই প্রষ্টা ছয়বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া সপ্তম বারে সাফল্য লাভ করে। স্বামীজির উত্তর শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন। বিদায় গ্রহণ কালে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন এবং যাঁহারা সঙ্গে আসিয়াছিলেন, সকলেই স্বভাবতঃ স্বামীজির চরণে প্রণতি জানাইতে আগ্রহান্বিত হইলেন। কিন্তু তিনি কি করিতে উদ্যত হইতেছেন ইহা তাঁহারা বুঝিবার পূর্বেই স্বামীজি সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন এবং নীরবে রেলগাড়ীতে উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কেরল প্রদেশে তিনি স্থায়ী ছাপ রাখিয়া গেলেন।

বার

দাক্ষিণাত্যে সংঘমাতা

স্বামী নির্মলানন্দের প্রাণপাতী পরিশ্রমে এবং সপ্রেম প্রযত্নে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের শক্তি, সৌন্দর্য, মর্যাদা ও উপকারিতা বহুগুণে বর্ধিত হইল কিন্তু তিনি আরও কিছু চিরস্থায়ী, প্রাণপ্রদ ও প্রেরণাদায়ক ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে অথবা ১৩১৭ সালের শেষার্ধে সংঘমাতা সারদাদেবী গোলাপ মা, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী ধীরানন্দ প্রভৃতি সাধুভক্তদের সহিত

উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত কোঠার হইতে মাঘের শেষে মাদ্রাজে পৌছিলেন। সংঘমাতাকে সংবর্ধনা করিবার জন্ম মাদ্রাজ রামকৃষ্ণমঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সদলবলে মাদ্রাজ ষ্টেশনে আসিলেন। মাদ্রাজমঠের অদূরে একটি দ্বিতল গৃহ তাঁহাদের জন্য প্রস্তুত ছিল। সংঘমাতা ট্রেন হইতে নামিবার পর সহর্ষ জয়ধ্বনিতে সমগ্র ষ্টেশন মুখরিত হইল। অনন্তর তাঁহাকে উক্ত গৃহে মোটর গাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল। সংঘমাতা মাদ্রাজে প্রায় একমাস রহিলেন এবং নগরের প্রধান দ্রষ্টব্যগুলি দেখিলেন। মাদ্রাজের সুবিখ্যাত সমুদ্রতীরে তাঁহাকে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় লইয়া যাওয়া হইত। এইরূপে তিনি কপালীশ্বর মন্দির, পার্থসারথি মন্দির, কেল্লা প্রভৃতি দর্শন করেন। দাক্ষিণাত্যে অনেক পুরুষ ও মহিলা শ্রীমার নিকট দীক্ষা লইলেন। ইহা অতীব আশ্চর্যজনক যে, দোভাষীর সাহায্য ব্যতীতই তিনি মন্ত্রদান, জপ প্রণালী এবং ধ্যানের প্রক্রিয়াদি দীক্ষিতদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। অবশ্য অন্য সময় কথাবার্তা বলিবার ও শুনিবার জন্য দোভাষীর আবশ্যক হইত।

মাদ্রাজ হইতে স্নেহময়ী সংঘমাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে সঙ্গে লইয়া রামেশ্বর তীর্থদর্শনে গমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায় মাদ্রাজে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। পথিমধ্যে মাদুরায় সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষী দেবী দর্শন করিয়া তাঁহারা রামেশ্বর দ্বীপে উপনীত হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে তাঁহারা সমুদ্র স্নানান্তে রামেশ্বর মন্দির দর্শন করিতে গেলেন এবং কুণ্ড-মধ্যস্থ বালুকাময় লিঙ্গমূর্তি রামেশ্বর দর্শন করিলেন। তখন রামেশ্বর দ্বীপ ও মন্দির রামনাদের রাজার অধীনে ছিল। রামনাদের রাজা স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন এবং সংঘমাতার মন্দির দর্শনের সর্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিলেন। সংঘমাতা রামেশ্বর শিবলিঙ্গকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত একশত আটটি স্বর্ণময় বিল্বপত্র দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। তিনি অনাবৃত শিবলিঙ্গকে দেখিয়া পূর্বজন্মের ধ্রুবাস্মৃতি স্মরণপূর্বক স্বগত মন্তব্য করিলেন, "যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছে।" অনুরক্ত ভক্ত-বৃন্দের বিশ্বাস, যিনি ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্রের সহধর্মিণী সীতারূপে আবির্ভূতা হইয়া রামেশ্বরে বালুকাময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তিনিই পুনরায় কলি যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী সর্বংসহা স্নেহময়ী সারদাদেবী রূপে অবতীর্ণা। সংঘমাতা রামেশ্বরে তিন রাত্রি বাস করিয়া মাদ্রাজে ফিরিলেন এবং তথায়

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব দর্শনান্তে ১০ই চৈত্র ব্যাঙ্গালোরে গমন করেন। মাদ্রাজ হইতে সংঘমাতার ব্যাঙ্গালোরে গমন একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। স্বামী আত্মানন্দ, যিনি ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের গৃহনির্মাণকালে উহার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং অসুস্থতা নিবন্ধন হঠাৎ অন্যত্র চলিয়া যান, শ্রীমার দলভুক্ত ছিলেন। তিনি মাদ্রাজ হইতে ব্যাঙ্গালোরে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সংঘমাতাও ব্যাঙ্গা-লোরে গমনেচ্ছা ত্যাগ করেন। শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার, শ্রীরাজাগোপাল নাইডু প্রভৃতি ভক্তগণ স্বামী বিশুদ্ধানন্দের সহিত ব্যাঙ্গালোর হইতে মাদ্রাজে যাইয়া শ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা নিশ্চিত করিয়া বলিলেন যে, শ্রীমা ব্যাঙ্গালোরে আসিবেন না। ব্যাঙ্গালোরের শত শত নরনারী শ্রীমার পুণ্য দর্শনের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে মাদ্রাজ বা অন্যত্র যাইয়া সংঘমাতার দর্শনলাভ সম্ভবপর ছিল না। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাদের কথা ভাবিয়া বিচলিত হইলেন এবং ব্যথিত হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন, "শ্রীমার পদধূলি ব্যাঙ্গালোরে পড়িবে না?" তিনি সত্বর মাদ্রাজ মঠে যাইয়া দুই দিন রহিলেন এবং ব্যাঙ্গালোরে পদার্পণ করিবার জন্য সংঘমাতাকে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। স্নেহময়ী সংঘজননী সুসন্তানের প্রার্থনায় ব্যাঙ্গালোরে যাইতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে সঙ্গীগণসহ তিনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ অথবা ১৩১৭ সালের ১০ই চৈত্র শুক্রবার উষাকালে ব্যাঙ্গালোরে শুভাগমন করিলেন।

পূর্ব হইতে সংবাদ পাইয়া নানাস্থান হইতে ভক্তবৃন্দ শ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য ষ্টেশনে আসিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে রামকৃষ্ণ আশ্রম পর্যন্ত সুসজ্জিত রাজপথে হাজার হাজার উদ্‌গ্রীব নরনারী সারদাদেবীর দর্শনার্থ দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজপথের দুইদিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং শঙ্খধ্বনি দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিল। স্বামী নির্মলানন্দ স্বয়ং শ্রীমার পূজার বাক্সটি মাথায় করিয়া আশ্রমে আনিলেন। শ্রীমা এবং তাঁহার সঙ্গিনীগণ আশ্রমগৃহে রহিলেন এবং ভক্তগণ ও সাধুবৃন্দ প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটাইয়া বাস করিলেন। শ্রীমার শুভাগমন সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হওয়ায় প্রত্যহ শত শত নরনারী আসিয়া তাঁহার পাদপদ্মে সভক্তি প্রণিপাত করিলেন এবং পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। তাঁহারা যে ফুলগুলি শ্রীমার চরণে অঞ্জলি দিতেন সেইগুলি জমিয়া এক একদিন স্তূপাকার ধারণ করিত। সংঘমাতা চারদিন ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে রহিলেন। আশ্রমে

শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী

দিব্যানন্দ ও শ্রদ্ধাভক্তির সুরধুনী প্রবাহিত হইল। ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের ইতিহাসে এই অবিস্মরণীয় দিবস চতুষ্টয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার ও তাঁহার পুত্রকন্যাগণ এবং শ্রীরাজাগোপাল নাইডু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে স্বামী নির্মলানন্দের প্রার্থনায় সংঘমাতা দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিলেন। সংঘমাতার পাদস্পর্শে ব্যাঙ্গালোর আশ্রম যুগধর্মের পাদপীঠে পরিণত হইল।

ব্যাঙ্গালোর আশ্রম দেখিয়া সংঘমাতা অতিশয় আনন্দিতা হন। আশ্রমভূমি বহু ফল ফুলের বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত। ইহার সম্মুখে প্রশস্ত বুল টেম্পল রোড্ অদূরে অবস্থিত বাসভবন গুডিবা বৃষভ মন্দির পর্যন্ত প্রসারিত। উক্ত মন্দিরে সুবৃহৎ শিববাহন বৃষভ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত এবং তথায় প্রত্যহ শত শত যাত্রী আসিয়া পূজা দেন। একদিন অপরাহ্নে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সংঘমাতাকে গাড়ীতে করিয়া আশ্রমের পশ্চাতে অদূরস্থ গুহামন্দিরে লইয়া যান। শ্রীমা গাড়ী হইতে নামিয়া মন্দিরে দর্শনাদি করিলেন এবং আবার গাড়ীতে চড়িয়া আশ্রমে ফিরিলেন। উক্ত মন্দিরে যাত্রাকালে আশ্রম প্রাঙ্গণে দুই চারিটি সাধু ও ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না; কিন্তু ফিরিবার সময় ফটকে আসিতেই দেখা গেল, সুবিস্তৃত আশ্রমপ্রাঙ্গণে জনসমুদ্র। শ্রীমার গাড়ীর শব্দ পাইয়াই বিশাল জনতা ভক্তি-ভরে দাঁড়াইল এবং সংঘমাতাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। সেই দিব্য দৃশ্য দেখিয়া সংঘমাতা ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং গাড়ী হইতে নামিয়া অভয় মুদ্রায় ডানহাত তুলিয়া চিত্রার্পিতবৎ প্রায় পাঁচ মিনিট সময় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন দশ দিক নীরব, নিস্তব্ধ, প্রশান্ত। মাতৃশক্তির পূতস্পর্শে ভক্তগণ দিব্যানন্দে অভিভূত। অনন্তর সংঘমাতা মন্থর গমনে আশ্রম গৃহে যাইয়া ঠাকুর ঘরের সম্মুখস্থ হলে বসিলেন। তথায় ভক্তবৃন্দ জগদম্বার স্নিগ্ধ দৃষ্টি লাভে ধন্য হইলেন। মৌনা মাতার করুণাস্পন্দনে ভক্তহৃদয়ের সর্বসংশয় সংছিন্ন হইল। সেই নিবিড় নীরবতা ভঙ্গ করিয়া করুণাময়ী সারদাদেবী স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে বলিলেন, "এদের ভাষা তো জানিনা; দুটি কথা শুনতে পেলে এরা কত শান্তি পেত" এই কথা স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সমবেত ভক্তবৃন্দকে ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিলেন। ইহা শুনিয়া তাঁহারা সানন্দে বলিলেন, "না, না, এই বেশ। এতেই আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে, এমন সময় মুখের ভাষার দরকার নাই।" মাতৃস্নেহ ভাষায় প্রকাশিত না হইলেও অদৃশ্যভাবে প্রকটিত হয়।

আর এক সন্ধ্যায় সংঘমাতা আশ্রমের পশ্চাতে আশ্রমভূমির উপর অবস্থিত ছোট্ট পাহাড়ে যাইয়া সূর্যাস্ত দেখিতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া রামকৃষ্ণানন্দ ক্ষিপ্রবেগে তথায় আসিলেন এবং বলিলেন, "শ্রীমা পর্বতবাসিনী হয়েছেন।" তিনি পাহাড়ে উঠিয়া মাতৃসমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং মাতৃপদে মস্তক রাখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, "কৃপা, কৃপা।" শ্রীমা মাতৃভক্ত সন্তানের মাথায় হাত বুলাইয়া যেন অবোধ সন্তানকে শান্ত করিতে লাগিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ক্রমশঃ প্রকিতস্থ হইয়া বিদায় লইলেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী নির্মলানন্দের প্রার্থনায় সংঘমাতা উক্ত পাহাড়ের শীর্ষদেশে পশ্চিমাস্যে বসিয়া কিছুক্ষণ জপও করিলেন। তদবধি সেই স্থান পুণ্য তীর্থে পরিণত। শত শত নরনারী তথায় যাইয়া মাতৃ-স্মৃতি অনুধ্যানে মগ্ন হয়।

শ্রীমার বিদায়দিবসে ভক্তগণ স্বভাবতঃই গভীর বিষাদে নিমগ্ন হইলেন; কিন্তু শ্রীমার সন্তান স্বামী নির্মলানন্দ অপেক্ষা অন্য কেহই অধিকতর বিষণ্ণ হন নাই। এই শত শত ভক্তের সমক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি অবোধ বালকবৎ কাঁদিতে লাগিলেন। যে বেদান্ত-কেশরীর বজ্রনাদে দক্ষিণভারত প্রকম্পিত, তিনি শ্রীমার সম্মুখে রোরুদ্যমান সন্তানবৎ আচরণ করিলেন। তিনি শ্রীমার সহিত মাদ্রাজ পর্যন্ত গেলেন। তথায় দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া শ্রীমা কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা পথে রাজমহেন্দ্রী, পুরী প্রভৃতি স্থানে থামিয়া ২৮শে চৈত্র কলিকাতায় পৌঁছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে রহিয়া গেলেন এবং স্বামী নির্মলানন্দ শ্রীমার সহিত কলিকাতা পর্যন্ত আসিলেন।

তের

ত্রিবান্দ্রমে পদার্পণ

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া স্বামী নির্মলানন্দ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বার কেরল প্রদেশে গমন করেন। এইবার তিনি ত্রিবান্দ্রম বেদান্ত সমিতির আমন্ত্রণে তথায় যান। উক্ত সমিতির সভাপতি ছিলেন ডাক্তার রমন থাম্পি। ত্রিবান্দ্রম ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী। তথায় স্বামী নির্মলানন্দ এই

প্রথম গেলেন। ইহার পর প্রত্যেক বৎসর তথায় তিনি অন্ততঃ একবার যাইয়া অদ্ভুত সাফল্য লাভ করেন। যদিও তিনি মার্চ মাসেই কেরল ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তত্রস্থ বন্ধুদের সহিত নিয়মিত পত্রযোগে তাঁহাদের কুশল-সংবাদ এবং কার্যাবলীর প্রগতি সম্বন্ধে খবর লইতেন। তিনি কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি কদাপি অমনোযোগী ছিলেন না। বেদান্ত সমিতির যে সভ্যগণ তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন তাঁহারা কুইলন পর্যন্ত যাইয়া তাঁহাকে সংবর্ধনা করেন। তথা হইতে তাঁহারা পল্লীর নৌকায় ত্রিবান্দ্রম অভিমুখে চলিলেন। তখন ত্রিবান্দ্রম পর্যন্ত রেলওয়ে বিস্তৃত না হওয়ায় জলপথে গমন ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। সমিতির সভ্যগণ ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন যে, স্বামীজি কাহারও নিকট হইতে ব্যক্তিগত সেবা লইলেন না। স্বামীজি সহাস্যে বলিলেন, 'আমি মাখন নই যে, সামান্য আঘাতে গলিয়া যাইব। আমি এখন এত সবল আছি যে, অন্যের সেবা করিতে পারি।' নৌকায় যাত্রাকালে রাত্রিতে একটি আলো ঝুলাইয়া রাখিবার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন এবং মন্তব্য করিলেন, 'অন্ধকারে অসৎ চিন্তা প্রবল হয়।' সেই রাত্রে তিনি আহার করিলেন না, এবং শুধু ধূমপান করিয়া কাটাইলেন। তিনি কৌতুক করিয়া তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "আপনারা জড়-ভূমিতে আহার করিতেছেন, আর আমি ভাব-ভূমিতে অবস্থান করিতেছি।" ত্রিবান্দ্রমে অবতরণ করিবার পর তাঁহাকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেওয়া হইল এবং সুসজ্জিত রাজপথ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া নেওয়া হইল। তথায় তাঁহাকে বিরাট অভিনন্দন দেওয়া হইল। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আমেরিকায় একটি প্রবাদ আছে, যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার কুকুরকে ভালবাসিবে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আপনাদের গভীর প্রীতি আছে বলিয়া আপনারা তাঁহার এই কুকুরকে এত শ্রদ্ধা করিতেছেন।" স্বামী নির্মলানন্দ ত্রিবান্দ্রমে বেশ কিছুদিন কাটাইলেন। সুবিখ্যাত ডাক্তার কৃষ্ণ পিলে স্বামীজির জন্য তাঁহার প্রশস্ত গৃহ ছাড়িয়া দেন। এই ডাক্তার একজন ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পরিজনবর্গ স্বামীজির গোঁড়া ভক্ত হইয়া পড়িলেন। স্বামীজি প্রায় প্রত্যহই স্থানীয় হাই স্কুলে প্রশ্নোত্তর সভা করিতেন এবং তিনটি বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার জন্য কোন সভাপতির প্রয়োজন হইত না। তথাপি প্রচলিত প্রথা অনুসরণে জুবিলি টাউনে হলে আহূত দুইটি বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইল। এই দুই

বক্তৃতার বিষয় ছিল, 'হিন্দুধর্মের সাধারণ আদর্শ' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় বাণী।' সাধারণতঃ তিনি সভাপতির অভিভাষণের পরেও আবার কিছু বলিতেন, যাহাতে ধর্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ সভাপতি কর্তৃক উচ্চারিত কোন ভুল ধারণা লইয়া শ্রোতৃবৃন্দ চলিয়া না যান। অতি নীরস অপ্রিয় বক্তৃতা কোন সুশিক্ষিত ভক্ত কর্তৃক প্রদত্ত হইলে স্বামীজি বিরক্ত হইয়া মন্তব্য করিলেন, "আপনি বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগ করিয়া এমন কৃত্রিম বাগ্মিতার মাধ্যমে যে ভাষণ দিলেন তাহা শ্রোতাদের অন্তরে কোন তরঙ্গ তুলিল না, কোন ফল প্রসব করিল না। যদি আপনার ভাবসম্পদ থাকে তবে আবেগভরে সেই ভাব প্রকাশে মনোযোগী হইলে রচনাকৌশল স্বতঃই মনে ভাসে। শ্রীগুরুর কৃপায় আমার কিছু বক্তব্য আছে বলিয়া পাশ্চাত্য দেশের ধর্মসভাতেও তাহাদের ভাষায় ভাষণ দিতে ইতস্ততঃ করি নাই। তদ্দেশীয় সমাজে শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ আমার সভায় আসিয়া মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শুনিত।" এইরূপ স্পষ্ট কথা বলিবার সৎসাহস কয়জন সাধুর আছে?

স্বামী নির্মলানন্দ উক্ত নগরে কস্‌মোপলিটান ক্লাবেও বক্তৃতা দানার্থ আমন্ত্রিত হন। উক্ত সভার সভাপতি মন্তব্য করিলেন, স্বামীজি একনিষ্ঠ বৈদান্তিক এবং 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে সুবিশ্বাসী, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই বিশ্ব-প্রেমিক। নির্মলানন্দজী উক্ত মন্তব্যের মর্মার্থ বুঝিয়া বলিলেন—নিঃসন্দেহে বৈদান্তিক মাত্রই বিশ্বপ্রেমিক। অনন্তর তিনি তথাকথিত বিশ্বপ্রেমিক সভাপতির উপর প্রবল আক্রমণ করিয়া বলিলেন, "সকলের সঙ্গে বসিয়া এখানে সেখানে পানাহার করিলেই কেহ বিশ্বপ্রেমিক হয় না।" তিনি তথাকথিত সমাজ-সংস্কারকগণের দোষ দেখাইয়া বলিলেন "তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীকে নিম্নে টানিয়া ফেলিয়া অবনত করিতেছে; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি দান করিয়া নিম্ন শ্রেণীকে উন্নত করিতে পারিতেছে না।" অনন্তর তিনি ভারতের উন্নতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দের সংস্কারপদ্ধতি বিবৃত করিলেন। এই বক্তৃতার ফলে বেদান্ত সমিতিতে নিরক্ষর দরিদ্রদের উপকারার্থ নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইল এবং বেদান্ত-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সেবাধর্মের অনুষ্ঠান চলিল।

একদিন তিনি গীতার দ্বাদশ অধ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে শিষ্যদের নিকট ঈশ্বরের সরাট ও বিরাট রূপ ব্যাখ্যা করিলেন এবং বলিলেন, "উপাসনা শব্দের অর্থ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে উপবেশন। প্রীতিবলে ভক্ত ক্রমশঃ প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্য

লাভ করেন। সমীপস্থ বাগানে যে গোলাপফুল ফুটিয়াছে তাহা আমরা ভালবাসি বলিয়া চয়ন পূর্বক আঘ্রাণ করি এবং আমাদের বুকে জামার পকেটে লাগাইয়া রাখি।" তৎপ্রদত্ত উদাহরণের মধ্যে ইহা অন্যতম। তিনি যে ঘরে থাকিতেন তথায় অতি প্রত্যূষে অনুরাগী ভক্তগণ সমবেত হইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ফটোদ্বয়ের সন্মুখে ফুল দিয়া ও ধূপ জ্বালিয়া স্বামীজি যোগাসনে বসিতেন এবং অন্যান্য সকলকে সোজা হইয়া বসিতে শিক্ষা দিতেন। অনন্তর তিনি বলিতেন, "এখন আপনারা চক্ষু বন্ধ করিয়া সমগ্র জগতের প্রতি শুভ চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করুন। সকলের কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা জানান। তৎপরে সমস্ত মহাপুরুষ, ধর্মগুরু, দেবগণ ও অবতারগণকে প্রণাম পূর্বক তাঁহাদের করুণা প্রর্থনা করুন। তৎপরে স্ব স্ব হৃদয়ে একটি জ্যোতির্ময় পদ্ম কল্পনা করুন এবং ভাবুন স্ব স্ব ইষ্টদেব ইহার উপর উপবিষ্ট। ইষ্টদেবকে জীবন্ত, চিন্ময়, ভাবিতে হইবে। এইরূপে হৃৎপদ্মে ইষ্ট মূর্তি ধ্যান করিলে ধ্যেয় দেব জাগ্রত হইয়া ভক্তের সহিত কথা বলিবেন এবং সর্বসংশয় ছিন্ন করিবেন।" স্বামীজির এক অনুরাগী ভক্ত বলেন. "এইরূপে আমরা ধর্মসাধনায় দীক্ষিত হইলাম। অনেকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, সেদিন স্বামীজির কৃপায় আমাদের নিকট ধর্মরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। তিনি প্রায় আমাদিগকে সর্বান্তঃকরণে নিয়মিত ধ্যানাভ্যাস করিতে উৎসাহ দিতেন ও বলিতেন, "এইরূপ অভ্যাসের ফলে আমাদের যে কত লাভ হয় তাহা আমরা এখনও ধারণা করিতে পারি না।" প্রথম দিন ধ্যান শিক্ষান্তে তিনি সমবেত ভক্তবৃন্দের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপূর্বক বলিলেন, "আপনারা সকলে ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দির।"

যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে একজন ধ্যানে বসিবার পূর্বে স্নান করিয়াছিলেন। ইহাতে স্বামীজি মন্তব্য করিলেন, 'জোঁক সর্বদা জলে থাকে; তথাপি ইহাকে কেহ পবিত্র মনে করে না। অন্তরের পবিত্রতাই আবশ্যক, শুধু বাহ্য পরিচ্ছন্নতা নয়।" অন্য এক সময় ধ্যান সম্বন্ধে নিম্নোক্ত উপদেশ দেন, "প্রত্যহ কেবল অল্পক্ষণের জন্য ধ্যান করিলে অধিক উন্নতি হইবে না। কারণ অবশিষ্ট সময় বিষয় চিন্তায় অতিবাহিত হয়। অন্য সময় তোমার মনে যে সকল সংস্কার জন্ম-জন্মান্তর হইতে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, সেইগুলিকে তুলিয়া ফেলাই নিত্য ধ্যানের উদ্দেশ্য। প্রত্যহ এই অভ্যাস পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে। তুমি যে কর্মে নিযুক্ত থাক না কেন মনের এই এক অংশ সর্বদা ঈশ্বরমুখী

রাখিতে হইবে; নচেৎ প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব। ইহাতে অভ্যস্ত হইলে যখনই তুমি ধ্যানে বসিবে তখনই মন একাগ্র হইবে। সর্বাবস্থায় ঈশ্বর-চিন্তা তৈল-ধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন রাখা যায়। প্রাত্যহিক একনিষ্ঠ ধ্যান অভ্যাস করিলে এই ফল লাভ হয়। নিরন্তর দন্তশূল থাকিলেও আমরা কি আমাদের সকল দৈনিক কর্তব্য সম্পন্ন করি না? উক্ত প্রকারে নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিলে এমন এক অবস্থা লাভ হয় যখন এক মুহূর্তও ঈশ্বর-চিন্তা ছাড়া যায় না।"

প্রথমবার স্বামী নির্মলানন্দ যখন ত্রিবান্দ্রমে যান তখন তথায় আশ্রম স্থাপনের বিষয় আলোচিত হয়। একখানি চাঁদার খাতা তখনই খোলা হয়। স্বামীজি পরিষ্কার, সুস্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে নাগরী হরফে উহাতে লিখিয়া দেন, 'ওঁ ভগবতে রামকৃষ্ণায়' এবং তালিকার প্রথমে চাঁদা দাতারূপে নিজের নাম লিখিয়া কয়েক টাকার প্রতিশ্রুতি লিখিয়া দেন। ঐ টাকা তিনি তখনই দিয়া দিলেন এবং কৌতুকচ্ছলে মন্তব্য করিলেন, "এই চাঁদা দিবার জন্য আর যেন জন্ম নিতে না হয়।" তাহার পর ডাক্তার থাম্পি এবং অন্যান্য বন্ধুগণ শত ও সহস্র টাকা পর্যন্ত প্রতিশ্রুত অর্থের সংখ্যা লিখিলেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু তিনি ইহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন বন্ধুবর্গ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের উদাহরণ দিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পরামর্শদাতাকে চিঠির খসড়া করিতে বলিলেন। উক্ত খসড়া প্রচলিত প্রথায় এই ভাবে আরম্ভ হইল—মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চাই ইত্যাদি। ইহা দেখিয়া স্বামীজি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মহারাজার প্রতি সন্ন্যাসীর কিভাবে লেখা উচিত তাহা তুমি জান না। যদিও সে ক্ষুদ্র তথাপি সে আদর্শকে অবনত করিবে না।" অনন্তর তিনি এইরূপ লিখিতে আদেশ দিলেন—'আমি শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য। আমি আপনার রাজধানীতে আসিয়াছি। আমি সাক্ষাৎ ভাবে আপনাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি ইত্যাদি।" তখন মহারাজা অসুস্থ ছিলেন বলিয়া স্বামীজিকে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষিত অনুমতি দেন নাই। তৎপরে স্বামীজি মহারাজের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা আর করেন নাই। সম্রাট্ ঐহিক ঐশ্বর্যের অধিকারী এবং সন্ন্যাসী স্বর্গীয় সম্পদের মালিক। ত্রিবান্দ্রমের জনসাধারণ তাঁহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন রকম এক মানুষ দেখিলেন। সর্ব-

প্রকারে তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা বড় ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি কি নম্র, কি সদয়, কি স্নেহশীল, কি নিঃস্বার্থ! তিনি অব্যয়িত পাথেয় ফেরৎ দেন, যদিও সেই টাকা সর্বভাবে তাঁহারই প্রাপ্য ছিল। তিনি বড় বড় দান গ্রহণ করেন না! তিনি তাঁহাদের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বলিতে লাগিলেন, "তিনি সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং অদ্ভুত মানুষ।" নির্বাক বিস্ময়ে তাঁহারা তৎপ্রতি তাকাইয়া থাকিতেন এবং গভীর ভাবে আকৃষ্ট হইতেন। প্রথমবার অবস্থানের সময় ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যে সকল অনুরক্ত ভক্ত তাঁহার কাছে আসিলেন তন্মধ্যে আশ্রমের সাহায্যকারীরূপে শ্রীরাম ওয়ারিয়ার, শ্রীনীলকণ্ঠ পিলে, শ্রীশিবরাম পিলে, শ্রীশংকর পিলে প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত অবিচলিত রহিলেন। ত্রিবান্দ্রমে যাইবার পথে হরিপাদ পড়ে। ত্রিবান্দ্রমকে কেন্দ্র করিয়া স্বামী নির্মলানন্দ শুধু ত্রিবান্দ্রম কেন, সমগ্র ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ও কেরল প্রদেশকেও নাড়া দিলেন। তথায় তিনি যে হোমাগ্নি জ্বালিলেন তাহা নিভিয়া যাইবে না, যে মহাশক্তি প্রকট করিলেন তাহা বিনষ্ট হইবে না, যে ধর্মস্রোত বহাইলেন তাহা বাধিত বা ব্যাহত হইবে না। ত্রিবান্দ্রমে ভিত্তি সুদৃঢ় হইল দেখিয়া তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তথা হইতে কন্যাকুমারী তীর্থদর্শনে গেলেন। এই সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, তিনি তাঁহার ব্যাটারী পুনরায় বিদ্যুৎপূর্ণ করিতে কন্যাকুমারীতে যাইতেছেন। তৎপরে তিনি যতবার ত্রিবান্দ্রমে গিয়াছেন প্রত্যেকবারই কন্যাকুমারী দর্শন করিয়াছেন। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তস্থ অঞ্চলে যখনই যাইতেন তখনই তিনি কন্যাকুমারী দর্শন করিতেন। তথায় তিনি জগজ্জননীকে পূজা দিয়া এবং দুই একদিন বিশ্রাম করিয়া ফিরিতেন এবং ত্রিবান্দ্রম দিয়া তিরুভেল্লা যাইতেন। ত্রিবাঙ্কুরে যে সকল স্থান হইতে তিনি আমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন তন্মধ্যে তিরুভেল্লা তৃতীয়। পথে তিনি বার্কেলেতে নামিলেন। ইহা স্বাস্থ্যকর তীর্থস্থান, এবং উত্তর ভারতে জনার্দন নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত স্থানে শ্রীনারায়ণ গুরুর শিষ্যবৃন্দের পক্ষ হইতে সুকবি কুমারণ আসান কর্তৃক সংস্কৃত পদ্যে লিখিত এক স্বাগত অভিনন্দন পত্র তাঁহাকে দেওয়া হয়। তথা হইতে তিনি হরিপাদে উপস্থিত হন। তথায় তিরুভেল্লার ভক্তগণ আসিয়া তাঁহাকে একটী সুন্দর সুসজ্জিত নৌকায় লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে তিরুভেল্লায় উপস্থিত হন। স্থানীয় জনগণের অনুরোধে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর তিনি তথায় শ্রীরামকৃষ্ণ

মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় এম জি এম স্কুল হলে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের যে বার্ষিক অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি পৌরোহিত্য করেন। তৎকর্তৃক প্রদত্ত চমৎকার অভিভাষণান্তে তিনি সহরে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত কথোপকথন করেন। তথায় তিনি জেলা মুন্সেফ এম আর. নারায়ণ পিলে মহাশয়ের অতিথি ছিলেন। হরিপাদে প্রথম আগমন কাল হইতে তিনি এই মুন্সেফর সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছিলেন। তথায় কিছু দিন থাকিয়া তিনি ত্রিবাঙ্কুর ত্যাগ করিলেন এবং ব্যাঙ্গালোরে ফিরিলেন।

চৌদ্দ

মালাবারে বেদান্তপ্রচার

সন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে স্বামী নির্মলানন্দ নীলগিরিস্থ উতকামণ্ড নামক পার্বত্য সহরে আমন্ত্রিত হন কাইতি বিবেকানন্দ সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পৌরোহিত্য করিবার জন্য। উতকামণ্ড মাদ্রাজ সরকারের গ্রীষ্মাবাস এবং সাত সহস্রাধিক ফুট উচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত শহর। এই সমুচ্চ সুবিস্তৃত পর্বত ইউকেলিপ্টাস ও সিংকোনা জঙ্গলে সমাবৃত থাকায় সর্বদা নীল দেখায় বলিয়া ইহার নাম নীলগিরি। স্বামীজি তথাকার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং যথাকালে যাইয়া ২৮শে এপ্রিল হইতে ১লা মে পর্যন্ত কয়েকদিন বক্তৃতা দিলেন। তৎকর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতাদ্বয়ের বিষয় ছিল, 'তরুণ ভারতে আদর্শরূপে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন' এবং 'বেদান্ত অধ্যয়নের কারণাবলী।' শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাকে যে সকল প্রশ্ন করিতেন সেইগুলির যথাযথ উত্তর দেওয়া হইল তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার সপ্তদশ বর্ষে ১২০ পৃষ্ঠায় এই উৎসবের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে উহাতে আছে, শ্রোতাদের প্রশ্নগুলির যে উত্তর স্বামী নির্মলানন্দ দিলেন তৎসমুদয় সুস্পষ্ট, নির্দিষ্ট এবং অতিশয় শিক্ষাপ্রদ। অবশেষে দর্শন জগতে রামকৃষ্ণ মিশন যে স্থান পাইয়াছে তাহা তিনি ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার অবস্থানের শেষ দিনে তিনি বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজা তখন গ্রীষ্মাবাসের জন্য নির্দিষ্ট ফার্নহিলস্থ রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। মধ্য ভারতের কোন স্থানে কয়েক বৎসর পূর্বে গাইকোয়াড় তাঁহার সহিত দেখা

করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা তখন পূর্ণ হয় নাই। সেইজন্য স্বামীজি ভাবিলেন, যদি গাইকোয়াড় এখন ইচ্ছা করেন আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারি। তিনি গাইকোয়াড়কে পত্র দিলেন এবং তাঁহার উত্তর পাইয়া স্থানীয় প্রাসাদে তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। গাইকোয়াড় তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে বিবিধ বিষয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা কথা বলিলেন এবং তাঁহার রাজ্যে মিশনের সেবাকেন্দ্র স্থাপিত হইলে আবশ্যকীয় অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এইবার উতকামণ্ড গমন বিশেষভাবে ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়াছিল। কারণ, পথিমধ্যে পারাপানানগদির উকিল ও রামকৃষ্ণভক্ত শ্রীকুন্হীরমণ মেননের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইনি মালাবারে এবং ওট্টাপালমে স্বামীজিকে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। উক্ত সাক্ষাতের ফল কিরূপ সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল তাহা শ্রীকুন্হীরমণের ভাষায় বিবৃত হইল :

"১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। মেট্টুপালয়ম্ রেলওয়ে ষ্টেশনে এক মনোরম প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তাঁহার শুভ দর্শন পাই। আমি তখন শ্রীরামকৃষ্ণের এক সাক্ষাৎ শিষ্যের সহিত কোথাও না কোথাও সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলাম। ষ্টেশনের লাগেজকেরাণীকে এক অসাধারণ শক্তিশালী কণ্ঠস্বর ডাকিতেছিল। এইরূপ সবল, সতেজ কণ্ঠস্বর পূর্বে আমি শুনি নাই। এইরূপ কণ্ঠস্বর আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিল এবং আমি পেছন ফিরিয়া দেখিলাম পঁয়তাল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বয়স্ক এক মালয়ালী সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পুরুষত্বে অত্যধিক উদ্যম দেদীপ্যমান। তাঁহার দীর্ঘকায় আকৃতিতে যোদ্ধভাব প্রকটিত এবং তাঁহার ইংরাজী কথায় পাণ্ডিত্য প্রকাশিত। আমি অবাক হইয়া ভাবিতেছিলাম, এই অদ্ভুত ব্যক্তি কে? তাঁহার সঙ্গে যে দুই জন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক মালয়ালী ভদ্রলোক ছিলেন তাঁহাদিগকে ইঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। উক্ত দুই তরুণ সহযাত্রীর মধ্যে একজন ভক্ত নীলকণ্ঠ ওরফে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। তিনি আমাকে জানাইলেন, "ইনি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য, বাঙ্গালী সন্ন্যাসী স্বামী নির্মলানন্দ। ইনি উটিতে বিবেকানন্দ সমিতির বার্ষিক উৎসবে পৌরোহিত্য করিতে যাইতেছেন।" আমি স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় উটি সহরের

এক মাইল অন্য দিকে ফার্নহিলে এক বন্ধুর সহিত কয়েক দিন থাকিবার জন্য যাইতেছিলাম।"

"ফার্নহিলে পৌছিয়া আমি সত্বর আহার শেষ করিলাম এবং সুন্দর উপত্যকার এক পার্শ্বে যে কুটীরে বিবেকানন্দ সমিতির সভ্যগণ স্বামীজির সাময়িক অবস্থানের আয়োজন করিয়াছেন তাহার অভিমুখে চলিলাম। আমি দেখিলাম, তিনি একাকী কুটীর দ্বারে উলের চাদরে গাত্র ঢাকিয়া এবং তামাকের পাইপ মুখে লইয়া দণ্ডায়মান। আমরা পরস্পরকে অভিবাদন করার পরে আমি তাঁহাকে আত্মপরিচয় দিলাম। আমি যখন খুব নিকটে যাইয়া স্বামীজিকে দেখিলাম, তখন বুঝিলাম তাঁহার সুদৃপ্ত কণ্ঠস্বরের পরেই উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ চক্ষুর্দ্বয় ছিল তাঁহার দর্শনীয় দৈহিক বৈশিষ্ট্য। আমার মনে হইল যে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মানবীয় বহিরাকৃতি ভেদ করিয়া অন্তঃস্তল পর্যন্ত দেখিতেছে। আমি আরও লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার শরীর পেশীপুষ্ট ও শক্তিসম্পন্ন। এইরূপে তাঁহার স্বর, চক্ষু ও দেহ দিয়া শক্তি সদা বিকীর্ণ হইতেছিল। দেখিয়া বুঝিলাম, এই দেহের মধ্যে এক সর্বজ্ঞ ও সংশুদ্ধ মন বিরাজমান। সবলতাই ধর্ম, সবলতাই জীবন, এবং সবলতাই সদ্‌গুণ—স্বামী বিবেকানন্দের এই শিক্ষা আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তখন তাঁহার দেহ কুস্তীগিরের মত স্বাস্থ্যবান্ ও বলশালী ছিল। আমি ভাবিলাম, তাঁহার সুবিখ্যাত গুরুভ্রাতা কর্তৃক প্রচারিত বজ্রবাণীর তিনি পূর্ণাঙ্গ প্রতিমূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীও কি মূলতঃ শক্তি-বাণী নহে? স্বামীজিকে দেখিলেই সর্বদা আমার মনে উক্ত বাণী জাগ্রত হইত। বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতাগণ প্রত্যেকেই বিবেকানন্দবৎ মহাপুরুষ ছিলেন।

"প্রাথমিক কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি আমাকে বলিলেন যে, ব্রিটিশ মালাবারে তিনি কোথাও যান নাই এবং তথায় তাঁহার কোন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি নাই। আমি উত্তর মালাবারে বাদাগার নামক স্থানে ওকালতি করিতেছিলাম এবং তথায় যাইবার জন্য তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আমন্ত্রণ করিলাম। তিনি তন্মুহূর্তে আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "ত্রিবাঙ্কুর যাইবার বা আসিবার পথে এই বৎসর সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে আমি বাদাগারে যাইব।" অত্যল্প বিরামান্তে তিনি আমাকে বলিলেন, তিনি অনুভব করিতেছেন যেন মালাবারের যে অংশে আমি থাকি, তথায় কিছু কাজ হবে—এই কথা শ্রীগুরুমহারাজ তাঁহাকে

বলিতেছেন। এই উক্তি শুনিবার পর আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, ঠাকুরের ভাব প্রচারের জন্য তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আমি সর্বদা প্রস্তুত আছি। যখন আমি বিদায় লইতেছিলাম, তখন স্বামীজি আমাকে বলিলেন, "আমি যে সভায় পৌরোহিত্য করব তাহা কাল হবে। যদি আপনি যথাসময়ে এই কুটীরে কাল আসেন, আমরা সকলে এক গাড়ীতে সভায় যাব।" উক্ত প্রস্তাবে আমি সম্মত হইয়া পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে তথায় আসিলাম। যে গাড়ী স্বামীজির জন্য আনা হইয়াছিল তাহাতে মাত্র চারিজনের আসন ছিল; অথচ আমরা ছয় জন সভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত। আমি হাঁটিয়া যাইতে চাহিলাম; কিন্তু তিনি তাহা করিতে দিলেন না। আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি আমাকে টানিয়া লইয়া তাঁহার কোলে বসাইলেন। আমরা এইরূপে ছয়জন ঠেলাঠেলি করিয়া সেই ছোট গাড়ীতে বসিলাম এবং তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সভায় গেলাম। স্বামীজি গাড়ীতে অত্যন্ত প্রফুল্ল ও সহাস্যবদনে ছিলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের এক সাক্ষাৎ শিষ্যের স্নেহলাভে আমি ধন্য হইলাম।

"সভায় শ্রোতার ভিড় হইয়াছিল। স্বামীজি 'তরুণ ভারতের আদর্শরূপে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী' সম্বন্ধে দ্রুতবেগে একটি জোরালো বক্তৃতা দিলেন। আরও দুই দিন উটিতে থাকিয়া আমরা একত্রে পাহাড় ছাড়িয়া তৃতীয় দিবসে ট্রেণে উঠিলাম। উটিতে দীর্ঘতর অবস্থানের আকাংক্ষা আমার হৃদয়ে থাকিলেও স্বামীজির পূত সঙ্গে পাহাড় হইতে নামিবার দুর্লভ সুযোগ আমি ছাড়িলাম না। ফার্ণহিল ত্যাগের পূর্বে আমার বন্ধু ও আত্মীয় (যিনি ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন) পথে স্বামীজিকে দিবার জন্য চিনিমিশ্রিত গরম দুধ এবং কিছু ফল দিয়াছিলেন। ইহা ছিল বিলাতী গাভীর দুগ্ধ। গরম স্থান মেট্টুপালয়মে স্বামীজি তৃষ্ণার্ত হইলেন এবং এক কাপ কফি খাইতে চাহিলেন। কিন্তু ষ্টেশনে দোকান বা ফেরিওয়ালা হইতে কফি আনার সময় ছিল না। স্বামীজিকে দুগ্ধ দানের এই প্রকৃত সময় বুঝিয়া আমি দুগ্ধ পাত্রটী তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলাম, "স্বামীজি কফি খাবেন কেন? আমার সঙ্গে প্রচুর গরম করা মিষ্টি দুধ আছে। আমার বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, ইহা ভাল বিলাতী গাভীর দুধ এবং বিশেষভাবে আপনার জন্য আনীত।" এই বলিয়া আমি তাঁহাকে এক কাপ দুধ দিতে যাইতেছি, এমন সময় তিনি আমার প্রতি এরূপ অসন্তোষ ও অসম্মতির চাহনি চাহিলেন, যাহা আমি সারা জীবন ভুলি নাই। 'বিলাতী গাভীর দুগ্ধ' এই

কথাটি একটু জোর দিয়া বলায় তিনি স্পষ্টতঃ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমি অনুভব করিলাম যে, তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত গুরুভাই স্বামী বিবেকানন্দের মত তিনিও প্রথমত একজন খাঁটি ভারত-প্রেমিক এবং দ্বিতীয়ত জন-সেবাব্রতী। একটি কথাও না বলিয়া স্বামীজি নরম হইয়া জানাইলেন, "দেখুন, আমি শুধু দুধ খাই না। যখন আমি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত বোধ করি, এক কাপ ভাল কফিতে আমার ক্লান্তি দূর হয়।" পোদানুরে আমি ট্রেণ হইতে নামিয়া এক কাপ কফি আনিয়া তাঁহাকে দিলাম। অনন্তর আমরা তাঁহাকে প্রণামপূর্বক বিদায় লইলাম। ত্রিবাঙ্কুরের বন্ধুদ্বয় শ্রীনারায়ণ পিলে এবং ভক্ত নীলকণ্ঠও আমার সঙ্গে নামিলেন। তিনি আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করিলেন এবং মাঝে মাঝে আমাকে পত্র লিখিতে বলিলেন। আমি বাদাগারে ফিরিয়া আমার বন্ধুগণকে বলিলাম, "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এক সাক্ষাৎ শিষ্য, একজন প্রকৃত সন্ন্যাসী, কয়েক মাসের মধ্যে বাদাগারে পদার্পণ করিবেন।" তাঁহার আগমন সংবাদে তাঁহারা সকলে অসীম উৎসাহ দেখাইলেন। আমি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী প্রচার দ্বারা এই বিষয়ে পূর্বে কিছু কাজ করিয়াছিলাম। উক্ত স্থানের ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেকেই ইহাতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং বিশেষতঃ সাবরেজিষ্ট্রার শ্রীকরুণাকর মেনন আমার কাছে আসিয়া স্বামীজির সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ লইলেন। তাঁহাদের সহযোগিতায় অনায়াসে স্থিরীকৃত হইল যে, স্বামীজির আগমনে বাদাগার জনসাধারণের পক্ষ হইতে সভাদির আয়োজন করা হইবে। স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির নাম দিয়া স্বামীজিকে আমন্ত্রণ করা হইল। তিনি উত্তর দিলেন, ত্রিবাঙ্কুর হইতে ফিরিবার পথে তিনি বাদাগারে থামিবেন এবং ত্রিবাঙ্কুরে পৌঁছিবার কয়েক দিন পরে বাদাগারে যাইবার তারিখ ও সময় জানাইবেন।"

মালাবারে ধর্মের নামে অনেক অনাচার ও অত্যাচার চলিতেছিল। বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন ব্যক্তি—পুরুষ ও নারী, সাক্ষাতে বা ডাকে আজগুবি প্রচার করিয়া অর্থোপার্জন করিতেছিল। ভারতের সর্বত্রই এই ব্যাপার চলিলেও মালাবারে ইহার আধিক্য লক্ষিত হয়। যাদুবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ভণ্ডামি ও অনৈতিক আচরণ পর্যন্ত ধর্মের বেশ পরিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণকেও প্রতারিত করিত। এই সকল তথাকথিত ধর্ম-শিক্ষক মানুষের ধর্ম-পিপাসা মিটাইতে পারে না এবং মানুষের দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া শান্তি দিতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক উপলব্ধ

এবং স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত নব বেদান্ত মানুষের ধর্মক্ষুধা চিরতরে মিটাইতে সমর্থ। ইহা যেমন অন্যান্য প্রদেশে সত্য তেমনি আচার্য শংকরের জন্মভূমি মালাবারেও সত্য। মালাবারে বিশেষভাবে শিব, বিষ্ণু, শক্তি, স্কন্দ, গণেশ ও পরব্রহ্ম পূজিত হন। তথায় ঈশ্বরের সাকার নিরাকার, সগুণ নির্গুণভাব গৃহীত হয় এবং একই পরিবারের নরনারীগণ নানাবিধ ইষ্টদেব আরাধনা করিতে পারে। তাহারা পরস্পরের ধর্মবিশ্বাস ও ইষ্টমূর্তিকে শ্রদ্ধা করে। কেরলের অধিবাসিগণ বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণকে সমাদরে স্থান দিয়া তাহাদের দেবমন্দির নির্মাণে সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের সুযোগ্য বার্তাবহের আগমন অতিশয় বাঞ্ছনীয়।

"নির্দিষ্ট দিবসে স্বামী নির্মলানন্দ ট্রেণে করিয়া একাকী আসিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং মহতী জনতা রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইয়া তাঁহাকে সাদর সংবর্ধনা করিলেন। তাঁহার গলায় তাঁহারা পুষ্পমাল্য দিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া গীতবাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া স্থানীয় থিয়োজফিক্যাল হলে উপনীত হইলেন এবং তথায় তাঁহাকে একটি অভিনন্দনপত্র দিলেন। স্বামীজি ইহার উত্তরে একটি সংক্ষিপ্ত, অথচ সারগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। বাদাগার ইতঃপূর্বে এত বৃহৎ ও আন্তরিক অভ্যর্থনা কোন অভ্যাগত ব্যক্তিকে দেয় নাই। নিকটবর্তী স্থানের নেতৃবৃন্দ ব্যতীত তেলিচেরী, কুইল্যাণ্ডি, কালিকট এবং অন্যান্য স্থান হইতে প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দলে দলে আসিয়া স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিলেন। ইহাতে যে ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হইল তাহাতে সংপ্রীত হইয়া স্বামীজি বলিলেন, "ভগবানের নামে আনন্দ প্রকাশ ইহা দ্বারা সম্যক সূচিত।" স্বামীজির রেলওয়ে কম্পার্টমেণ্টে এক সহযাত্রী ছিলেন, যিনি বিশিষ্ট নাগরিক এবং কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রভাবসম্পন্ন সভ্য। স্বামীজির আগমনে তাঁহার মুখমণ্ডলে অন্তরের বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল! স্বামীজি ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং পরিচয় জানিয়া লইলেন। তিনি যখন জানিলেন সেই ব্যক্তি কে, কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথায় যাইতেছেন, তখন তিনি মাথা নাড়িয়া হাসিলেন এবং অব্যক্ত ভাষায় প্রকাশ করিলেন, সেই ব্যক্তির ভয়ের কারণ কি। পরদিন তথায় এক প্রশ্নোত্তর সভা হইল, তাহাতে পূর্ব সন্ধ্যা অপেক্ষা শ্রোতার সমাগম অনেক বেশী দেখা গেল। উহাতে বহু ও বিবিধ প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, রামকৃষ্ণ আন্দোলনের উদ্দেশ্য, কর্মপ্রণালী,

অন্যান্য ধর্মের প্রতি মনোভাব কিরূপ। অন্যান্য ধর্মসংঘের সন্দিগ্ধ ব্যবসায়ী কর্মপদ্ধতি সমালোচনা করিবার জন্য তাঁহাকে প্রশ্নবাণ দ্বারা প্ররোচিত করা হইল। সেই সকল ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরে তিনি সংযত ও সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন অথচ ধর্ম-বিষয়ের সুব্যাখ্যাদানে কুণ্ঠিত হইলেন না। পূরা চারঘণ্টা ধরিয়া প্রশ্নোত্তর চলিল। প্রথম দোভাষী কোন্নান গোডে গোপান্নায়ার ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীকুন্হীরমণ মেনন তাঁহার স্থান লইলেন। রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে শ্রোতাদের জ্ঞাতব্য বেশী কিছু বাকী রহিল না। তাঁহারা বুঝিলেন, এই আন্দোলন আধুনিক হইলেও হিন্দুজগতের সর্বাগ্রণী। বিভিন্ন প্রকৃতির দুই ব্যক্তি স্বামীজিকে প্রথমবার দেখিলেন এবং বাদাগারে তাঁহার সহিত অল্পক্ষণ কথা বলিলেন। তাঁহাদের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে বোঝা যায়, সাধারণ ও সাদাসিধে স্বামীজিকে প্রথম দর্শনে অনেকের মনে কি সুন্দর ছাপ পড়িয়াছিল। ইহা হইতে আরও জানা যায় কেরলে এমন অনেক লোক ছিলেন যাঁহারা স্বামীজির মধ্যে যে মহত্ত্ব নম্রতা সহকারে সুগুপ্ত ছিল তাহা মুহূর্ত মধ্যে অবগত হন। একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্যার, 'স্বামীজিকে রেলওয়ে ষ্টেশনে পাঁচ মিনিট মাত্র দেখিয়া মন্তব্য করেন, 'স্বামীজির আধ্যাত্মিকতা বিচার করিতে আমি অসমর্থ হইলেও আমার মনে হয়, তিনি একজন অসাধারণ সামর্থ্যসম্পন্ন মহাপুরুষ। যদি ভারতের ভাইসরয় পদত্যাগ করেন এবং তাঁহাকে ঐ স্থান লইতে বলা হয় তিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষণমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তৎপদ গ্রহণ করিতে পারেন।' অন্য একজন রাজযোগী কুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন, 'স্বামীজি একজন মহাযোগী, কিন্তু গুপ্ত যোগী। রাজযোগীর প্রত্যেক লক্ষণ তাঁহাতে প্রকটিত।"

পরদিন প্রাতে স্বামীজি তেলিচেরীর বিখ্যাত উকিল শ্রীকান্নান নাম্বিয়ারের আমন্ত্রণে তথায় গমন করেন। উক্ত স্থানে যে প্রশ্নোত্তর সভা আহূত হয় তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহাকে অনেক জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। স্বামীজি এই সকল প্রশ্নের অতিশয় সন্তোষজনক উত্তর দিয়াছিলেন। পরদিন কান্নানগোডের দেওয়ান বাহাদুর শ্রীরাজাগোপালন তাম্পানের পত্র লইয়া এক বার্তাবহ কালিকট হইতে আসেন। পরবর্তীকালে উল্লিখিত দেওয়ান বাহাদুর কালিকটের জেলা পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টপদ প্রাপ্ত হন এবং কালিকট যাইতে স্বামীজিকে অনুরোধ জানান। দেওয়ান বাহাদুরের পিতা স্বামী

বিবেকানন্দকে পরিব্রাজক অবস্থায় শোরানুর নামক স্থানে প্রথম ভিক্ষা দেন। স্বামী নির্মলানন্দ দেওয়ান বাহাদুরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

তেলিচেরী হইতে স্বামীজি যেদিন প্রস্থান করিলেন তৎপূর্বদিন এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক তিয়া তরুণ কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল। শেষ মুহূর্তে সে স্বামীজির আশীষ ভিক্ষা করিল। অনুরোধের যথার্থতায় স্বামীজি বিচলিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ আনীত যানে তথায় গমন করিলেন। রোগীর গৃহ নিকটবর্তী হইলে স্বামীজি শ্রীকুন্হীরমণ মেননকে তাঁহার সঙ্গে না যাইবার জন্য সতর্ক করিয়া দিলেন; কারণ উক্ত ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য ও সংক্রামক। স্বামীজি একাকী রোগীর কাছে গেলেন এবং আশীষ প্রদানান্তে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমেননকে বলিলেন, "অতি গরীব যুবক, আমি তাকে আশীর্বাদ করিলাম। তাকে স্পর্শ করবার জন্য সে জিদ করল। তোমাকে যেতে নিষেধ করে আমি ভাল করেছি। বস্তুতঃ এই ব্যাধি দুরারোগ্য, ঈশ্বর তার আত্মাকে শান্তি দিন।" পরদিন স্বামীজি কালিকটে গেলেন। শ্রীতাম্পানের আগ্রহ ও অনুরোধ এই ছিল যে, স্বামীজি কান্নানগোডেতে তাঁহার অট্টালিকায় যাইতে সম্মত হইবেন; কারণ তথায় তাঁহার বৃদ্ধা মাতা স্বামী বিবেকানন্দের এক গুরুভ্রাতাকে দর্শন করিবার জন্য আকাংক্ষিতা। স্বামীজি কৃপাপূর্বক তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। শ্রীতাম্পানের এক স্বজন তখন তাঁহার সহিত বাস করিতেছিলেন। তিনি স্বামীজির ব্যক্তিত্বে এত বিমুগ্ধ হন যে, কয়েক বৎসর পরে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন এবং পরবর্তী কালে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক স্বামী শ্রীকণ্ঠানন্দ নামে পরিচিত হন। স্বামী শ্রীকণ্ঠানন্দই ব্রিটিশ মালাবারে স্বামী নির্মলানন্দের প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য। অপরাহ্নে যখন স্বামীজি তাঁহার তামাকের পাইপ টানিতেছিলেন তখন তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "এখনই আমাকে বাইরে যেতে হবে। কেহ এখানে এসে আমার সঙ্গে গেলে ভাল হয়।" কয়েক মিনিট পরে শ্রীনারায়ণ গুরুর এক ভক্ত এবং তিয়াজাতির ধনী নেতা শ্রীরারিচান মুপান আসিয়া তাঁহাদের মন্দিরে যাইবার জন্য স্বামীজিকে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজি সম্মত হইয়া মন্দির দর্শন করিতে গেলেন। তিনি মন্দিরে যাইয়া তথায় প্রচলিত পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি যাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে পরে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ ভাবে বলিতেন। কালিকট হইতে তিনি

কান্নানগোডে যাইয়া দুইদিন শ্রীতাম্পানের অতিথিরূপে বাস করেন। স্বামীজি তাঁহার বাদাগারস্থ বন্ধুবর্গকে ব্যাঙ্গালোর যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। বড়দিনের ছুটিতে শ্রীমেনন অন্য তিন বন্ধু সহ ব্যাঙ্গালোরে গমন করেন। শ্রীরাজাগোপাল নাইডু নামক এক তরুণ ভক্ত রেলওয়ে ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রমে লইয়া যান। স্বামীজি পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে আশ্রমে রাখিয়া সর্বপ্রকারে তাঁহাদের সন্তোষবিধানে তৎপর হন। তখন শীতকাল এবং অতিথিত্রয়ের আবশ্যকীয় গরম কাপড় ছিল না। স্বামীজি প্রত্যেককে এক একটি উলের বেনিয়ান দেন, যাহা তাঁহারা বহু বর্ষ ব্যবহার করিয়াছিলেন। শ্রীমেনন বলেন, স্বামীজির আতিথেয়তা, প্রেমানন্দ ও আন্তরিকতা অসাধারণ ও প্রাণস্পর্শী। অতিথিত্রয় চারদিন আশ্রমে থাকিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। মেননের বন্ধুদ্বয় মালাবারে গেলেন এবং মেনন নির্মলানন্দজীর আশীর্বাদ মস্তকে লইয়া শ্রীসারদা দেবী ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতিকে দর্শন করিবার জন্য কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পনের

হরিপাদে আশ্রম প্রতিষ্ঠা

ইতোমধ্যে হরিপাদের ভক্তবৃন্দ ও জনসাধারণ শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রম স্থাপনার্থ উদ্‌গ্রীব হইলেন। তাঁহারা কাল বিলম্ব না করিয়া প্রয়োজনীয় আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর স্বামী নির্মলানন্দ তথায় তৃতীয়বার গমন করিয়া আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ব্রহ্মচারী ভেঙ্কট সুব্রহ্মণ্য আয়ার (পরে স্বামী চিৎসুখানন্দ) আশ্রমের জন্য একখণ্ড জমি দান করেন। রামকৃষ্ণ-সমিতির সহকারী সভাপতি এবং উকিল শ্রীসুব্বারায় আইয়ার গৃহনির্মাণের জন্য এক হাজার টাকা দেন। স্বামীজি যখন প্রথমবার হরিপাদে আসেন তখন এই অর্থ তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয়; কিন্তু তিনি তাহা হরিপাদে ব্যয় করিতে নির্দেশ দেন। অন্যান্য ভক্তের অর্থ সাহায্যে এবং সমিতির সভাপতি শ্রীপদ্মনাভ তাম্পী, ওরফে স্বামী পরানন্দ, মহোদয়ের অক্লান্ত

পরিশ্রমে গৃহনির্মাণ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। ঠিক তখনই শ্রীপদ্মনাভ, যিনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, দূর স্থানে বদলি হইয়া যাইবার নির্দেশ পাইলেন। উক্ত নায়কের অনুপস্থিতিতে আরব্ধ কার্য অত্যন্ত ব্যাহত হওয়ার আশংকা ছিল। এই সংবাদে ভক্তগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। স্বামী নির্মলানন্দ তখন তথায় ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট এই বিপদের কথা জানাইলেন। সেই রাত্রে স্বামী নির্মলানন্দ স্বপ্ন দেখিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে এই বিষয়ে চিন্তিত হইতে নিষেধ করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতাকে বলিলেন, ইহা ঠাকুরের কাজ এবং কোন বাধা বা বিলম্ব ব্যতীতই ইহা সম্পন্ন হইবে। পরদিন প্রাতে নির্মলানন্দজী তাঁহার স্বপ্ন বিবৃত করিয়া ভক্তগণকে অসীম উৎসাহ দিলেন। ইহার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শ্রীপদ্মনাভ আর এক নির্দেশ পাইলেন যে, তাঁহার বদলি বাতিল হইল। অনন্তর দ্বিগুণিত উদ্যমে তাঁহারা কাজ চালাইতে লাগিলেন এবং পূর্বনির্দিষ্ট ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে দিবসে দ্বারোদ্‌ঘাটনের জন্য আশ্রম গৃহ প্রস্তুত হইল। স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে লইয়া স্বামী নির্মলানন্দ ২৭শে এপ্রিল উৎসবের আয়োজন তত্ত্বাবধানার্থ তথায় গেলেন। ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবারের দূর দূর স্থানসমূহ হইতে শত শত ভক্ত আসিয়া এই উৎসবে যোগ দিলেন। নির্দিষ্ট উৎসব দিবসে সকাল ছয়টায় যজুর্বেদোক্ত রুদ্রাধ্যায়, চণ্ডী ও গীতা পাঠ আরম্ভ হইল। বৈদিক অনুষ্ঠান, ভজন, শোভাযাত্রা প্রভৃতি উৎসবের সকল অঙ্গ যথাযথভাবে কার্যে পরিণত হইল। সকলে ইহাতে বিশেষ উৎসাহসহকারে যোগদান করিলেন। কেরল প্রদেশে হরিপাদে প্রথম রামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হইল। ইহার দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন স্বামী নির্মলানন্দ। ইহা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা সমগ্র কেরলে প্রচারিত হয়।

হরিপাদে আশ্রম স্থাপিত হইলে স্বামী নির্মলানন্দ নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন। তিনি মনে করিতেন, আশ্রম ঈশ্বরের বাসগৃহ। সেই জন্য তথায় কোন সামাজিক অত্যাচার প্রশ্রয় পাইত না এবং আশ্রমে সমপ্রীতি ও সমদৃষ্টি বিরাজ করিত। কেরলের অস্পৃশ্যতা ও অদৃশ্যতাকে স্বামী বিবেকানন্দ কেবল পাগলের কার্য বলিয়া উপহাস করিতেন। এই আশ্রম স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত উল্লিখিত অত্যাচার ঈশ্বরনিবাস দেবমন্দিরে ঈশ্বর সম্মুখেই প্রবলভাবে আচরিত হইত। অস্তু স্বামী নির্মলানন্দ জাতিবর্ণনির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর হিন্দুকে আশ্রমে আগমন এবং

ভগবানের আরাধনা করিতে অনুমতি দিলেন। বদ্ধমূল দীর্ঘস্থায়ী কুসংস্কার-ভূজঙ্গম উহার কুৎসিৎ ফণা তুলিল এবং প্রতিবাদ করিল যে, এরূপ করিলে বহু ভক্ত আশ্রমে আসিবে না এবং সাহায্য দিবে না। সিংহনাদে বেদান্ত কেশরী নির্মলানন্দ সুতীক্ষ্ণ জবাব দিলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই আমাকে বর্জন করিতে পার ; কিন্তু আমি আমার আদর্শকে অবনত করিব না। যদি তোমরা আমাকে অনাহারে রাখ, আমি নিশ্চিত জানি, শ্রীগুরুমহারাজ স্বয়ং আসিয়া আমাকে খাওয়াইবেন।" ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরশীল সন্ন্যাসীর পক্ষে এই উক্তিই শোভনীয়। ইহাতে সকলে মাথা নত করিলেন এবং তাঁহাদের মজ্জাগত গোঁড়ামি ছাড়িলেন ; কিন্তু স্বামীজির প্রস্থানের পর আশ্রমের অধিবাসী ও কর্মীগণকে পূর্বাচরিত অমানবতার কবলে আবার পড়িতে হইল। এমন কি, নাপিতেরা এবং ধোপারাও তাঁহাদের সহিত অসহযোগিতা করিল। স্বজাতির লোকগণ প্রায়ই আশ্রমের ব্রহ্মচারীগণকে পাথর ছুড়িয়া মারিত। এই সকল অমানুষিক অত্যাচার সত্বেও আশ্রমবাসিগণ অচল অটল রহিলেন। তখনও ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার নির্মূল হইল না। বিষবৃক্ষের শেষ শিকড় বাঁচিয়া রহিল এবং পরবর্তী মহোৎসবে পূর্ণরূপে মাথা তুলিল। উৎসব উপলক্ষে প্রসাদ গ্রহণার্থে খুব ভিড় হইয়াছে। কেরল প্রদেশে প্রথমবার উচ্চনীচবর্ণের ভেদ ভুলিয়া সকলেই একত্রে বসিয়া প্রসাদ খাইলেন। প্রথম পংক্তির খাওয়া শেষ হইল। যখন তাহারা উঠিয়া গেল, যাহারা উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি তুলিয়া ফেলিতে ও প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত ছিল, তাহারা উক্ত কার্য করিতে অস্বীকার করিল এবং বলিল যে, নিম্নবর্ণের লোকেরা এই স্থান অশুদ্ধ করিয়াছে। স্বামী নির্মলানন্দ সর্বদা সতর্ক থাকিয়া সর্ব বিষয়ে নজর দিতেছিলেন। তিনি এই প্রতিকূল পরিস্থিতির সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, "তাহারা সকলে ভগবানের ভক্ত এবং আমি তাহাদের ভৃত্য। আমার কোন জাতি নাই ; কিন্তু তোমরা তোমাদের জাতিভেদ রক্ষা কর।" এই বলিয়া তিনি পরমানন্দে উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি তুলিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলেন। সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ ভাবেন নাই যে, স্বামীজি এই কার্যে অগ্রসর হইবেন। স্বামীজি দুই চারিটি পাতা তুলিতে না তুলিতেই সকলে এই কার্য করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরবর্তী পংক্তি বসিবার জন্য সেই স্থান পরিষ্কৃত ও প্রস্তুত হইল। হরিপাদে ব্রাহ্মণ্য সংকীর্ণতার সুদৃঢ় দুর্গ ছিল।

স্বামীজি যুগধর্মের হাইড্রোজেন বোমা ফেলিয়া ইহাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিলেন।

নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের প্রতি স্বামীজির সমবেদনা ও ভালবাসা তথাকথিত সংস্কারকদের ভাবপ্রবণতা নহে। তিনি তাহাদের বৃথা গর্ব ও দোষ ত্রুটি সহ্য করিতেন না। একদা ছুতার জাতির এক প্রতিনিধি স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা বিশ্বকর্মার বংশধর, তবে কেন আমরা এখন নিম্ন শ্রেণীরূপে গণ্য হই, স্বামীজি?" প্রত্যুৎপন্নমতি নির্মলানন্দজী উত্তর দিলেন, "এক বানর এরূপ এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রামভক্ত রাক্ষসনাশক মহাবীর হনুমানের বংশধর আমরাই। হনুমান নরলোকে পূজিত হন, কিন্তু আমরা অবহেলিত ও অবজ্ঞাত হই কেন?" তাহাকে বলা হইল "তোমরা নিজেরা হনুমানের মত হও তাহ'লে সকলের পূজা পাইবে। পূর্বপুরুষদের মহত্ত্ব লইয়া কেবল মিথ্যা গর্ব প্রকাশ করিলে আমরা বড় হইব না। যে সদ্‌গুণ বিশ্বকর্মাকে বড় করিয়াছিল তাহা অর্জন কর। তাহা হইলেই সমাজে তোমরা উচ্চাসন পাইবে।"

ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা দিবসে দরিদ্রনারায়ণদের ভোজন সমাপ্ত হইলে মধ্যাহ্নে স্বামীজি একটি চমৎকার প্রশ্নোত্তর সভা করিলেন। ঐদিন সন্ধ্যায় এক বিরাট ধর্ম-সভায় স্বামীজি একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। সমিতির সভাপতি শ্রীতাম্পি, পারাপানানগদির শ্রীকুন্হীরমণ মেনন, মুন্সেফ শ্রীনারায়ণ পিলে, ডাক্তার তাম্পি, শ্রীকৃষ্ণ পিলে প্রভৃতি বহু বক্তা সভায় বক্তৃতা দিলেন। স্বামীজি মেননকে সভামঞ্চে টানিয়া লইয়া বক্তৃতা দেওয়াইলেন। শ্রীমেনন জনসভায় এই প্রথম বক্তৃতা দিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতা খুব ফলপ্রদ হইয়াছিল। ইহা উল্লেখ করা উচিত যে, স্বামীজি সুদূর স্থান হইতে ভক্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া এই সব উৎসবে আনিতেন এবং ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের সুযোগ দিতেন। এইরূপে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে পরস্পর পরিচিত সুবৃহৎ ভক্ত-সংঘ গড়িয়া উঠিল। ভক্তদের মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে বিকশিত করিবার জন্য স্বামীজি সস্নেহে যত্ন করিতেন। শ্রীমেননকে বক্তৃতা প্রদানের সুযোগ দিয়া তিনি প্রকারান্তরে এই কার্যই করিলেন।

হরিপাদ হইতে স্বামীজি নিজদলসহ তেলিচেরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে মান্নার, মাবেলিকার এবং অন্যান্য স্থানে নামিলেন। তিরুভেল্লাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হওয়ায় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই মে তারিখে

তিনি উহাতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই কেরল প্রদেশের দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ আশ্রম। নূতন মন্দিরে কি ভাবে ঠাকুরের পূজা করিতে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি বলিলেন, "ঠাকুরের পূজায় কোন ক্রিয়াকলাপ প্রয়োজন নাই। ভাবের পূজায় তিনি সহজে প্রসন্ন হন। সাক্ষাৎ ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তুমি যেমন করিবে এই মন্দিরেও ঠিক তদ্রূপ আচরণ কর। মন্দিরে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব কর এবং তিনি জীবন্ত পুরুষ জানিয়া তাঁহার সেবা কর।" এক গোঁড়া ভক্ত মানস পূজা সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, "সমস্ত অন্তর দিয়া বল, 'হে প্রভু, জগতে যত ফুল ফুটিয়াছে সবগুলিই তুমি কৃপাপূর্বক গ্রহণ কর। পৃথিবীতে যত ফল ফলিয়াছে তৎসমুদয় তুমি নৈবেদ্যরূপে গ্রহণ কর। সুপক্ব ও সুস্বাদু আহার্য যেখানে যত প্রস্তুত হইয়াছে সেগুলি তোমার নিকট নিবেদিত হউক। তুমি দয়া করে আমার পূজা গ্রহণ কর।' ইহাই মানস পূজার মূল ভাব। ইহার সঙ্গে কিছু মানুষ পূজাও প্রয়োজন। কত লোকের অন্নবস্ত্র নাই। যথাসাধ্য তাহাদের অন্নবস্ত্র দান কর। অভাবীর অভাব মোচনে সর্বভূতস্থ ভগবান্ সুপ্রসন্ন হন। মানুষ পূজা ব্যতীত মানস পূজা ফলপ্রসূ হয় না।" ফিরিবার পথে তিনি তেলিচেরী, কালিকট এবং পারাপানানগদি পরিদর্শন করেন। তখন শ্রীকুন্হীরমণ মেনন পারাপানান-গদিতে ওকালতি করিতেছিলেন। তথায় নবভক্ত ও নববন্ধু স্বামীজির সহিত পরিচিত হইলেন। এই সময় পরম স্ত্রীভক্ত শ্রীমতী পারুপুটী আম্পা কালিকটে স্বামীজিকে প্রথম দর্শন করেন। উক্ত ভক্তিমতী মহিলা বর্তমানে ত্রিবান্দ্রম আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী তপস্যানন্দের ভাগ্যবতী গর্ভধারিণী।

ষোল

ওট্টাপালম্ স্মৃতি-তীর্থ

প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে স্বামী নির্মলানন্দ ব্যাঙ্গালোরে আসেন, তাঁহার সপ্রেম প্রযত্নে ব্যাঙ্গালোর আশ্রম যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত এবং জনসেবায় অগ্রসর হইয়াছিল। পূজনীয়া সংঘমাতার পদার্পণে ইহা তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে।

গৃহাদি নির্মাণ ও প্রাঙ্গণ প্রসার ও উদ্যান রচনা দ্বারা ইহার রমণীয়তা বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছে। ব্যাঙ্গালোর সহর বা মহীশূর রাজ্যের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া ইহার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত এবং ভারতের দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই রাজ্য এবং ইহার অধিবাসিবৃন্দ তাঁহাদের মধ্যে এই ধর্মস্থাপনের যথার্থ গৌরব বোধ করিতেছে। আশ্রম প্রাঙ্গণে দ্বিপঞ্চাশত্তম বিবেকানন্দ জন্মোৎসবে মহীশূরের যুবরাজ ও দেওয়ান যোগদান করিলেন। যুবরাজ উৎসব দর্শনে অতিশয় প্রীতিলাভ করেন এবং ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে এখন হইতে আগ্রহ দেখাইতে থাকেন। সমবেত জনগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বামী নির্মলানন্দের মহৎ কর্মের ভূয়সী প্রশংসা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এতদ্ব্যতীত আশ্রমের ব্যয় নির্বাহার্থ তিনি প্রতি বৎসর একশত টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

উক্ত বৎসর মার্চমাসে আশ্রমের শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সমাপনান্তে স্বামীজি ত্রিবাঙ্কুর অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ওট্টাপালমে তিনি যাত্রা ভঙ্গ করেন। ধন্য ওট্টাপালম্! তুমি বেদান্তকেশরী ব্রহ্মবিদ্বর মহাপুরুষ নির্মলানন্দের পুণ্যস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়াছ !! স্বামী নির্মলানন্দের শুভনামের সহিত তোমার নাম চিরতরে বিজড়িত !!! ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নির্মলানন্দ তোমার বক্ষঃস্থলে মহাপ্রয়াণ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই তথায় নির্মলানন্দ-স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওট্টাপালমে স্বামীজির প্রথম গমন সম্বন্ধে স্থানীয় উকিল শ্রীনারায়ণ নায়ার যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। স্বামীজি তথায় তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ কবেন। শ্রীনারায়ণ নায়ার লিখিয়াছেন, "যেদিন আমি স্বামীজির শ্রীচরণে প্রণত হই তাহা আমার জীবনে চিরস্মরণীয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্বক তিনি ওট্টাপালমে পদার্পণ করেন। আমরা এখানে একটি বেদান্ত-সমিতি স্থাপন করিয়াছিলাম এবং ইহার উদ্যোগে পূর্ব বৎসর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী সর্বানন্দ উক্ত উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক অতিশয় প্রশংসিত হয়। সে যাহা হউক, আমি শ্রীরাম-কৃষ্ণের এক সাক্ষাৎ শিষ্যের দর্শনলাভার্থ উদ্গ্রীব ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে অবিলম্বে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। আমার বন্ধু শ্রীকুন্হীরমণ মেনন

আমাকে জানাইলেন যে, স্বামীজি কর্ম উপলক্ষে ত্রিবাঙ্কুর যাইবার পথে ওট্টা-পালম্ অতিক্রম করিবেন। আমাদের এই ক্ষুদ্র স্থান এবং ইহার প্রশান্ত পরিবেশ ও মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য স্বামীজির উপযুক্ত বিশ্রামস্থানরূপে পরিগণিত হইতে পারে। সেইজন্য আমি সাহস করিয়া এখানে দুই এক দিন বিশ্রাম লইবার জন্য তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলাম। আমি নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণের নগণ্য ভক্তরূপে পরিচয় দিলাম এবং লিখিলাম, আমি স্থানীয় ভক্তবৃন্দসহ পরম সুখলাভ করিব, যদি আপনি ওট্টাপালমে নামিয়া দুইদিন বিশ্রাম করেন। স্বামীজি সদয় হইয়া আমার আমন্ত্রণ স্বীকারপূর্বক আমার আতিথ্য গ্রহণে সম্মত হন। কেরল প্রদেশের যত নরনারী সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলে আমার মত এক বাক্যে বলিবেন যে, স্বামীজি আমাদের নিকট ধর্মশিক্ষক, ধর্মপিতা, ধর্মরক্ষক ও ধর্মবন্ধুরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। যখন আমি তাঁহাকে প্রথম দেখিলাম, তিনি সামান্য সন্ন্যাসীরূপে প্রতীয়মান হইলেন। ঠিক অন্যান্য লোকের ন্যায় তিনি কথা বলিতেন, হাসিতেন ও ব্যবহার করিতেন। অল্পক্ষণ পরে আমি কিয়দ্দূর হইতে শুনিলাম, স্বামীজি কোন ভদ্রলোককে বলিতেছেন "ধর্মজীবন অস্বাভাবিক নহে; অপ্রাকৃতিক নহে।" বস্তুতঃ স্বামীজির মধ্যে কোন অলৌকিকতা বা অস্বাভাবিকতা ছিল না। কিন্তু তাঁহার সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র বিশ্বাস জন্মিত এবং তাঁহার চক্ষু-র্দ্বয় অন্তঃস্তল পর্যন্ত ভেদ করিত। তাঁহার কণ্ঠস্বর ও চক্ষুর্দ্বয় ব্যতীত স্বামীজিকে সাধারণ সন্ন্যাসী হইতে পৃথক করা সম্ভব হইত না। তাঁহার সতর্ক নয়নে যে অদ্ভুত আলোক প্রদীপ্ত হইত তাহা কোন সামান্য বিষয়কেও উদ্ভাসিত করিত। আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানীর চক্ষুর্দ্বয়বৎ সেইগুলি জ্বল্ জ্বল্ করিত। এইজন্যই ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে কম্পমান হইত। যেদিন স্বামীজি ওট্টাপালমে আসিলেন সেদিন আমরা বুঝিলাম, কিরূপে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি কপটতার ছদ্মবেশ ভেদ করিতে সমর্থ। স্বামীজিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য এক যুবক আসিয়া-ছিলেন। তিনি এত দ্রুত বেগে ধর্মবিষয়ে ভাষণ দিতে পারিতেন যে, তাহা শুনিয়া লোকে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে বাধ্য হইত। জনসাধারণ তাঁহার বক্তৃতাবলী শ্রবণে উৎকর্ণ হইতেন এবং ভাবিতেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। প্রথমবার স্বামীজি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করার পরক্ষণেই তিনি বিদায় লইলেন। তখন স্বামীজি বলিলেন, ঐ যুবক আমাকে আদৌ

আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি রামকৃষ্ণের এই উক্তি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন—যে জলবৎ তরল কথা বলে তাঁহার সম্বন্ধে সাবধান থাকিবে। বলা বাহুল্য যে, উক্ত ব্যক্তির পরবর্তী ব্যবহার স্বামীজির মন্তব্য প্রমাণিত করিল এবং জনসাধারণ তাহার আসল স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত দেখিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাহীন হইল।

আমাদের সকলের মনে হইত, স্বামীজি আজন্ম নায়ক। তাঁহাকে গম্ভীর-স্বভাব ও কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে দেখাইত; কিন্তু তাঁহার মধ্যে কণামাত্র বৃথা গর্ব ছিল না। যখন তাঁহার আগমনবার্তা ঘোষিত হইল তখন অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কে? আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, তিনি শ্রীরাম-কৃষ্ণের এক সাক্ষাৎ শিষ্য। এই স্থানের এক প্রসিদ্ধ উকিল তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং সংবর্ধনা করিয়া বলিলেন, "সবই আমি শুনিলাম। আপনি বিবেকানন্দের স্বব্রহ্মচারী।" তদ্দণ্ডেই উত্তর আসিল, "মহাশয়, আমি তাঁহার অনুরক্ত সেবক, তাঁহার দাসানুদাস।" সেই উকিল নির্বাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকাইলেন। অবশ্য আমি তাঁহাকে স্বামীজির কথার অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রতি তাঁহার এইরূপ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল।

"তাঁহার মত সাহসী সন্ন্যাসী আমি আর দেখি নাই। তিনি যাহা কঠিন বুঝিতেন তাহাই করিতেন এবং তৎসম্বন্ধে অন্যে কি বলিবে বা ভাবিবে তাহা বিবেচনার্থ এক মুহূর্তও অপেক্ষা করিতেন না। গৃহমেধী সংসারীগণ তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিতেন তৎসম্পর্কে স্বামীজির অসীম ঔদাসীন্য দেখিলে বোঝা যাইত, কি উপাদানে তাঁহার চরিত্র গঠিত। অনুচরবৃন্দের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য তিনি কাহারও খেয়াল বা হুকুমের বশবর্তী হইতেন না। স্থানীয় হাইস্কুলের এক ব্রাহ্মণ শিক্ষক, যিনি স্বীয় আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন এবং সন্ন্যাসীর সৎকার করিতে গর্ব অনুভব করিতেন, আসিয়া স্বামীজিকে তাঁহার বাড়ীতে ভিক্ষা লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, স্বামী সর্বানন্দ ওট্টাপালমে আসিয়া তাঁহার গৃহে অতিথি হন। ইহা শুনিবার পর স্বামীজির চক্ষে প্রফুল্ল পলক পড়িল। তিনি শুধু বলিলেন, "আমি অমুকের আতিথ্য স্বীকার করেছি। যখন তিনি অতিথি সৎকারে অসমর্থ হবেন তখন অন্য নিমন্ত্রণের কথা ভাবিব।" আমি তাঁহার ইঙ্গিত

বুঝিলাম এবং ভদ্রলোক দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু পরদিন আবার তিনি আসিলেন। গোঁড়ামি সম্বন্ধে কথা উঠিল। সেই ভদ্রলোক সে সম্বন্ধে কিছু বলিলেন এবং দোষ দর্শনপূর্বক মন্তব্য করিলেন, "আমার আমন্ত্রণ অস্বীকার করা আপনার উচিত হয় নাই। কারণ আপনার বর্তমান সৎকারক অপেক্ষা আমি উচ্চতর বর্ণভুক্ত।" স্বামীজি ভাবিলেন, ঐ ভদ্রলোককে কড়া জবাব দিবার ইহা সুবর্ণ সুযোগ। তিনি বলিলেন, "আমি জাতিভেদ মানি না। আমি মানি শুধু শ্রদ্ধা ও সাধুতা। যদি আপনার কথাই সত্য হয় তাহা হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেন ক্ষত্রিয় রাজন্য-বৃন্দের আমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া শূদ্র বিদুরের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন?" স্বামীজি এই আলোচনা উপসংহারপূর্বক বলিলেন, "প্রাচীন শাস্ত্র অনুসারে কোন ব্রাহ্মণ নিজের জন্য অন্নপাক করিবেন না, অন্য লোকে তাহার জন্য পাক করিবে। পুরাকালে ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রগণকে পাচকরূপে রাখিতেন। সেই প্রাচীন প্রথার জের এখনও দেখা যায়। পুরাতন ক্ষত্রিয় পরিবারে অদ্যাপি প্রধান পাচক রূপে নাপিত নিযুক্ত হয়।" বাক্যে ও কর্মে স্বামীজি এত সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন যে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অপ্রকৃতিস্থ ধার্মিক আসিলে তিনি তাহাকে নির্মম আঘাত করিতেন। এক তথাকথিত অধ্যাত্ম উৎসাহী তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। আমি তখন কোন কর্মে ব্যাপৃত ছিলাম। সে শুধু মালয়ালাম্ ভাষা জানিত। কিন্তু কোন উপায়ে ইঙ্গিত করিল যে, সে তাহার সহিত কথা বলিতে চাহে। দোভাষীর কাজ করিবার জন্য আমাকে ডাকিয়া পাঠান হইল। সে স্বামীজির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উর্ধ্বে বিন্যস্ত এবং ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইল। সম্ভবতঃ কোন মন্ত্রোচ্চারণের ইহা বাহ্য প্রকাশ। স্বামীজি প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়া কৌতূহলী হইলেন। ক্ষণকাল পরে সে স্বামীজিকে তাহার সাধনার বিস্তৃত বিবরণ দিল—কিরূপে সে জীবন কাটাইতেছে, কিরূপে সে দিনের পর দিন অনাহারে থাকে, কিরূপে সে নিদ্রাজয় করিয়াছে এবং ইহার অভাব বোধ করে না। সাধন পথে অগ্রগতির জন্য তিনি এখন স্বামীজির উপদেশপ্রার্থী হইলেন। স্বামীজি তাহাকে বলিলেন, "হে তরুণ যুবক, তোমাকে আমি এই পরামর্শ দেই যে, তুমি বাড়ী গিয়ে মাথায় তৈল ব্যবহার কর। ঠাণ্ডা জলে স্নান কর। পুষ্টিকর খাদ্য খাও এবং রাত্রে খুব ঘুমাও। এই সরল সাধন তোমার পক্ষে এখন

হিতকর।" ইহা শুনিয়া সেই যুবক স্পষ্টতঃ আহত হইল ও বিদায় গ্রহণ করিল। তখন স্বামীজি বেদনাযুক্ত কণ্ঠস্বরে মন্তব্য করিলেন, "এই ছোকরার জন্য আমি সত্যই দুঃখিত। সে দ্রুতবেগে পাগলা গারদের উপযুক্ত হইতেছে। যদি সে আমার পরামর্শ অনুসারে না চলে, তাহাকে উন্মাদ আশ্রমে যাইতে হইবে।" হে পাঠক! তুমি কি বিশ্বাস করিবে যে সেই যুবক এখন ভীষণ উন্মাদ? স্বামী নির্মলানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল।

আর এক ধর্মোৎসাহী আসিল। সে প্রাণায়াম অভ্যাস করিত। সে স্বামীজির নিকট প্রাণায়াম সম্বন্ধে উপদেশ চাহিল। স্বামীজি গম্ভীরভাবে তাহাকে বলিলেন, "হে বন্ধু, ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়কে বায়ুপূর্ণ করিয়া স্ফীত করাই ধর্ম নহে। যদি তাহাই হইত ফুটবলগুলি জগতে শ্রেষ্ঠ যোগী হইত। যাহারা চরিত্রগঠনের কঠিন কর্তব্য উপেক্ষা করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তির সোজা পথ জানিতে চায়, অথবা অসৎ মতলব লইয়া ধর্মপথে ধাবিত হয় স্বামীজি তাহাদের দেখিলেই অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে বুঝিতে পারিতেন এবং পূর্বোক্ত প্রকারে দুই চারিটি কড়া কথা বলিয়া বিদায় দিতেন।

স্বামীজি যখন ওট্টাপালমে অবস্থান করেন তখন প্রত্যহ এইরূপ ঘটনা দুই একটি ঘটিত। তাঁহার উপস্থিতিতে ক্ষুদ্র স্থান আলোড়িত ও আহ্লাদিত হইত। প্রত্যেক বৎসর ত্রিবাঙ্কুর যাইবার পথে তিনি ওট্টাপালমে নামিতেন এবং শ্রীনারায়ণ আয়ারের অতিথি হইতেন। প্রথম হইতেই তিনি অনুভব করিলেন যে ওট্টাপালমে অনেকগুলি খাঁটি ভক্ত আছে। ওট্টাপালমের প্রশান্ত পরিবেশ এবং মনোহর দৃশ্য পার্শ্ববর্তী আঁকাবাঁকা ভারত নদী এবং উহার তীরবর্তী পাহাড়গুলি দেখিয়া নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার অতি প্রিয় আরণ্য তপোবন স্মরণ করিতেন। তিনি এইস্থান খুব পছন্দ করিতেন এবং যে ভক্তের গৃহে অতিথি হইতেন তাঁহাকে ও তাঁহার পরিজনবর্গকে অশেষ স্নেহ করিতেন। প্রত্যেকবার তিনি তাঁহার গৃহে তিন দিনের কম থাকিতেন না। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বাদশ বৎসর যাবৎ উহা অন্যতম প্রিয় গৃহ ছিল, যথায় তাঁহার অবস্থান অনেক সুখকর হইত। স্থানীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত উক্ত গৃহে তাঁহার শিষ্যগণ, ভক্তবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ সম্মিলিত হইতেন। কমলালয় প্রেসের বৃহৎ গৃহের দ্বিতলস্থ প্রশস্ত কক্ষে স্থানীয় বেদান্ত-সমিতির অধিবেশন ও শাস্ত্র-চর্চাদি হইত। বাৎসরিক আগমনের জন্যও স্বামীজি উক্ত:স্থানে শ্রদ্ধাভরে

নিমন্ত্রিত হইতেন। তখন স্বামীজির উপস্থিতিতে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের বার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইত। দক্ষিণ ভারতে স্বামী নির্মলানন্দের ধর্মপ্রচার কালে দক্ষিণ মালাবারস্থ ওট্টাপালমে তাঁহার গমন অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময়ে উত্তর মালাবারে কুইল্যাণ্ডিস্থ যোগমঠের স্বত্বাধিকার রামকৃষ্ণ মিশনকে সমর্পণার্থ আলোচনা চলিতেছিল। যোগমঠে দেব-সেনাপতি মহাযোগী স্কন্দস্বামীর নিত্যপূজা হইত। তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র গৃহে ভ্রাম্যমান সাধুবৃন্দ প্রায়শঃ আশ্রয় লইতেন। অবসরপ্রাপ্ত স্থানীয় উকিল কে. পি. কৃষ্ণন নায়ারের প্রচেষ্টায় ও জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে এই মঠ স্থাপিত হয়। কৃষ্ণন নায়ার স্বয়ং মঠে থাকিয়া উহার পরিচালনা করিতেন। তিনি কুন্হী রমণ মেনন কর্তৃক বাদাগারে স্বামী নির্মলানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহূত হন। নির্মলানন্দজীর মুখে রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি ও মতবাদ শুনিয়া তিনি উহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। ইহার পরে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, রামকৃষ্ণ মিশনকে যোগমঠ দান করিলে মঠের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে। তিনি মেননের নিকট স্বীয় অভিমত প্রকাশ করেন। মেনন স্বামী নির্মলানন্দের নিকট নিশ্চিতভাবে জানিলেন যে, স্বামীজি উক্ত মঠ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে আহূত জনসভায় মিশনকে উক্ত মঠ দানের চরম সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুসারে দলিলের খসড়া প্রস্তুত করিয়া মিশনের প্রেসিডেণ্টের নামে উহা রেজিষ্টার্ড করা হইল।

স্বামী নির্মলানন্দ ওট্টাপালম্ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল হরিপাদে উপস্থিত হন। ১০ই এপ্রিল তথায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব সমধিক সমারোহে সম্পন্ন হয়। পরদিন বহুসংখ্যক অস্পৃশ্য পঞ্চমা স্বামীজিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতে আসে ও একটি পঞ্চমা বালককে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করে। স্বামীজি কয়েকদিন উক্ত আশ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও শিষ্যবর্গকে শিক্ষাদান করেন। এই কার্যে তিনি যথাসাধ্য পরিশ্রম করেন এবং কোন কিছুই নগণ্য বলিয়া উপেক্ষিত হয় নাই। বস্তুতঃ তাঁহার নিকট জীবনের কোন কিছুই নগণ্য বা ক্ষুদ্র ছিল না। পূর্ণতায় কোন অংশ নাই। মানবজীবন অখণ্ড সমগ্র বস্তু এবং পূর্ণজীবন সর্ব অংশে ও সর্ব কর্মে সম্যক্ পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। জগতের চক্ষে যাহা ক্ষুদ্র তাহাও পূর্ণ জীবনে বৃহৎ বা মহৎ হইয়া উঠে। স্বামী নির্মলানন্দের জীবন হইতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একদা

কয়েকটি ভক্ত লইয়া স্বামীজি ঠাকুর-ঘরের সম্মুখস্থ কক্ষে বসিলেন। মঠবাসী ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে নৈবেদ্য প্রদানান্তে মন্দিরের দরজা এত জোরে বন্ধ করিলেন যে, ইহাতে ভীষণ শব্দ হইল। স্বামীজি ধ্যান সমাপনান্তে উঠিয়া ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া কঠোর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি মনে কর, ধ্যান করা ছেলে-খেলা ও লোক-দেখানো ব্যাপার। দরজা বন্ধ করিবার সময় বিকট শব্দে আমাদের ধ্যানে বিঘ্ন জন্মিল। ইহাতে ভগবান তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। ঠাকুরকে নৈবেদ্য দিয়া মন্দিরের কোণে বসিয়া তোমার ধ্যান করা উচিত ছিল না কি?"

হরিপাদ হইতে স্বামীজি দুই একদিনের জন্য ত্রিবান্দ্রমে গেলেন। তথা হইতে ফিরিবার পথে তিনি ত্রিবাঙ্কুরের মধ্যস্থলে কান্দিউর ও মুত্তম গ্রামদ্বয় পরিদর্শন করেন। কান্দিউরের বস্ত্রবয়ন বিদ্যালয়ে বহু লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। ভজন ও আরতির পরে স্বামীজি সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। একজন প্রশ্ন করিলেন, বর্তমান যুগে অবতারের কি প্রয়োজন? একটি সহজ ও সুদীর্ঘ উত্তরে স্বামীজি ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ এবং প্রয়োজন ও পরিপূরণের অর্থনৈতিক নিয়ম ব্যাখ্যা করিলেন, ভিন্ন ভিন্ন যুগের প্রয়োজন বিশ্লেষণ করিলেন, বর্তমান যুগ-প্রয়োজনের একটি সুন্দর চিত্র দিলেন এবং যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের উজ্জ্বল আলেখ্য সর্বসমক্ষে ধরিলেন। তাঁহার কথাগুলি শ্রোতাদের হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলিল। তন্মধ্যে অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন এবং যথাসময়ে মুত্তমে একটি আশ্রম গড়িয়া উঠিল। মাভেলিকর হইতে স্বামীজি মান্নারে গমন করেন। তথায় যীশু খ্রীষ্ট, গিরিশ ঘোষ, সুরেশ মিত্র, গোঁড়ামি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় তৎকর্তৃক আলোচিত হইল।

তিরুভেলা তাঁহার পরবর্তী গন্তব্য স্থান। তথায় পূর্ব বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত মন্দিরে কয়েকদিন নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে পৌরোহিত্য করিলেন। উহার বার্ষিক রিপোর্টে মন্দিরের উন্নতিবিধানে যিনিই যথাসাধ্য অর্থ ও শ্রম দান করিয়াছিলেন, তিনিই উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসিত হইয়াছিলেন। উৎসবদিবসের কার্যসূচী সমাপ্ত হইলে, স্বামীজি ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি যথার্থ ভক্ত নও এবং আমাদের মিশনের ভাবধারার সহিত পরিচিত নও। প্রত্যেকেই স্ব স্ব

সামর্থ্য ও সম্পদ অনুসারে এই শুভ কার্য করিয়াছে। সকালে আমি দেখিয়াছি, একটি পাচক জ্বলন্ত আগুনের সামনে দাঁড়াইয়া উনুনের হাঁড়িতে পায়েস সজোরে নাড়িতেছে ও মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে। সে কোন অফিসার বা ধনী ব্যক্তি নয়। এই জন্যই কি তুমি রিপোর্টে তাহার প্রশংসা কর নাই?" এইরূপে তিনি প্রথম হইতেই শিষ্যবৃন্দ ও ব্রহ্মচারীগণের মধ্যে প্রকৃত ধর্মভাব সঞ্চার করিতেন। তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, তিনি কোন ব্যক্তি-বিশেষকে মানেন না, কিন্তু সার্বজনীন সুনীতিকে মানিয়া চলেন। তিরুভেলা হইতে স্বামীজি পুনরায় হরিপাদে গমন করেন এবং তথা হইতে আলেপ্পী ও সার্তালেতে নামিয়া ব্যাঙ্গালোরে ফিরিয়া যান।

সতের

অলৌকিক গুরুভ্রাতৃপ্রেম

ব্যাঙ্গালোরে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী নির্মলানন্দ বেলুড়মঠে যাইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন অনুভব করিলেন। ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ব্যাঙ্গালোর রেভিনিউ অ্যাণ্ড মিউনিসিপ্যাল রেকর্ডসে ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রেসিডেন্টের নামে রেজিষ্টার্ড হইয়াছিল। যদিও স্বামী নির্মলানন্দ উক্ত আশ্রমের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট ছিলেন তথাপি তাঁহার নামে কোন দলিল বা নিয়োগপত্র ছিল না। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে যখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ উক্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তখন ব্যাঙ্গালোরের জনসাধারণ তাঁহার হস্তে উহার ভার অর্পণ করেন। আবার স্বামী ব্রহ্মানন্দই স্বামী নির্মলানন্দকে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন। সেইজন্য নির্মলানন্দজী গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দজীর প্রতিনিধিরূপে আশ্রম চালাইতেন। অধ্যক্ষের পদকে আইনসঙ্গত ভিত্তি দানার্থ তাঁহাকে 'পাওয়ার অব অর্টনি' দান করাটা স্বামী ব্রহ্মানন্দের পক্ষেও প্রয়োজন হইল। এই বিষয়টি নিশ্চিতরূপে সমাধান করিবার জন্য স্বামী নির্মলানন্দ বেলুড়মঠ যাত্রা করিলেন। বেলুড়মঠ ও উত্তর ভারতের তীর্থসমূহ দর্শনার্থ মাভেলিকরের দুই ভক্ত মধুরাম পিলে ও তাঁহার ভ্রাতা দামোদর পিলে স্বামীজির সঙ্গী হইলেন। মধুরাম পিলে কিছুদিন পরে বেলুড়মঠের সন্ন্যাসী

হইয়া স্বামী অম্বানন্দ নামে অভিহিত হয়েন। স্বামী নির্মলানন্দ এই দুইজনকে অনুগ্রহপূর্বক তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিলেন। তাঁহারা স্বামীজির সহিত মাদ্রাজে মিলিত হইলেন। তাঁহারা তিনজন শারদীয়া দুর্গাপূজার পূর্বেই কলিকাতা পৌছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তসংঘের জননী সারদাদেবী নির্মলানন্দজীর সনির্বন্ধ অনুরোধে এই দুই দক্ষিণ দেশীয় ভক্তকে দীক্ষাদানে সম্মত হইলেন। মহালয়া অমাবস্যা দিবসে ভাগ্যবান ভক্তদ্বয় শ্রীমার নিকট মন্ত্র দীক্ষা লাভ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা শ্রীমার পদযুগল গঙ্গাজলে ধুইয়া স্বগৃহে আনিবার জন্য চরণামৃত লইলেন। ভক্তদ্বয় বেলুড়মঠেই দুর্গোৎসবের কয়েকদিন কাটাইলেন। বিজয়া দশমী দিবসে এই ভক্তগণ যে দিব্য দৃশ্য দেখিলেন তাহা তাঁহাদের স্মৃতিপটে চিরকাল সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। দুর্গা প্রতিমা গঙ্গাগর্ভে নিরঞ্জনান্তে প্রাচীন ও নবীন সন্ন্যাসীবৃন্দ মিলিত হইয়া শিবনৃত্যে প্রমত্ত হইলেন। নৃত্যারম্ভে প্রথমতঃ প্রস্তাবিত হইল যে, স্বামী প্রেমানন্দই শিব সাজিবেন; কিন্তু স্বামী প্রেমানন্দ জেদ করিলেন যে, স্বামী নির্মলানন্দই শিব সাজুন। এই প্রস্তাবে সকলেই সানন্দে সম্মত হইলেন। স্বামী নির্মলানন্দ শিব সাজিয়া বেদীর উপর বসিলেন এবং প্রেমানন্দজী তাঁহাকে মাল্যদান করিলেন। অনন্তর সাধুবৃন্দ তাঁহাকে ঘিরিয়া আনন্দময় শিবনৃত্যে মাতিয়া গেলেন। এই দৃশ্য দর্শনীয়!

স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ ঈশ্বরকোটি গুরুভ্রাতাদের সম্বন্ধে একদা স্বামী নির্মলানন্দ বলিয়াছিলেন, "আহা! তাঁহারা সকলে দেবতা ও লোককল্যাণার্থ নররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ। একদিন প্রেমানন্দজী ঢাকায় কয়েকটি ভক্তকে স্বীয় কক্ষে ডাকিয়া দরজা বন্ধ করিলেন ও তাহাদের মূঢ়তা বুঝাইতে সচেষ্ট হইলেন; কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই স্বীয় মূঢ়তা বুঝিলেন না ও প্রেমানন্দজীর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর প্রেমানন্দজী তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা ইংরাজী প'ড়ে পণ্ডিত হয়েছ। তাই নয় কি?' এই কথা বলিয়া তিনি তন্মধ্যে তর্করত একজনের কাঁধে হাত দিয়া সহাস্যে একটু চাপ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার তার্কিক মনোভাব বিদূরিত ও তাহার জীবন সম্যক্ পরিবর্তিত, রূপান্তরিত হইল! ইহা কি সাধারণ সাধুর সাধ্য?" সুতরাং স্বামী নির্মলানন্দকে শিব সাজাইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করা কি প্রেমানন্দজীর কল্পনা মাত্র? প্রেমানন্দজী কি সত্যই স্বীয় গুরুভ্রাতার মধ্যে সাক্ষাৎ শিবকে প্রকটিত

দেখেন নাই? নির্মলানন্দজীর হৃদয় অপেক্ষা অধিকতর কোমল ও প্রশস্ত হৃদয় কি দেখা যায়? এমন কি, দুরাচার ব্যক্তির জন্যও তাঁহার হৃদয়কোণে একটু স্থান ছিল।

রথযাত্রা দিবসে স্বামী নির্মলানন্দ বেলুড়মঠের পুরানো বাড়ীর দোতলার বারান্দায় পূর্বমুখে বসিয়া গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। গঙ্গাবক্ষে নৌকাগুলি মাহেশের রথযাত্রায় গমনকারী যাত্রীদের লইয়া যাইতেছে। একটি নৌকায় কয়েকটি দুরাচার ব্যক্তি ও বারবনিতা বাজে গান ও রঙ্গরস করিতে-করিতে বেলুড়মঠের পাশ দিয়া যাইতেছিল। এক ভক্ত নির্মলানন্দজীর নিকটে দাঁড়াইয়া মন্তব্য করিলেন, "দেখুন, এই যুবকগুলি বেলুড়মঠের প্রতি কি শ্রদ্ধাহীন! তাহারা নির্লজ্জভাবে এইরূপ অসংযত অবস্থায় অসৎ সঙ্গীদের লইয়া বেলুড়মঠের নিকট দিয়া যাইতেছে। এই পুণ্যস্থানের সন্নিকটে তাহাদের পক্ষে সুসংযত ব্যবহার করা উচিত ছিল না কি?" ইহা শুনিয়া স্বামী নির্মলানন্দ ব্যথিত অন্তরে বলিলেন, "বাবা, তুমি উত্তমরূপে জান যে এই পৃথিবী কত দুঃখময়! যদি তাহারা এই অসহনীয় দুঃখ-শোক মুহূর্তের জন্যও এই প্রকারে ভুলিতে চেষ্টা করে, তাহারা আমার মতে ক্ষমা ও প্রশংসার যোগ্য।" স্বর্গলোকবৎ তাঁহার হৃদয় বিশাল ও বিশুদ্ধ ছিল। ইহার একটি স্নায়ুও শুষ্ক বা রুক্ষ ছিল না। ইহা সকলকে ভালবাসিত, সকলকে আশীর্বাদ করিত।

স্বামী নির্মলানন্দের প্রতি প্রেমানন্দজীর প্রীতি এত অধিক ছিল যে, বেলুড়মঠে নির্মলানন্দজী যে কয়দিন অবস্থান করেন সেই কয়দিন প্রত্যহ প্রেমানন্দজী প্রেমাস্পদ গুরুভ্রাতার জন্য তাঁহার রুচিকর অন্নব্যঞ্জন সযত্নে প্রস্তুত করাইতেন। আবার প্রেমানন্দজীর প্রতি নির্মলানন্দজীর প্রীতি আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধার আকার ধারণ করিয়াছিল। বেলুড়মঠ হইতে বিদায়গ্রহণ কালের দৃশ্য অতিশয় মর্মস্পর্শী। নির্মলানন্দজী আরক্তিম বদনে ও সজল নয়নে প্রেমানন্দজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে উঠিবার পর উভয়ের মধ্যে দুই চারিটি কথার বিনিময় হইল। পুনরায় স্বামী নির্মলানন্দ তদীয় ঈশ্বরকোটী গুরুভ্রাতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া উঠিলে প্রেমানন্দজী গভীর প্রীতি জ্ঞাপন করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্বামী নির্মলানন্দ আবার গুরুভ্রাতৃপদে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন। ইহার অর্থ, উভয়ে পরস্পরকে বিদায় দিতে মর্মবেদনা অনুভব করিতেছেন এবং স্বামী নির্মলানন্দ ঈশ্বর-প্রতিম

গুরুভ্রাতাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া আন্তরিক পরিতোষ লাভ করিতেছেন। সমীপবর্তী ভক্তগণ লক্ষ্য করিলেন যে, স্বামী নির্মলানন্দ ষষ্ঠবার প্রণামান্তে প্রেমানন্দজীর নিকট হইতে জোর করিয়া চলিয়া আসিলেন।

কলিকাতা হইতে স্বামী নির্মলানন্দ পূর্বোক্ত ভক্তগণসহ বেনারসে যাইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কাশীধামে কয়েকদিন কাটাইয়া তাঁহারা হৃষীকেশাদি তীর্থ দর্শনে অগ্রসর হইলেন। স্বামী নির্মলানন্দ ভক্তদের সহিত তীর্থ দর্শনে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট স্বীয় সংকল্প ব্যক্ত করায় তিনি সস্নেহে আপত্তি করিয়া বলিলেন, "তুমি বহুবার এই সব তীর্থ দেখিয়াছ। এখন তুমি আমার কাছে আসিয়াছ। তোমা ছাড়াও এই ভক্তদ্বয় তীর্থ দর্শনে যাইতে পারে। ঠাকুরের কৃপায় তাহারা এখানে নিরাপদে ফিরিয়া আসিবে। এই ঋতু স্বাস্থ্যকর নহে এবং তুমি ওখানে গেলে অসুস্থ হইতে পার।" সেইজন্য ভক্তদ্বয় নির্মলানন্দজীকে কাশীধামে ছাড়িয়া তীর্থযাত্রায় চলিলেন। অবশ্য নির্মলানন্দজী তাঁহাদের যাইবার সমস্ত সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন ও ব্রহ্মানন্দজীর নিকট রহিলেন। ব্যাঙ্গালোর আশ্রম সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ স্বয়ং বিশেষ বিবেচনা ও উকিলের পরামর্শ লইয়া সাধারণভাবে নির্মলানন্দজীকে 'পাওয়ার অফ্ এটর্ণী' লিখিয়া দিলেন। উহাতে লিখিত আছে, "আমি, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসের চেলা ও শিষ্য ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। সম্প্রতি কাশীধামে লাক্সা মহল্লায় রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে নিবাস করিতেছি। আমি ব্যাঙ্গালোর শহরস্থ রামকৃষ্ণ আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসের চেলা ও শিষ্য স্বামী নির্মলানন্দকে আমার যথার্থ ও আইনসঙ্গত এটর্ণী মনোনীত ও নিযুক্ত করিতেছি। তিনি পূর্বোক্ত ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের যথোচিত পরিচালনা করিবেন এবং তথায় আমার নামে যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিদ্যমান, তৎসমুদয় উক্ত আশ্রমের উন্নতিকল্পে তিনি ব্যবহার করিবেন।" ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর এই দলিলের খসড়া প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত ও রেজিষ্টার্ড হয়।

উল্লিখিত ভক্তদ্বয় হৃষীকেশে গেলেন ও তথায় তপস্যারত স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। যেদিন ভক্তদ্বয় তথায় উপস্থিত হন সেদিন তুরীয়ানন্দজী বাহিরে গিয়াছিলেন ও অধিক রাত্রিতে ফিরিলেন। সেই জন্য তাঁহারা তাঁহার সহিত সেইদিন দেখা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের

আগমনের সংবাদ শুনিয়া তুরীয়ানন্দজী পরদিন ভোরে পাঁচটার সময় উঠিয়া ধর্মশালায় গেলেন ও ডাকিয়া বলিলেন, 'তুলসী মহারাজের কাছ হইতে কাহারা আসিয়াছে?' ত্বরান্বিত ভক্তদ্বয় তাঁহার নিকট গেলেন ও প্রণাম করিলেন। তুরীয়া-নন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুলসী মহারাজ এখন কোথায়? তিনি তোমাদের সঙ্গে আসিলেন না কেন?' ভক্তদ্বয় তুলসী মহারাজের কাশীধামে অবস্থানের কারণ জানাইলে উজ্জলনয়নে তিনি বলিলেন, 'তোমাদের স্বামীজিকে কি আমি দেখিতে পাইব না?' তুরীয়ানন্দজীর মুখে নির্মলানন্দজীর জন্য প্রীতি ও প্রতীক্ষার প্রকাশ দেখিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। যে কয়দিন ভক্তদ্বয় তথায় ছিলেন তুরীয়ানন্দজী তাঁহাদের প্রতি সদয় ও সহায়ক ব্যবহার করেন। তাঁহারা তুরীয়ানন্দজীর নিকট বিদায় লইয়া পথে প্রয়াগ তীর্থ দেখিয়া কাশীধামে ফিরিলেন। তাঁহারা কাশীধামে পৌঁছিবার পূর্বেই স্বামী তুরীয়ানন্দ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্বেও তিনি প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী নির্মলানন্দের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এত দূর স্থানে আসিলেন। হায়! উহাই উভয়ের শেষ সাক্ষাৎ। কাশীধামে আরও কয়েকদিন থাকিয়া স্বামী নির্মলানন্দ গুরুভ্রাতৃদ্বয় ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দজীর নিকট বিদায় লইয়া ব্যাঙ্গালোরে ফিরিলেন।

আঠার।

কেরল জাগ্রত

যদিও কুইল্যাণ্ডিস্থিত যোগমঠ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে বেলুড়মঠের প্রেসিডেণ্ট মহারাজকে দানপত্র করিয়া দেওয়া হইল এবং স্থানীয় জনসাধারণ প্রত্যাশা করিলেন যে নির্মলানন্দজী অবিলম্বে যাইয়া আশ্রম উৎসর্গ করিবেন, তথাপি তিনি তখন যাইতে পারিলেন না। কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমনের পর নির্মলানন্দজী উক্ত আশ্রমের উন্নতি বিধানে মনোযোগ দিলেন। যথারীতি ব্যাঙ্গা-লোরে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইলে স্বামীজি কুইল্যাণ্ডি যাত্রা করিলেন। ইতোমধ্যে তিনি তথায় উদ্বোধন উৎসব আয়োজনের বিস্তৃত নির্দেশ প্রেরণ করেন। কেরল প্রদেশের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত তাঁহার বন্ধুবর্গ ও ভক্তবৃন্দ

নিমন্ত্রিত হইলেন। কুইল্যাণ্ডিতে যে আশ্রম স্থাপিত হইবে তাহার ভার লইবার জন্য তিরুভেলা হইতে ভক্ত নীলকণ্ঠকে তিনি ডাকিয়া আনিলেন। বেলুড়মঠের বর্তমান ভাইস-প্রেসিডেণ্ট স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে সঙ্গে লইয়া নির্মলানন্দজী যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে ওট্টাপালমে নামিয়া কয়েকদিন রহিলেন এবং ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে মার্চ কুইল্যাণ্ডিতে পৌঁছিলেন। পরদিন ব্রিটিশ মালাবারে প্রথম আশ্রম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নামে যথারীতি উৎসর্গীকৃত হইল। হোমাদি অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন হইল। শত শত দরিদ্রনারায়ণ পরিতোষপূর্বক ভোজন করিল। মালাবারের নানাস্থান, ত্রিবাঙ্কুর ও দক্ষিণ কানাড়ার ভক্তবৃন্দ দলে দলে এই উৎসবে যোগদান করিলেন। ধর্মসভা, ধর্মবক্তৃতা ও নির্মলানন্দজীর প্রেরণাপ্রদ ধর্মপ্রসঙ্গ হইল। এই উৎসব বস্তুতঃ নিখিল কেরল ধর্মোৎসবের আকার ধারণ করিল। নির্মলানন্দজী উৎসবের পরে কয়েকদিন থাকিয়া দর্শন-প্রার্থীদিগকে উপদেশ দান ও আশ্রমের ভবিষ্যৎ পরিচালনের সুব্যবস্থা করিলেন। ফিরিবার পথে তিনি তেলিচেরী ও কালিকটে নামিলেন, ওট্টাপালমে কয়েকদিন কাটাইলেন এবং পহেলা এপ্রিল ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছিলেন।

স্বামী নির্মলানন্দ এখন উত্তর মালাবার হইতে দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত সমগ্র কেরল প্রদেশ পরিদর্শন করিলেন এবং উহার প্রধান শহরগুলি শুধু নয়, উহার যে সকল গণ্ডগ্রামে যাইবার উপযুক্ত জলপথ বা স্থলপথ নাই, সেই সকল গ্রামেও প্রচার করিলেন। উহার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং অসংখ্য শিক্ষিত নরনারীর সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। এমন কি, যে সকল অশিক্ষিত নরনারী তাঁহার জানা কোন ভাষাই জানিত না, কিন্তু যাহাদের আগ্রহান্বিত মুখমণ্ডলে জ্ঞান ও তথ্যের পিপাসা প্রকটিত ছিল তাহারাও দলে দলে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। তিনি বুঝিলেন, জনসাধারণের জ্ঞান-পিপাসা বিদূরিত এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের যুগবাণী প্রচারিত করিতে হইলে স্থানীয় ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ প্রয়োজন। শুধু সুপণ্ডিত প্রচারকগণ দ্বারাও এই মহৎ কর্ম সম্পন্ন হইবে না। এই শুভ সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি পুনরায় কেরলে গেলেন এবং কুইলনে তাঁহার বন্ধুদের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, মালয়ালম্ ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। স্বামী নির্মলানন্দ উহার নাম দিলেন ‘প্রবুদ্ধ কেরল।’ এই আন্দোলনের একান্ত

সমর্থক ও প্রাচীন ভক্ত ডাক্তার তাম্পি তখন সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। সেই স্থানে একটি উত্তম ছাপাখানা ছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়া দশমী দিবসে 'প্রবুদ্ধ কেরল'এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। অল্পকাল মধ্যে এই মাসিক ব্যাপক প্রশংসা লাভ করিল। অদ্যাবধি এই পত্রিকা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর রহিয়াছে এবং ইহার মাধ্যমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থমালা মালয়ালম্ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

উক্ত বর্ষের ৭ই আগষ্ট স্বামী নির্মলানন্দ স্থানীয় খ্রীষ্টানদের একটি প্রধান কেন্দ্র কোট্টায়ামে গমন করেন। এই শহরের দক্ষিণ প্রবেশ-পথে স্থানীয় রামকৃষ্ণ-ভক্ত-জনসংঘের সভ্যবৃন্দ এবং কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক তিনি অভিনন্দিত ও তথা হইতে ভজন দলসহ শ্রীপদ্মনাভ তাম্পীর বাসগৃহে আনীত হন। উক্ত পদ্মনাভ তাম্পী তখন ডিভিসনাল পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন ও পরে বেলুড়মঠের সন্ন্যাসী হইয়া স্বামী পরানন্দ নামে পরিচিত হন। রবিবাসরীয় রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র ভজনে যোগদান করিয়াছিল তাহাদিগকে স্বামী নির্মলানন্দ আশীর্বাণী দিলেন। সন্ধ্যাকালে তিনি তরুণ হিন্দু সমিতির সভ্যগণের নিকট ধর্ম বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। পরদিন রামবর্মা ইউনিয়ন ক্লাব কর্তৃক আহূত ধর্মসভায় আর একটি ভাষণ দিলেন। তথায় বিচারশীল হিন্দু ও অহিন্দুগণ মিলিয়া তাঁহাকে যে সকল জটিল ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি স্বাভাবিক বাগ্মিতা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে সেইগুলির যথাযথ উত্তর দিলেন। অনেক জিজ্ঞাসুর সহিত ব্যক্তিগত আলোচনাও তিনি করিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে অ্যালেপ্পী রওনা হইলেন।

অ্যালেপ্পীতে স্বামীজির প্রথম গমনের পর হইতে কৃষ্ণ পিলে, কৃষ্ণ মেনন ও গোবিন্দ পিলে প্রমুখ কয়েকটি নৈষ্ঠিক ভক্ত নিয়মিত মিলিত হইয়া উপাসনা ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। স্বামী নির্মলানন্দ অন্যত্র গমনাগমনের পথে তথায় তাঁহাদিগকে উৎসাহিত ও ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নে সহায়তা করিতেন।

উনিশ

প্রবল ধর্মবন্যা

অ্যালেপ্পিতে অল্পকাল অবস্থানের পর স্বামী নির্মলানন্দ ত্রিবান্দ্রমে গেলেন। তত্রস্থ ভক্তবৃন্দ আশ্রমের উপযুক্ত জমির সন্ধানে এতদিন সচেষ্ট ছিলেন। শহরের উত্তর-পূর্বে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে নেত্তায়ামে অবসরপ্রাপ্ত টেলিগ্রাফ-মাস্টার অরুণাচলম্ পিলের প্রায় তিনশত একর পার্বত্য জঙ্গলাকীর্ণ জমি ছিল। উক্ত উদ্দেশ্যে তিনি পাঁচ একর জমিদানে সম্মত হইলেন। তখন ভক্তদের নিকট ইহা প্রতীত হইল যে, প্রস্তাবিত আশ্রম আরণ্য তপোবনতুল্য মনোরম হইবে। স্বামী নির্মলানন্দ উক্ত জমি পরিদর্শনান্তে আশ্রম স্থাপনার্থ উহা লইতে স্বীকৃত হইলেন। ১৯১৫ খ্রীঃ ২৩শে ডিসেম্বর ঐ জমির দান-পত্র স্বাক্ষরিত ও রেজিষ্টার্ড হইল।

এখন স্বামী নির্মলানন্দ শহরের উন্মত্ত জনকোলাহল হইতে বহু দূরে পাহাড়ের চূড়ায় ঐ জমিতে একটি প্রথম শ্রেণীর আশ্রম নির্মাণার্থ কোমর বাঁধিয়া লাগিলেন। তখন উদ্যোক্তাদের মধ্যে কেহই উক্ত কর্মের বিশালতা ও ব্যয়সাধ্যতা অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই। পরিকল্পিত আশ্রম সম্পূর্ণ নির্মিত হইলে কি বিরাট আকার ধারণ করিবে তাহা কেহই ধারণা করিতে পারেন নাই। ভক্তগণ সর্বপ্রথমে ভাবিয়াছিলেন, আশ্রম নির্মাণের ব্যয় আন্দাজ সাত হাজার টাকা পড়িবে। অল্পকাল মধ্যে বোঝা গেল যে, বিশ হাজার টাকার কমে উহা সম্পূর্ণ হইবে না। অনন্তর উহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত উঠিল ও পরিশেষে লক্ষাধিক টাকা খরচ হইল। স্বামী নির্মলানন্দ স্বয়ং ও তাঁহার বন্ধু সহকারী ইঞ্জিনিয়ার হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্রম-গৃহের নক্সা প্রস্তুত ও উহাতে মধ্যে মধ্যে আবশ্যকীয় পরিবর্তন করিলেন।

স্বামী নির্মলানন্দ সম্ভবতঃ প্রারম্ভেই জানিয়াছিলেন যে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানীতে এই আশ্রম অবস্থান, পরিকল্পনা ও কারুকার্যে ভারতের মধ্যে সুশ্রীতম ও বৃহত্তম হইবে। তিনি আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা করিলেন, বেলুড়মঠের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক আশ্রমের ভিত্তি স্থাপিত হউক। ব্রহ্মানন্দজীকে এইজন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে তিনি স্বয়ং কলিকাতা যাইবার

জন্য দিন স্থির করিলেন। কলিকাতা যাত্রার পূর্বে তিনি নিজেই অর্থ ও উপাদান সংগ্রহ ও আশ্রমভূমি পরিষ্কার ও সমতল করার কার্য তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত ব্যাপৃত রহিলেন। কার্য যতই অগ্রসর হইতে লাগিল ততই তিনি উহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন ও ভক্তবৃন্দের অধ্যাত্ম অভাব পরিপূরণে যত্নশীল হইলেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে স্বামী নির্মলানন্দ কলিকাতা যাত্রা করিলেন। এইবার তিনি তাঁহার প্রিয়তম ভক্তদ্বয় ডাক্তার তাম্পী ও শ্রীকুন্হী রমণ মেননকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষালাভার্থ লইয়া গেলেন। ভক্তদের প্রতি তাঁহার প্রীতি এত অকৃত্রিম ছিল যে, কুন্হী রমণ প্রথম দর্শনে ব্রহ্মানন্দজীর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা প্রার্থনা না করায় তিনি দুঃখিত হন। পূর্ববার কলিকাতা গমনকালে স্বামীজি তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করেন। ইহাতে কুন্হী রমণ অক্ষমতা প্রদর্শন করায় স্বামীজি এই সকল শুভকর্ম বিলম্বিত করার জন্য তাঁহাকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন। এইবার তিনি কুন্হীরমণ ও ডাক্তার তাম্পীকে সঙ্গে লইলেন এবং বেলুড়মঠে ব্রহ্মানন্দজীর নিকট দীক্ষিত করিলেন। তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যে সকল সাক্ষাৎ শিষ্য বেলুড়মঠে ছিলেন তাঁহাদের পরস্পর প্রগাঢ় প্রেম দেখিয়া ভক্তদ্বয় চমৎকৃত হইলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্দৃষ্টি ও দলপতি বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে তাঁহারা শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্ম জ্যোতিষ্করূপে পরিণত হইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ধর্মশক্তির মহাকেন্দ্র এবং যথাসময়ে সেই মহাশক্তি প্রকাশিত হইবে। উল্লিখিত ভক্তদ্বয় আরও লক্ষ্য করিলেন, কী গভীর শ্রদ্ধা-প্রীতির চক্ষে স্বামী নির্মলানন্দকে গুরুভ্রাতৃগণ দেখিয়া থাকেন। একদিন বেলুড়মঠে একটি আলোচনা সভা আহূত হয়। কলিকাতা হইতে বহু ভক্ত ও মঠের সাধুবৃন্দ ইহাতে যোগদান করেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দও উক্ত সভায় উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য প্রাচীন সন্ন্যাসীবৃন্দও সাগ্রহে আসিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "তুলসী এই সভা পরিচালনা করিবে। তাঁহার বক্তৃতার পরে যদি কাহারও কোন সন্দেহ থাকে আমি দুই একটি কথা বলিব।" সেদিন স্বামী নির্মলানন্দের ধর্মালোচনা এতই হৃদয়গ্রাহী ও বিশ্বাসজনক হইয়াছিল যে, ব্রহ্মানন্দজীর পক্ষে কোন কথা বলার প্রয়োজন হয় নাই। দীর্ঘকাল অবস্থানান্তে যখন তাঁহারা দক্ষিণ ভারতে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন তখন নির্মলানন্দজী ব্রহ্মানন্দজীকে কেরলে লইয়া যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সেই সময়

স্বামী ব্রহ্মানন্দ পূর্ববঙ্গে সুদীর্ঘ ভ্রমণান্তে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এই সুদীর্ঘ ভ্রমণে তিনি অতিশয় ক্লান্তিবোধ করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে সুদূর কেরল প্রদেশ ভ্রমণের প্রস্তাব করা তখন সঙ্গত হইল না। স্বামী নির্মলানন্দ বলিলেন যে, ব্রহ্মানন্দজীকে এই বিষয়ে নিবেদন করার অনুকূল সময়ের অপেক্ষায় তিনি আরও কয়েকদিন বেলুড়মঠে থাকিবেন। ভক্তদ্বয় নির্মলানন্দজীর কামনা পূরণার্থ মনে মনে প্রার্থনা করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন।

স্বেচ্ছায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে সময় ভ্রমণে যাইতেন, সেই সময় তাঁহার সঙ্গে যাওয়া ও সেবা করা যদিও বহুজন কর্তৃক আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য ছিল, তথাপি উহা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তদেশে গমনার্থ তাঁহাকে অনুরোধ ও সম্মত করা এবং তাঁহার ভ্রমণকালে সুবিধা, আরাম ও নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে লওয়া এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য ছিল, যাহা একমাত্র অতিমানবই সুসম্পাদনে সমর্থ হইতেন। দক্ষিণ ভারতের শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের প্রতি অসীম করুণা ও অসাধারণ সাহসিকতা ও অলৌকিক আত্মবিশ্বাস থাকায় স্বামী নির্মলানন্দ উক্ত ভার বহনে সানন্দে সাহসী হইলেন। কয়েক মাস অতীত হইল। স্বামী নির্মলানন্দ ব্রহ্মানন্দজীকে উল্লিখিত অনুরোধ করেন এবং তিনিও কৃপাপূর্বক উহাতে সম্মতি দেন। এই আনন্দ সংবাদ কেরল প্রদেশে প্রেরিত হইল। ভক্তগণ সুদুর্লভ ব্রহ্মানন্দ-রস আস্বাদনার্থ উচ্চকিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ যে সকল স্থানে দর্শন দান বা অবস্থান করিবেন সেই সব স্থানে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সেবাদি করিবার গুরু ভার স্বামী নির্মলানন্দ মানব-চরিত্রে ও ঐহিক ব্যাপারে অভ্রান্ত প্রজ্ঞান সহকারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যোগ্য ভক্তগণকে অর্পণ করিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ সদলবলে ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছিলেন।

ব্যাঙ্গালোর সিটি রেলওয়ে- ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে যথোচিত সংবর্ধনা করা হইল। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একটি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইল। ব্রহ্মানন্দজী আশ্রমে পৌঁছিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে, আশ্রমের বিস্তৃত বর্ণনাসহ এক পত্র বেলুড়মঠে স্বামী প্রেমানন্দকে লিখিবার জন্য সহযাত্রী কুমুদবন্ধু সেনকে নির্দেশ দিলেন। অস্পৃশ্য হরিজনদের মধ্যে নির্মলানন্দজীর সেবাকার্য দেখিয়া ব্রহ্মানন্দজী অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সকলের নিকট ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। উক্ত স্থানের

আধ্যাত্মিক পরিবেশ ব্রহ্মানন্দজীর প্রকৃতির অতিশয় অনুকূল ছিল। স্বামী নির্মলানন্দ কখনও শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণ তুল্য, কখনও গুরুর নিকট শিষ্যের মত, কখনও বা বালকৃষ্ণের প্রতি যশোদার ন্যায় গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দজীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। ইহাতে স্বামী নির্মলানন্দ সর্বদা প্রসন্ন-বদন ও হাস্য-মুখ ছিলেন। গুরুভ্রাতাকে সুপ্রসন্ন দেখিয়া নির্মলানন্দজী অপার আনন্দে অভিভূত হইলেন। ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে তিন মাসের অধিক অতিবাহিত হইল। কেরল প্রদেশে দক্ষিণ-পূর্ব মনসুনের ঋতু চলিয়া গেল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে নভেম্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্গীবৃন্দসহ যাত্রা করিলেন। বেলুড়মঠের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট স্বামী শংকরানন্দ, স্বামী যতীশ্বরানন্দ, স্বামী ভূমানন্দ, স্বামী দুর্গানন্দ ও স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ তাঁহার সহযাত্রী হইলেন।

যথাসময়ে স্বামী নির্মলানন্দ শ্রীকুন্‌হী রমণ মেননকে লিখিয়াছিলেন, "আপনি সমাগত সাধুদলকে ওট্টাপালমে সেবা করিবেন ও তথা হইতে আলওয়েতে লইয়া যাইবেন। ফিরিবার পথে এর্ণাকুলম হইতে পোদানুরে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার ভারও আপনার উপর রহিল।" ২৬শে নভেম্বর সুপ্রভাত হইল। ঐদিন যুগাবতারের পূত পাদস্পর্শে কেরল পবিত্র হইবে। মাদ্রাজ হইতে মেল ট্রেণ আসিয়া কেরল প্রদেশের প্রথম রেলওয়ে ষ্টেশন ওলাভাকোডে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দলসহ আনিয়া হাজির করিল। নির্মলানন্দজীর নিকট পরিচিত এক যুবককে পাঠান হইল তাঁহাকে তথায় গিয়া এই অগ্রিম সংবাদ দিবার জন্য যে, ওট্টাপালম্ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রীকুন্‌হী রমণ তথায় পূর্ব দিনে গিয়াছেন। ওট্টাপালমে নির্মলানন্দজীর প্রিয়-ভক্তের গৃহে সযত্নে প্রস্তুত মালাবারী আহার্য রেলওয়ে ষ্টেশনে ব্রহ্মানন্দজী প্রভৃতি সাধুদের সেবার্থ লইয়া যাওয়া হইল। ট্রেণ বাঁশি বাজাইয়া ষ্টেশনে আসিল। মাত্র এক মিনিট ষ্টেশনে ট্রেণ থামিবে। আকুল প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ভক্তবৃন্দের হৃদয় মহাপুরুষদের দর্শনাগ্রহে উল্লসিত হইল। আবার এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি আহার্যপূর্ণ পাত্র কিরূপে ট্রেণের কামরায় তুলিয়া দেওয়া যাইবে—এই ভাবিয়া তাঁহারা চিন্তিতও হইলেন। স্বামী নির্মলানন্দ আনন্দময় মধুর হাস্যে ট্রেণের মধ্য হইতে উঁকি মারিয়া প্ল্যাটফরমে দণ্ডায়মান ভক্তবৃন্দকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাদিগকে ভক্তিপূত নমস্কার করিয়া ট্রেণে উঠিলেন ও আহার্যপূর্ণ পাত্রসমূহকে সত্বর সযত্নে তুলিলেন ও ব্রহ্মানন্দ

মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রসন্ন বদনে সমাসীন—প্রশান্ত, মহিমান্বিত ও হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল। স্বামী নির্মলানন্দও একই কামরায় ছিলেন। উক্ত কামরায় মালাবারের কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তি বসিয়া লেজিস-লেটিভ কাউন্সিল প্রভৃতির কথা অবিরত বলিতেছিলেন। শোরানুরে পৌঁছিয়া উক্ত দল এর্ণাকুলম্‌গামী ট্রেণে উঠিলেন। রেলওয়ে কর্মচারী শ্রীকুন্‌হী রমণ মেননের এক বন্ধুর সাহায্যে উচ্চ শ্রেণীর প্রশস্ত কামরায় আহার্য গ্রহণের অনুমতি পাওয়া গেল।

প্রথম শ্রেণীর কামরায় সর্বাগ্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে কুন্‌হী রমণ মেনন আহার করাইলেন। সম্ভবতঃ তিনি মালাবারী খাদ্যদ্রব্য পছন্দ করিলেন ও বার বার চাহিলেন। তাঁহার আহার সমাপ্ত হইলে ও তিনি বিশ্রাম করিতে গেলে অন্যান্য সকলে পেট ভরিয়া খাইলেন ও মহানন্দ করিলেন। ইহাতে স্বামী নির্মলানন্দ যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং কুন্‌হী রমণ স্বহস্তে ব্রহ্মানন্দজীর সেবা করায় গভীর সন্তোষ প্রকাশ করিলেন; কারণ ব্রহ্মানন্দজী সকলের ছোঁয়া আহার্য দ্রব্য গ্রহণ করিতেন না। ব্রহ্মানন্দজীর দর্শন মানসে শোরানুরে কতিপয় ভক্ত আসিলেন। শোরানুর ছাড়িয়া উক্ত দল আলওয়েতে পৌঁছিলেন; আলওয়ে প্রসিদ্ধ নদী-মাতৃক শহর। তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করা হইল। শ্রীতাম্পি ওরফে স্বামী পরানন্দ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ ত্রিবাঙ্কুর হইতে আসিয়া সদল ব্রহ্মানন্দজীকে সাদর সংবর্ধনা করিলেন। নদীতীরস্থ একটি সুন্দর প্রশস্ত বাংলো তাঁহাদের অবস্থানার্থ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আনন্দময় ও সুস্মিত-বদন ছিলেন। সন্ধ্যায় তাঁহাকে একটি বড় নৌকায় বসাইয়া নদীবক্ষে ভ্রমণ করা হইল। তিনি সর্বদা শিশুবৎ প্রফুল্ল ছিলেন। তথায় সকলে আরামপ্রদ ও সুখকর বোধ করিলেন। পরদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও নির্মলানন্দকে ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিতে দলে দলে নরনারী আসিল। এই সকল ধর্মপিপাসু নরনারীকে দেখিয়া অল্পভাষী ব্রহ্মানন্দজীও সৎপ্রসঙ্গ করিতে উন্মুখ হইলেন এবং তীর্থযাত্রা, দেবস্থান, জপ-ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি কঠিন বিষয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া উপদেশ দিলেন। কদাচিৎ তিনি ধর্মসভায় ভাষণ দিতেন। উক্ত ভক্তসভায় তিনি যে সংক্ষিপ্ত অমূল্য ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা 'প্রবুদ্ধ কেরল' পত্রিকায় মালয়ালম্‌ ভাষায় বাহির হইয়াছিল। ইহার আক্ষরিক অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"তীর্থযাত্রা নানাভাবে উপকারী। ইহার প্রধান উপকার এই যে, আমরা

তীর্থস্থানে সাধুগণকে দর্শন ও সেবা করিতে পাই। আর এক উপকার এই যে, তীর্থবাসে ঐহিক ভাবনা কমিয়া যায় ও সতত ঈশ্বরের স্মরণ-মনন হয়। যুগ যুগ ধরিয়া তীর্থস্থানে পুঞ্জীভূত ভাগবত ভাবরাশি আমাদের মনে জোর করিয়া প্রবেশ করে। আমাদের অধ্যাত্ম উন্নতি সাধনে এইগুলি নিশ্চয় সহায়ক। সাধু-সন্তের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা অপূর্ব ধর্মজ্ঞান লাভ করি। ৺কাশীধাম সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। তথায় শত শত সাধু-ভক্ত বাস করেন। এইরূপে আমরা তাঁহাদের পূত সঙ্গলাভের সুযোগ পাই। তথায় সর্বদা অধ্যাত্ম স্রোত বহিতেছে। গৃহী ভক্তগণও তথায় দেবপূজার নানা সুযোগ পান। একবার তথায় বাস করিলে তীর্থ-মাহাত্ম্য অনুভব করা যায়।

"বৃন্দাবন আর এক তীর্থস্থান। তথায় বহু সাধু দিবারাত্রি ঈশ্বর-চিন্তায় ..... আছেন। ঐসব স্থান তোমাদের দেখা উচিত। কাজের সুযোগ তোমরা চিরকাল পাইবে। ইহা সত্ত্বেও অন্ততঃ একবার সময় করিয়া তীর্থদর্শনে গমন প্রয়োজন। কর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কতগুলি কাজ আমাদিগকে ঈশ্বরমুখী করে। নিষ্কাম কর্ম এই শ্রেণীর অন্তর্গত; কিন্তু নিষ্কাম কর্মও অধ্যাত্মসাধনায় সমধিক সহায়ক হয় না। মনে রাখিও—স্ত্রী-পুত্রাদি যাহাদিগকে তুমি এখন আত্মীয় বল, তাহারা সকলেই ঈশ্বরের। এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইলে তোমার জীবন ঠিক পথে চলিবে। বিপরীত বিশ্বাস রাখিলে বিপরীত ফল ফলিবে ও দুঃখ পাইবে।

"ঈশ্বরের নাম-জপ অতিশয় কল্যাণকর। নাম-জপে চিত্ত শুদ্ধ হয়। নাম-জপ করিবার সময় ইষ্টদেবের সতত স্মরণ করিবে। নাম-জপ ও স্মরণ-মনন দ্বারা প্রভূত কল্যাণ হয়। স্মরণ-মনন ব্যতীত নাম-জপে বেশী ফল হয় না। অবশ্য ইহা সহজ নয়। ইহার জন্য উপদেশ বা মন্ত্রদীক্ষা গুরুর নিকট লইতে হয়। গুরুই তোমার ইষ্টদেবতা এবং অন্যান্য বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। অধ্যাত্ম উন্নতির কৌশল গুরুর নিকট শিখিতে হয়। প্রত্যেকের স্বভাব ও সংস্কার অনুসারে ইষ্টদেবতা নির্বাচিত হন। এক ইষ্টদেব সকলের উপযোগী হন না। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত গুরুবাক্য পালন করিতে হয়। যতই সাধন করিবে ততই শুদ্ধ হইবে। গুরু ব্যতীত ধর্ম-সাধন অত্যন্ত কষ্টকর। অসাধারণ শক্তিশালী শুদ্ধাত্মা ব্যক্তিই কখনও কখনও গুরু ব্যতীত সিদ্ধি লাভ করেন। তথাপি গুরুর নির্দেশে সাধন করাই সহজ। তাহা হইলে ভ্রমে পড়িবার আশঙ্কা থাকে না। গুরু লাভ না করিলেও অলসভাবে বসিয়া থাকা

উচিত নয়। এখনই সাধনভজন আরম্ভ কর। যথাসময়ে গুরু নিশ্চয়ই আসিবেন।

"গুরু শিষ্যকে মনোনীত করিবেন এবং শিষ্যও গুরুকে নির্বাচিত করিবেন। নচেৎ যদি একজন মনোনীত হন তবে তাহা তত শ্রেয়স্কর হয় না। সিদ্ধ গুরুই শিষ্যকে যথার্থ সাহায্য করিতে পারেন। তদ্রূপ গুরুই শিষ্যবৃন্দের সংস্কার-বৈচিত্র্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টদেব নির্বাচনে সমর্থ হন। সাধারণ গুরু তদ্রূপ করিতে পারেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরু অবশ্য যে কোন সময়ে উপদেশ দিতে পারেন। সাধনার জন্য শিষ্য প্রস্তুত হইলেই গুরু স্বতঃই উপস্থিত হন। যতক্ষণ তুমি তদ্রূপ গুরু না পাও ততক্ষণ ঈশ্বরারাধনাই তোমার অবশ্যকর্তব্য। তাহা না করিলে তোমার সময় বৃথা নষ্ট হইবে। অতএব নিষ্ঠা সহকারে প্রত্যহ জপ-ধ্যান ও ভজন করিবে।

"তোমার সমস্ত শক্তি ঐহিক ব্যাপারে ব্যয়িত হয়। ঈশ্বর-চিন্তায় কিছু শক্তি ব্যয় কর। তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইবে। আজ হইতে নিয়মিত ঈশ্বর-চিন্তা আরম্ভ কর। আমাদের জীবন অনিত্য। এই অনিত্য জীবনে আমাদের প্রধানতম কর্তব্য ঈশ্বরোপাসনা। যদি আমরা অন্যভাবে সময় নষ্ট করি, আমরা কদাপি সুযোগ পাইব না। তুমি যে কাজেই নিযুক্ত থাক না কেন, সর্বদাই ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। গৃহকোণে বসিয়া সকালে বা সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ চোখ বুজিলেই যথেষ্ট ধর্মসাধন হয় না। বিষয়-কর্মে ব্যাপৃত থাকার সময়ও ঈশ্বর-চিন্তা অভ্যাস না করিলে জপধ্যানের সময় বিষয়-চিন্তা আসে।

"দ্বৈত-বাদ হইতে সাধনা আরম্ভ করা উচিত। এই পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইবে, স্বভাবতঃই তুমি বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের ভাবরাজ্যে উপনীত হইবে। আমাদের বাহিরে ঈশ্বর দর্শন নিশ্চয়ই সত্যপথ। সাধনপথে অগ্রসর হইলে অন্তরে ঈশ্বর দর্শন হয়। ইহাই শ্রেষ্ঠ ধ্যান। ঈশ্বর কি সর্বব্যাপী নন? বিমলানন্দের আস্বাদ না পাওয়া পর্যন্ত জপধ্যান অভ্যাস কর। ততক্ষণ দ্বৈত-বাদ অবশ্যই প্রয়োজন। সমাধিতে তুমি শুধু ঈশ্বরকেই দেখিবে। আত্মজ্ঞানের স্বরূপ কেহই বাক্যে প্রকাশ করিতে পারে না। যতক্ষণ ঈশ্বর চিন্তা মনে জাগরূক থাকে ততক্ষণ কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ সমাপ্ত হইলে স্বামী নির্মলানন্দ বক্তৃতা করিলেন

ও প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীনারায়ণগুরু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈত আশ্রমের সভ্যবৃন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সংস্কৃত ভাষায় সুলিখিত অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। তৃতীয় দিবসে তিনি স্থানীয় বাজার দেখিতে যান। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সকলে মিলিয়া উত্তম মোটর বোটে জলপথে কোট্টায়ামে গমন করেন। তাঁহাদের বৃহৎ নৌকা দুর্ভাগ্যক্রমে বেম্পানদের ভাঁটা স্রোতে প্রবল ঝড়ে পড়িল ও মধ্য রাত্রে কোট্টায়ামে পৌঁছিল। অবশিষ্ট অর্ধরাত্রি নৌকাতেই কাটাইতে হইল। যে সকল ভক্ত সন্ধ্যা ৬টায় নদীতীরে পূজনীয় স্বামীজিগণকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই ভোর পর্যন্ত সারা রাত্রি তথায় অনাহারে-অনিদ্রায় অপেক্ষা করিলেন। সকাল ছটায় নৌকা হইতে নামিয়া মোটর গাড়ীতে চড়িয়া উক্ত দল শহরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কোট্টায়ামে দুইদিন প্রীতিকর অবস্থানান্তে তাঁহারা হরিপাদে গেলেন। তথায় পূর্ণকুম্ভ, সংকীর্তন, পাল্কী প্রভৃতি আড়ম্বর সহকারে তাঁহাদিগকে যথোচিত সমারোহে অভ্যর্থনার সুব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সকল চমৎকার আয়োজন দেখিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ কৌতুকচ্ছলে স্বামী নির্মলানন্দকে সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই তুলসী, ওখানে আমার বিবাহের ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি?" স্থানীয় দেবীমন্দিরের সম্মুখে তিনি মোটর হইতে নামিয়া হাঁটিয়া আশ্রমে গেলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হরিপাদ দূরবর্তী ক্ষুদ্র গ্রাম। সেইজন্য অনেকে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মানন্দজীকে দুর্গম পল্লীগ্রামে না লইয়া যাওয়াই উচিত; কিন্তু স্বামী নির্মলানন্দ অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে পদার্পণপূর্বক যে মন্তব্য করিলেন তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, নির্মলানন্দ মহারাজের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যথার্থ। আশ্রমে পদার্পণ করিয়াই স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বতঃই বলিলেন, "কি রমণীয় স্থান!" তিনি তথায় চারি দিন বাস করিলেন ও কয়েকটি ভক্তকে দীক্ষা দিলেন। তন্মধ্যে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ, সুব্বা রাও আয়ার প্রভৃতি ভক্তদের নাম মনে আছে। তৎপরে কুইলনে যাওয়া হইল। ডাক্তার তাম্পী তথায় সর্ববিধ আয়োজনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। কুইলনের বৃহত্তম অট্টালিকা,—একটি দ্বিতল নূতন বাসগৃহ, তাঁহাদের ব্যবহারার্থ নির্দিষ্ট ছিল। তথায় দুই দিন মহানন্দে কাটাইয়া তাঁহারা ত্রিবান্দ্রমে গেলেন। ছোট বড় যে স্থানে ব্রহ্মানন্দজী যাইতেন তথায় 'আনন্দের হাট' বসিত ও ধর্মগঙ্গা বহিত! বিদায় দিবসে হরিপাদ আশ্রমে দুই সহস্র নরনারীকে পরিতোষ

সহকারে খাওয়ান হইল। ৮ই ডিসেম্বর সকলে ত্রিবান্দ্রমে উপনীত হইলেন। বেলুড়মঠের প্রথম অধ্যক্ষকে বিরাট সংবর্ধনা দিবার আয়োজনে যাঁহারা সর্বাগ্রণী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ডাঃ টি. পদ্মনাভ পিলে, এম. আর. নারায়ণ পিলে, ডি. কে. ঘোষ, রাম ওয়ারিয়ার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে ডাঃ পদ্মনাভ পিলে কন্যাকুমারিকাতে ব্রহ্মানন্দজীর নিকট দীক্ষা লাভে ধন্য হন।

ত্রিবান্দ্রমে রামকৃষ্ণ আশ্রমের ভিত্তি স্থাপনার্থ সর্ববিধ আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। স্বামী নির্মলানন্দ কর্তৃক পাহাড়ের শিখরদেশেই আশ্রমস্থাপনের জমি নির্বাচিত হয়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মোটরকারে লইয়া যাইবার জন্য নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল। এই পুণ্য অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য কেরলের সর্বাংশ হইতে ভক্তবৃন্দ যথাসময়ে উপস্থিত হন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ দোতলায় স্বমহিমায় বিরাজমান ও আনন্দময় ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে ডি. কে. ঘোষ উপবিষ্ট ছিলেন। মিঃ ঘোষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত কালিপদ ঘোষের পুত্র ও ত্রিবান্দ্রমে মেসার্স ডিকিনসন এ্যাণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে সমগ্র কেরলের ভক্তবৃন্দ, সন্ন্যাসিগণ ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মোটর গাড়ীতে পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রমভূমিতে গমন করিলেন। তথায় একটি সুসজ্জিত সভামণ্ডপ নির্মিত ও তন্মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সকাল ৮টার সময় পূজাদি যথাবিধি সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মানন্দজী আশ্রমের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিলেন। তাঁহারই আশীর্বাদে এই আশ্রম নানা বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য আশ্রমের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তৎকর্তৃক যথার্থ ভিত্তি স্থাপিত হওয়ায় এই আশ্রম দক্ষিণ ভারতের অন্যতম রমণীয় ও দর্শনীয় ধর্মস্থানে পরিণত। স্বামী নির্মলানন্দ পূজনীয় গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিত্তি-স্থাপন অনুষ্ঠানের জন্য আর কি কি দ্রব্য প্রয়োজন ?" ইহাতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সস্মিতবদনে মন্তব্য করিলেন, "ভাই তুলসী, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, বেলুড়মঠে ঠাকুর প্রতিষ্ঠার সময় স্বামীজি মহারাজ শুধু কয়েকটি ফুল ও গঙ্গাজল ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন নাই। এইগুলি লইয়া যদি আমরা ঠাকুরকে আন্তরিক আহ্বান করি তিনি নিশ্চয়ই সাড়া দিবেন এবং সকলের কল্যাণার্থ এখানে স্থায়ী-ভাবে বিরাজ করিবেন।" তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ত্রিবান্দ্রমে তিনখানি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়— একখানি ইংরাজীতে ও দুইখানি সংস্কৃতে। পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি খুব বুড়ো হয়ে পড়েছি। এখন ইউরোপীয় প্রথায় অভিনন্দন গ্রহণ করিতে ও উত্তর দিতে পারি না।" সেইজন্য তিনি প্রস্তরমূর্তিবৎ নিশ্চল ও নীরব রহিলেন। স্বামী নির্মলানন্দই তাঁহার পক্ষে অভিনন্দন পত্রত্রয়ের যথাযথ উত্তর দিলেন।

পরদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বীয় দলসহ কন্যাকুমারিকাতে গেলেন। তথায়ও একটি প্রশস্ত সুন্দর দ্বিতল বাংলো তাঁহাদের নিবাসার্থ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মানন্দজী মোটর গাড়ীতে তথায় পৌছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে আহ্নিক কৃত্যাদি সমাপনান্তে তিনি কুমারিকা দেবীর মন্দিরে গমন পূর্বক মাতৃচরণে পূজার জন্য অর্ঘ্যাদি নিবেদন করেন। পুষ্পমাল্য ও নৈবেদ্যাদি দেবীপদে যথারীতি নিবেদিত হইয়াছিল। মন্দিরমধ্যে মাতৃসমীপে মালা হস্তে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মানন্দজী সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু অসাধারণভাবে শক্তিশালী ও স্বভাবতঃ অর্ধনিমীলিত থাকিত। উক্ত কালে তাঁহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত, পলকশূন্য ও গতিহীন হইল ও দুই উজ্জ্বল নক্ষত্রবৎ সম্যক্ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে তাঁহার মন বাহ্য জগতে ফিরিয়া আসিলে তিনি জগন্মাতার মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন ও বাহিরে আসিয়া প্রবেশ-কক্ষে বসিয়া পূর্বমুখী হইয়া জপ করিলেন। অনন্তর তিনি মন্থর গমনে বাসস্থানে ফিরিলেন। ইহার পর নয়দিন ধরিয়া ব্রহ্মানন্দজী প্রমুখ সকলে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। তন্মধ্যে একদিন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম কয়েক দিবস ও মহাসমাধি সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেন। উক্ত তীর্থে তিনি কুমারী পূজা, কুমারী ভোজন ও কুমারীগণকে বস্ত্রাদি দান করিলেন।

যখনই স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাহিরে যাইতেন তখনই দুর্গত নরনারীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি নির্মলানন্দজীর দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে তাকাইতেন। আর নির্মলানন্দজী উন্মুক্ত মণিব্যাগে হাত দিয়া টাকা-পয়সা লইতেন এবং মুক্ত হস্তে দণ্ডায়মান দুর্গতদিগকে দান করিতেন। কন্যাকুমারিকাতে অবস্থানকালে তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় কুমারী দেবীর মন্দিরে যাইতেন এবং জগন্মাতার সম্মুখে ভাবাবেশে উপবিষ্ট হইয়া সঙ্গী সাধুদিগকে

প্রায়ই ভজন গাহিতে বলিতেন। কখনও কখনও তিনি ভাবাবেশে দেবীর সঙ্গে কথা বলিতেন এবং হাততালি দিয়া ডাকিতেন, মা, মা, মা। উক্ত তীর্থ হইতে বিদায় লইবার পূর্বদিন তিনি স্বামী সুখানন্দ, কৃষ্ণ আয়ার প্রভৃতি অনেক ভাগ্যবান ভক্তকে দীক্ষা দেন। দীক্ষা প্রার্থীদিগের যোগ্যতা বিচার না করিয়া তিনি সর্বপ্রথম এখানেই নির্বিচারে কৃপাবারি বর্ষণ করেন। গুরুভ্রাতা নির্মলানন্দজীর উপর তিনি দীক্ষাপ্রার্থী নির্বাচনের ভার দিয়াছিলেন। সিঁড়ির নিচে দাঁড়াইয়া স্বামী শংকরানন্দ এক এক করিয়া দীক্ষার্থীদিগকে দোতলায় ব্রহ্মানন্দজীর নিকট লইয়া গেলেন ও দীক্ষিত করাইলেন। কুমারিকা দেবী কর্তৃক প্রদত্ত কৃপামৃত তিনি প্রেমাস্পদ গুরুভ্রাতা নির্মলানন্দের ইচ্ছাক্রমে অকুণ্ঠচিত্তে সকলকে বিতরণ করিলেন। সাধারণতঃ তিনি দীক্ষাদানে সহজে সম্মত হইতেন না। যথেষ্ট বিবেচনা ও বিচারান্তে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিতেন। কখনও কখনও অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতা প্রেমানন্দজী প্রভৃতির সনির্বন্ধ অনুরোধও নিষ্ফল হইত! স্বভাবতঃ তিনি একটির অধিক ভক্তকে একসঙ্গে দীক্ষা দিতেন না; কিন্তু উক্ত তীর্থে তিনি দীক্ষার্থীদের সম্বন্ধে কোন কিছু না জানিয়াই সকলকে অকাতরভাবে কৃপা করিলেন। আবার দীক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশ গৃহীভক্ত ছিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ ও তাঁহার বিচারশক্তিকে ব্রহ্মানন্দজী যে কত বিশ্বাস করিতেন তাহার প্রমাণ ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? স্বামী ব্রহ্মানন্দ কতিপয় দীক্ষিত ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের সাধনে যখন কোন সন্দেহ বা বিঘ্ন আসিবে তখন তুলসী মহারাজের উপদেশ লইবে।" স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহার তীর্থ ভ্রমণের যে সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হন। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণে কোন রাজ্যেশ্বরও অধিকতর সুখ-সুবিধা বা সপ্রেম সেবা পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। ইহা যেন জগন্মাতার প্রিয়তম পুত্রকে তীর্থভ্রমণে সযত্নে লইয়া যাওয়া হইতেছে! প্রথমদিন হইতে শেষদিন পর্যন্ত এই সমগ্র তীর্থযাত্রা অতিশয় সুখকর ও আরামপ্রদ হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই কার্যের জন্য স্বামী নির্মলানন্দ ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সরলভাবে বলিয়াছিলেন, "এই সময় গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দজীর সেবা-শুশ্রূষাই আমার সাধনা, তাঁহার সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখাই আমার লক্ষ্য ছিল।" স্বামী নির্মলানন্দ প্রতি মুহূর্তে এই লক্ষ্যসাধনে অনলস ও সচেতন ছিলেন এবং গুরুভ্রাতার সেবার্থ সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন।

এক কথায়, তিনি গুরুপুত্রকে এই যাত্রায় গুরুবৎ সেবাযত্ন করেন। কোন শিষ্যকে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইনিই জীবন্ত দেবতা, সাক্ষাৎ ঠাকুর। ইঁহার সেবা করিয়া ধন্য হও।" নির্মলানন্দজীর সাধনা যেরূপ কঠোর হইয়াছিল সিদ্ধিও তদ্রূপ বিপুল হইল। সমগ্র ভ্রমণে ব্রহ্মানন্দজী সম্যক্ প্রসন্ন ছিলেন। ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত ও আশ্রম তীর্থে পরিণত হইল। মাতৃতীর্থে মাতা ও সন্তানবৃন্দের মধুর মিলন ঘটিল ও বহু ভক্ত দীক্ষালাভ করিলেন। যুগাবতারের মানসপুত্রের দর্শনে বহু লোক ধন্য হইল। পরশুরাম ক্ষেত্রও তীর্থীকৃত হইল। এইরূপে স্বামী নির্মলানন্দ বার বার কঠোর তপস্যার হোমানলে আত্মাহুতি দিলেন। কিন্তু এই তপস্যা নিজের জন্য নহে; ইহা দক্ষিণ ভারতের দরিদ্র, অজ্ঞ ও অসহায় নরনারীদের কল্যাণসাধনার্থ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বীয় দলসহ কন্যাকুমারিকা ত্যাগ করিয়া নাগরকোইলে বিশ্রামপূর্বক কুইলনে যাইয়া কয়েক দিবস অবস্থান করিলেন।

স্বামী নির্মলানন্দের ভক্তপ্রীতি এবং তদ্বাক্যের মূল্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ কত অধিক দিতেন তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনা উল্লিখিত হইতেছে। কুইলনে স্থির হইল যে, এক শুভ দিনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কয়েকটি ভক্তকে দীক্ষা-দান করিবেন। নির্দিষ্ট দিবসে স্বামী নির্মলানন্দজীকে স্বামী শংকরানন্দ জানাইলেন যে, ব্রহ্মানন্দজীর শরীর অসুস্থ হওয়ায় নির্ধারিত দীক্ষাদান বন্ধ থাকিবে। এই অশুভ সংবাদ শুনিয়া স্বামী নির্মলানন্দ অত্যন্ত গম্ভীর হইলেন ও স্বগত মন্তব্য করিলেন, "কয়েকটি খাঁটি ভক্তকে শুধু দীক্ষা দিতেও মহারাজ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।" অবিলম্বে তিনি শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতার নিকটে যাইয়া ভক্তগণকে দীক্ষাদানার্থ কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্মত হইয়া নির্মলানন্দজীর সহিত বাহিরে আসিলেন এবং যে ঘরে দীক্ষাদানের আয়োজন হইয়াছিল তথায় গেলেন এবং স্বামী নির্মলানন্দ কর্তৃক নির্বাচিত ভক্তগণকে দীক্ষা দিলেন। সেদিন যাঁহারা দীক্ষিত হইলেন তন্মধ্যে কৃষ্ণন নাম্বিয়াথিরী (পরে স্বামী আগমানন্দ), চন্দ্রশেখরম্ পিল্লে ও পি. শেষাদ্রি আয়ার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ ডিসেম্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দজী স্বদলসহ কুইলন ত্যাগ করিয়া আম্বালাপাজাই ও এর্ণাকুলম স্পর্শ করিয়া ব্যাঙ্গালোরের ট্রেণে উঠিলেন।

ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বামী নির্মলানন্দ ব্রহ্মানন্দজীর প্রত্যা-

গমনের সুব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। এর্ণাকুলম্ হইতে কুন্হী রমণ মেনন উক্ত সাধুবৃন্দের সেবার ভার লইলেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাকে এর্ণাকুলমে তাঁহাদের উপস্থিতির তারিখ ও সময় তারযোগে জানাইয়াছিলেন। সাধুগণ এর্ণাকুলমে এক রাত্রি কাটাইলেন ও পরদিন প্রাতঃকালে মেল ট্রেণ ধরিলেন। কুন্হী রমণ মেনন শোরানুর পর্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহার সহিত যে কৌতুক করিলেন তাহা ছদ্মবেশে আশীষ তুল্য হইল। কুন্হী রমণের হাতে সুন্দর বাস্কেট ছিল। ইহাতে স্বামী নির্মলানন্দের শুভদৃষ্টি পড়িল। মেল ট্রেণ শোরানুর ছাড়িবার পরে তিনি একবার বাস্কেটের প্রতি ও একবার মেননের মুখের দিকে পর পর তাকাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ চলিল। অনন্তর স্বামী ব্রহ্মানন্দের মনোযোগ ইহার দিকে আকর্ষণ করিয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ, কুন্হী রমণের হাতে একটি সুন্দর বাস্কেট দেখুন।" ব্রহ্মানন্দজী তখন কোন কিছু পড়িতেছিলেন। তিনি মাথা তুলিয়া তাকাইলেন ও সহাস্যে বলিলেন, "কুন্হী রমণ, ঐ বাস্কেটটি আমাদের দরকার।" কুন্হী রমণও অসাধারণ গুরুভক্ত ছিলেন। তিনি সত্বর উত্তর দিলেন, "হাঁ, মহারাজ, ইহা নিশ্চয়ই আপনার।" এই কথা বলিয়া তিনি বাস্কেট হইতে স্বীয় দ্রব্যাদি তুলিয়া লইলেন ও বাস্কেটটি মহারাজের সামনে রাখিলেন। ইহাতে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অতিশয় আমোদিত হইলেন এবং তুলসী মহারাজও মহানন্দে হাসিতে লাগিলেন।

ট্রেণ ওট্টাপালমে পৌঁছিল। তথায় শিষ্যবৃন্দ ও ভক্তগণ পূজ্যপাদ সংঘ-গুরুকে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনার্থ সমবেত হইয়াছেন। তন্মধ্যে কুন্হী রমণ নায়ার স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্য কয়েকখানি দেশীয় ইড্লি (পিষ্টক) আনিয়াছেন। উহা চিনি, নারিকেল ও মসলা সহযোগে প্রস্তুত। স্বামী ব্রহ্মানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এনেছ?" এই কথা বলিয়া তিনি বালকের ন্যায় একটি বড় পিঠা লইলেন এবং ইহার সবখানি খাইয়া ফেলিলেন। কেরল প্রদেশে ইহাই তাঁহার শেষ আহার। এইরূপে ইহা ঘটিল যে, কেরল প্রদেশে সর্বস্থানের মধ্যে ওট্টাপালমই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে প্রথম ও শেষ ভিক্ষা দান করে। স্বামী নির্মলানন্দ ব্রহ্মানন্দজীকে লইয়া ব্যাঙ্গালোরে ফিরিলেন। তথায় কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা মাদ্রাজ হইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ব্যাঙ্গালোর আশ্রম হইতে চলিয়া আসিবার পূর্বদিন স্বামী

ব্রহ্মানন্দ অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ্ রাওসাহেব চেন্নাইয়াকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন। এই ভক্তবর মহীশূরে ও কুর্গে রামকৃষ্ণ আন্দোলনের অন্যতম অগ্রগণ্য ভক্ত সেবক ছিলেন।

বিশ

আন্দোলন বর্ধমান

সযত্নে স্বামী নির্মলানন্দ ত্রিবান্দ্রমে পরিকল্পিত বিরাট আশ্রম স্থাপনার্থ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন। উহার ভূমি সুন্দর ও সমতল করিলেন এবং মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করিলেন। সংঘ-গুরু ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক ইহার ভিত্তি স্থাপিত হইল। সম্প্রতি স্থাপিত ভিত্তির উপর আশ্রম স্থাপনের আগ্রহ স্বামী নির্মলানন্দকে অভিভূত করিল। যাঁহার পূত হস্ত দ্বারা ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে ও যাঁহার শুভ নামে আশ্রম অভিহিত হইতেছে তাঁহাদের মর্যাদার উপযোগী গৃহের সৌন্দর্য ও বিশালত্ব ও স্থাপত্য সম্পাদন আবশ্যক। এই আশ্রম যেন সর্বপ্রকার বৃষ্টি-বাত্যাদি সহ্য করে এবং অন্ততঃ কয়েক পুরুষ স্থায়ী হয়। আমাদের পরবর্তী বংশধরগণ যেন ইহাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এক সাক্ষাৎ শিষ্যের অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভরূপে স্মরণ করিতে পারে; তমসাচ্ছন্ন সংসার-সাগরে নিমজ্জিত নরনারীগণের উপর গগন-স্পর্শী আলোক-স্তম্ভরূপে ইহা যেন জ্ঞানালোক বিকীরণে সমর্থ হয়। অদ্যাবধি যে কোন স্থানে আশ্রম গৃহের নির্মাণকার্য স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও জনসাধারণের প্রধান কর্তব্য হইয়াছে। ইহাতে স্বামী নির্মলানন্দ কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু ত্রিবান্দ্রম আশ্রমের গৃহ-নির্মাণ কার্য অন্যরূপ হইল। তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ উহার প্রথম প্রস্তর স্থাপনে সম্মত হন। ইহার নির্মাণ শেষ পর্যন্ত পরিচালনা করা স্বামী নির্মলানন্দ স্বয়ং নৈতিক দায়িত্বরূপে গ্রহণ করিলেন। এই মহৎ কর্মে তিনি সর্বান্তঃকরণে ব্যাপৃত হইলেন। প্রথমে ইহার ব্যয়-পরিমাণ যে কয়েক হাজার টাকা বলিয়া আন্দাজ করা গিয়াছিল তাহা মধ্যবিত্ত জনসাধারণ হইতে সংগৃহীত হয়। কোন লক্ষপতি এই তহবিলে এককালে প্রচুর অর্থ দান করেন নাই। দুই টাকা বা তিন টাকা বা তদপেক্ষা অল্প অর্থ বহুজনের নিকট হইতে অনেক বৎসর যাবৎ তুলিয়া আবশ্যকীয় অর্থ

সংগ্রহ হয়। স্বামী নির্মলানন্দ স্বয়ং অর্থ-সংগ্রহার্থ নানাস্থানে যাইতেন। এই কার্যে তাঁহার বন্ধুবর্গ ও ভক্তবৃন্দ যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। তন্মধ্যে ফরেষ্ট অফিসার সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও ডাক্তার তাম্পি ও তাঁহার ভাই পদ্মনাভন তাম্পি (পরে স্বামী পরানন্দ), নারায়ণ পিলে. কৃষ্ণ পিলে, কুন্হী রমণ মেনন, গোবিন্দ পিলে, শংকর মেনন (পরে স্বামী অম্বানন্দ) প্রভৃতি বহু ভক্ত অর্থ সংগ্রহে ও আশ্রম নির্মাণে নানাভাবে যথাসাধ্য সহায়তা করেন। এইজন্য প্রায়ই দীর্ঘ সময় ধরিয়া স্বামী নির্মলানন্দকে ত্রিবান্দ্রমে থাকিতে হইত। পূর্বে তিনি সাধারণতঃ বৎসরে একবার মাত্র কেরলে যাইতেন, এখন বৎসরে দুই-তিনবার কেরলে তাঁহার যাইবার প্রয়োজন হইল।

অন্যদিকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আশ্রমগুলিকে ও ভক্তবৃন্দকে ভুলিতে পারিলেন না। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই তিনি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সর্বদা ভ্রাম্যমাণ—ব্যাঙ্গালোর হইতে ত্রিবান্দ্রম, ত্রিবান্দ্রম হইতে বোম্বাই, বোম্বাই হইতে বেনারস, বেনারস হইতে বেলুড়মঠ এবং বেলুড়মঠ হইতে আবার ব্যাঙ্গালোরে। যদিও দক্ষিণ ভারত তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল, তথাপি নিখিল ভারত তাঁহার কর্মক্ষেত্রে পরিণত হইল। অবশ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে তাঁহার কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও মিশনের নাম উত্তর ভারতে ইতোমধ্যে সুপরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই স্থানে স্বামী নির্মলানন্দের কার্য ছিল পূর্বসৃষ্ট ভাবধারার পুষ্টি সাধন ও ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মালোক বিকীরণ। আর দক্ষিণ ভারতে ক্ষেত্রসৃষ্টি, আশ্রম স্থাপন ও চালন, জনসাধারণের মধ্যে ধর্মজাগরণ এবং ব্যক্তিগত জীবনগঠনাদি কার্য তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। একই সময়ে তাঁহাকে বিশাল ক্ষেত্রের সর্বদিকে সমনস্ক দৃষ্টিপাত করিতে হইত। এই জটিল সূক্ষ্ম যন্ত্রের বহু চাবির উপর তিনি তাঁহার সুনিপুণ হস্তদ্বয় অনায়াসে স্থাপন করিতেন।

স্বামী নির্মলানন্দ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সহিত মাদ্রাজ পর্যন্ত গেলেন ও তথা হইতে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে পড়িলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে তিনি পুনরায় ত্রিবান্দ্রমে যান ও প্রায় অক্টোবর পর্যন্ত থাকেন। এই সময়ে তথায় তিনি আশ্রম নির্মাণ এবং তৎসঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ, সমবেত ধ্যানাভ্যাস, শাস্ত্রশিক্ষা ও পল্লীভ্রমণাদি নানা কার্যে ব্যাপৃত রহিলেন। ঐ সময় ও পরবর্তী কালে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাঁহার আলোচনা কথনও

মর্মস্পর্শী, কখনও হর্ষোৎপাদক ; কিন্তু সর্বদা চিত্তাকর্ষক হইত। তিনি অসংখ্য কৌতুক আখ্যান, ঘটনা ও কাহিনী জানিতেন। তিনি এখন ভক্ত, তখন জ্ঞানী, বাহিরে সর্বদা কর্মযোগী, অথচ অন্তরে সতত পূর্ণ রাজযোগী। উক্ত কালে ত্রিবান্দ্রমে একদিন কোন দর্শক জিজ্ঞাসু তাঁহার নিকটে আসিলেন। সেই দর্শক যোগসাধনার পক্ষপাতী ছিলেন ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নষ্ট ব্রহ্মচর্য কিরূপে পুনরুদ্ধার করা যায়?" স্বামী নির্মলানন্দ সরলভাবে উত্তর দিলেন, "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, যদি তুমি পশ্চিম দিকের বিপরীত মুখে চলিতে চাও, তোমাকে পশ্চিমের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে হইবে না। শুধু পূর্ব মুখে চলিলেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সেইরূপ, যদি তুমি অসৎ পরিহারে সংকল্প কর, সৎ অভিমুখে চল। তোমার মনকে সৎ চিন্তায় পূর্ণ কর, সৎ ও শুদ্ধ বিষয় আলোচনা কর এবং কেবল সৎকর্ম কর।" উক্ত জিজ্ঞাসু স্বীয় বিষয় পুনরায় উপস্থাপন পূর্বক স্বামীজির নিকট জানিতে চাহিলেন, কিরূপে তাহার নষ্ট ওজঃ পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। স্বামী নির্মলানন্দ জোর দিয়া জবাব দিলেন, "আমি জানি, তুমি কি চাও। তোমার শারীরিক পরিবর্তনার্থ তুমি কোন ব্যবস্থা-পত্র চাও। উহাতে কোন ফল হইবে না। ইহা সত্ত্বেও মন ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য লালায়িত হইবে। তাহা ছাড়া, যে সকল ঔষধে ও অভ্যাসে দেহস্থ ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া পড়ে, তাহাতে দুরারোগ্য ব্যাধিও সৃষ্টি হয়। সুতরাং মনকে শুদ্ধ কর, ঈশ্বরের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাও। তাহা হইলে তুমি কৃতকার্য হইবে।" ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া স্বামী নির্মলানন্দের মনে পড়িল বীরভক্ত ব্রহ্মচারী হনুমানের কথা। ইহাতে তাঁহার ভাব উদ্দীপিত ও মন উত্তেজিত হইল। তিনি বলিলেন, "ব্রহ্মচারীবরিষ্ঠ ভক্তবীর জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হনুমানের বীর্যের তুলনায় যোগীর শক্তি নগণ্য! এক লাফে তিনি সমুদ্র পার হইলেন ; আর স্বয়ং ঈশ্বরাবতারকে লঙ্কায় যাইবার জন্য সেতুবন্ধন করিতে হইল! দেখ, তাঁর কত শক্তি ছিল! তিনি কি এই প্রকার যোগাভ্যাস করিতেন? উহা কি যোগসিদ্ধি, না প্রেমাভক্তি? রাজ্যাভিষেকের পর সীতাসহ রাম সিংহাসনে অধিরূঢ় আছেন। রামচন্দ্রের ভ্রাতৃবৃন্দ ও হনুমান প্রমুখ ভক্তবৃন্দ তৎপরিচর্যায় নিযুক্ত। রাম তাঁহার অনুচরবৃন্দকে বহুমূল্য উপহার বিতরণ করিতেছেন। সর্বশেষে হনুমানের ডাক পড়িল। রামের গলায় যে মুক্তাহার শোভা পাইতেছিল তাহা তিনি হনুমানকে দিলেন। লক্ষ্মণ মনে করিলেন,

এই অসভ্য বানর কিরূপে এই উপহারের মর্যাদা বুঝিবে? মনে হইল, যেন লক্ষ্মণের চিন্তা ব্যক্ত করতেই হনুমান উক্ত হারের এক একটি মুক্তা দাঁতে কামড়াইয়া ও উহার মধ্যে কি থাকে দেখিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া লক্ষ্মণের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। রাম ইহা লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, এই অত্যদ্ভুত আচরণের কারণ হনুমানকে জিজ্ঞাসা কর। লক্ষ্মণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া হনুমান করযোড়ে বলিলেন, 'কেন? এই মুক্তাগুলির মধ্যে আমি রামের সন্ধান করিতেছি ও রামকে তন্মধ্যে দেখিতে না পাইয়া ফেলিয়া দিতেছি। যাতে রাম নাই আমার কাছে তার মূল্য নাই। আমি ওরূপ জিনিষ রাখিতে চাই না।' তখন অবজ্ঞাভরে লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহলে তোমার শরীর কেন রেখেছ? তার মধ্যে কি রাম আছে?' তখন রামসীতাপ্রমুখ বরেণ্যবৃন্দের সম্মুখে হনুমান বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া বলিলেন, 'এখন দেখুন।' সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, হনুমানের প্রশস্ত হৃদয়ের পদ্মোপরি রাম ও সীতা দিব্য শোভায় বিরাজমান।"

কথা অনুযায়ী স্বামী নির্মলানন্দ কার্যও করিতেছিলেন। বর্ণনাকালে শ্রোতৃবৃন্দ সত্যই দেখিলেন নির্মলানন্দের পরিবর্তে হনুমান ও তাঁহার উন্মুক্ত হৃৎপদ্মে রাম ও সীতা। স্বামীজি এত সম্যক্ প্রকারে রূপান্তরিত ও হনুমানের সহিত একীভূত হইয়াছিলেন যে, হনুমানের রামভক্তি তন্মধ্যে প্রকটিত হইল। তাঁহার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিয়া প্রেমাশ্রু ঝরিতে লাগিল এবং তিনি অলৌকিক দিব্যভাবে অভিভূত হইলেন। যখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার হৃদয়-সর্বস্ব সর্ব সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছেন, তিনি গাত্রোত্থান পূর্বক দ্রুতপদে স্বীয় কক্ষে ঢুকিলেন ও দরজা বন্ধ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং পূর্ববৎ শান্ত সৌম্য মুখে ভক্ত সঙ্গে বিরাজ করিলেন। অনন্তর তিনি গম্ভীরভাবে মন্তব্য করিলেন, "স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান যুগের হনুমান। তোমরা কি জাননা যে, পাশ্চাত্য জগতে গমন করিবার পূর্বে স্বামীজি সংঘ-জননী সারদাদেবীকে লিখিয়াছিলেন, 'যেমন মহাবীর রামের আংটি লইয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন, তেমনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যুগবাণী প্রচারার্থ আমি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে যাইতে ইচ্ছা করি।'" তাঁহার বিশাল বীরহৃদয়ে প্রেম-সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইতেছিল। ক্বচিৎ কোন ভাগ্যবান্ সেই প্রেমতরঙ্গের এক-আধটি অবলোকন করিয়াছেন। যখন তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে কেরল প্রদেশে

লইয়া যাইতেছিলেন উক্ত দলে প্রাচীন ভক্ত শ্রীকুমুদবন্ধু সেন ছিলেন। কুমুদবাবু বরাহনগর মঠের আমল হইতে স্বামী নির্মলানন্দকে জানিতেন। উভয়ে ট্রেণের একই কামরায় যাইতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কুমুদবাবু বলেন, "আমরা স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের পুরাতন স্মৃতিকথা আলোচনা করিতেছিলাম। আমরা যখন একত্রে ছিলাম এবং অন্য কেহ আমাদের সঙ্গে ছিল না, তখন তুলসী মহারাজ গিরিশ ঘোষ রচিত একটি মধুর রাধাকৃষ্ণ সঙ্গীত প্রাণ ঢালিয়া গাহিলেন। তখন তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অবিরত ভক্তিবারি পড়িতে লাগিল এবং তিনি ভাবাবিষ্ট হইলেন। আশ্চর্যের বিষয়, আমি তাঁহাকে সংযমী পুরুষ বলিয়াই জানি। তিনি এত চাপা সাধু হইয়াও ভাবাবেগ ও আনন্দাশ্রু চাপিতে পারিলেন না। জ্ঞানের আবরণে ভক্তি গোপন করিতে ইঁহারা আজন্ম অভ্যস্ত।"

ত্রিবান্দ্রমে কয়েক মাস কাটাইয়া এবং নির্মাণ-কার্যের সর্ব অংশে প্রেরণা দিয়া স্বামী নির্মলানন্দ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর মালাবারে গেলেন। কুন্হী রমণের ভাষায় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই স্বামীজি জানিতে পারিলেন, মালাবারের কর্মক্ষেত্রে কোথায় অধিক ও কোথায় অল্প মনোযোগ দিতে হইবে। তেলিচেরী মালাবারস্থ তিনটি প্রধান শহরের অন্যতম ছিল। স্বামী নির্মলানন্দ এই স্থান পছন্দ করিতেন এবং প্রায় প্রতি বৎসর তথায় যাইতেন। তথাকার অবস্থা এমন প্রতিকূল ছিল যে, তিনি তথায় উল্লেখযোগ্য স্থায়ী ফল আশা করেন নাই। কালিকটে বাণিজ্যপ্রভাব প্রবল থাকায় তথায় ধর্ম হয় দাঁড়াইবে না, না হয় অতি ধীরে দাঁড়াইবে। তথাপি উহা স্থানীয় জেলার প্রধান শহর ও মূল কেন্দ্র বলিয়া স্বামীজি তথায় কিছু করিতে চাহিলেন। সেই সময়ে তিনি যোগ্য কর্মী না পাইয়া কাজ বন্ধ রাখিলেন ও শুভদিনের অপেক্ষা করিলেন। আকাঙ্ক্ষিত শুভদিন অবশ্য অচিরে আসিল। আর একটি প্রধান শহর পাল-ঘাট তাঁহার নিকট ধূলিবৎ শুষ্ক মনে হইল। প্রথম হইতেই ওট্টাপালম্ তিনি খুবই পছন্দ করিলেন এবং দুই তিনবার যাইবার পরই মন্তব্য করিলেন, "যেমন শিকারী কুকুর শিকারের গন্ধ পায়, তেমনি তিনি এখানে একটি আশ্রমের সম্ভাবনা দেখিতেছেন।" মালাবারে এই সকল ও অন্যান্য বহু স্থান তিনি পরিদর্শন করিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন সেখানে অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করিতেন। উহা যথাকালে অনেকের জীবন স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত করিত।

অসীম উৎসাহ ও অশেষ উত্তম সহকারে তিনি সর্বত্র অভ্যর্থিত হইতেন। তবে উত্তর মালাবারে তিনি যেরূপ রাজোচিত অভ্যর্থনা লাভ করেন তদ্রূপ অন্যত্র কোথাও পান নাই। মাহে নদীর চার মাইল দূরে রাইরথ নামক স্থানে মহাকবি কুট্টমথের বাসগৃহেও তিনি গমন করেন। মাহে নদীতে নৌকায় চড়িয়া তিনি প্রায়ই সন্ধ্যাকালে রাইরথে উপস্থিত হইতেন। রাজকীয় জাঁক-জমক, সুসজ্জিত হস্তী, আলোকসজ্জা, বাজী পোড়ান প্রভৃতি সমারোহে তিনি তথায় সংবর্ধিত হইতেন। গৃহকর্তা কৃষ্ণ কুরুপ আদৌ ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন না। কৃষ্ণ কুরুপ সরলভাবে বলিতেন, 'আমি ধর্ম বুঝি না।' তিনি স্বামী নির্মলানন্দকে ধর্মজ্ঞ সন্ন্যাসীরূপে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন না। তিনি নিজে একজন সাহসী স্পষ্টবাদী ও বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন এবং তাঁহার ব্যবসায়-সামর্থ্য ও পরিচালনশক্তি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি যে সকল সদ্‌গুণ ভালবাসিতেন ও প্রশংসা করিতেন, স্বামী নির্মলানন্দকে সেই সকল সদ্‌গুণের প্রতিমূর্তি দেখিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন ; যদিও তিনি কখনও ধর্মানুষ্ঠানে অগ্রণী হইতেন না, তথাপি স্বামীজির সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ধর্মভাব উদ্বুদ্ধ হয় এবং তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কেশব কুরুপ কাহাকেও না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

কেরল প্রদেশে নানা স্থানে ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া স্বামী নির্মলানন্দ উক্ত বর্ষের শেষভাগে ব্যাঙ্গালোরে ফিরিলেন। ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত ও যথারীতি পরিচালিত হইতেছিল। ধর্মসভা, সাপ্তাহিক ভজন, জন্মোৎসব সমূহ এবং অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠান পূর্ববৎ চলিতেছিল। প্রত্যেক উৎসবে স্বামীজি সমস্ত প্রধান কেন্দ্র ও বিশিষ্ট ভক্তদের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছিলেন। অসংখ্য ব্যক্তির সহিত তাঁহাকে পত্র ব্যবহার করিতে হইত। সব পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ও উত্তর দান করিতে তিনি কখনও ভুলিতেন না। তাঁহার চরিত্রের এই সদ্‌গুণ লক্ষ্যণীয় ছিল যে, তিনি শেষ পর্যন্ত হাই স্কুলের ছাত্রের মত সুস্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে লিখিতে পারিতেন। প্রত্যেক শব্দের প্রত্যেক অক্ষরটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার ভাবে লেখা হইত। এই অভ্যাস বয়োবৃদ্ধি বা কর্মব্যস্ততা দ্বারা কদাপি ব্যাহত হয় নাই।

পরবর্তী বৎসর আবার তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন। নানা স্থানে বাৎসরিক পরিদর্শন নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ন্যায় তাঁহার পরিদর্শন আনন্দদায়ক ও প্রেরণাপ্রদ হইত। এই বৎসর তিনি কুর্গেও গেলেন।

কুইল্যাণ্ডিতে ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে জন্মোৎসব সমূহে যোগদান করিলেন এবং যখন তিনি কুইলনে পৌঁছিলেন তখন তাঁহার শরীর এত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িল যে জুন মাসের মধ্যভাগে মাদ্রাজ হইয়া সত্বর ব্যাঙ্গালোরে ফিরিলেন। আবার সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ত্রিবান্দ্রমে গেলেন এবং ডাঃ তাম্পী ও তাঁহার পরিজনবর্গকে বড়দিনের সময় ব্যাঙ্গালোরে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। ডাঃ তাম্পী সানন্দে এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "এমন অতিথিপরায়ণ মানুষ আমি দেখি নাই। অতিথিদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ও তাঁহাদিগকে আরাম-দানের আগ্রহ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।" যিনি একবারও দুই একদিনের জন্য স্বামীজির আতিথ্য গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তিনি ইহা অবশ্য স্বীকার করিবেন। একদা স্বামী যতীশ্বরানন্দ স্বতস্ফূর্ত অভিমত প্রকাশ করেন, "আসল আতিথেয়তা আমি পূজনীয় তুলসী মহারাজের নিকট শিক্ষা করিয়াছি।" ছোট বড় সকল অতিথির জন্য তিনি স্বহস্তে চা, কফি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন এবং তাঁহাদের রুচিকর আহার্য সর্বদা যোগাইতেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত তিনি তাঁহাদের সুবিধা-অসুবিধা বুঝিতেন এবং তাঁহাদের সর্ববিধ সন্তোষবিধানে যত্নশীল হইতেন। তিনি অতিথিপূজা সম্বন্ধে ভাষণ বা উপদেশ না দিলেও গৃহস্থগণ ও সন্ন্যাসীবৃন্দকে অতিথিপরায়ণতার অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। অতিথিপরায়ণতা তাঁহার মজ্জাগত ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তরুণ শিষ্যবৃন্দ যখন তুলসী মহারাজের গৃহে আসিতেন তখন উক্ত বাড়ীর পরিজনবর্গ কিরূপে তাঁহাদের সেবা যত্ন করিতেন তাহা পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে তিনি পুনরায় ব্যাঙ্গালোর ছাড়িয়া ভ্রমণে বাহির হন। শঙ্কর ওয়ারিয়ার নামক বি. এ. উপাধিধারী একটি খ্রীষ্টান যুবককে হিন্দুধর্মে পুনর্গ্রহণই এই ভ্রমণের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও শঙ্কর খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তথাপি তিনি হিন্দু সমাজে পুনঃ প্রবেশের ইচ্ছা করিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে স্বামী নির্মলানন্দের কাছে উপস্থিত হইলেন। যথারীতি বৈদিক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠানান্তে তিনি পুনর্গৃহীত হইলেন। এই বার তিনি দক্ষিণ কানাড়ায় ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত ভ্রমণ করিলেন এবং পথে প্রধান প্রধান কেন্দ্রসমূহে নামিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই জুন সালেমে বি. ভি. নামগিরি আয়ার কর্তৃক প্রদত্ত জমির উপর তিনি আশ্রমের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিলেন

ও তারপর ব্যাঙ্গালোরে ফিরিলেন। ৩রা আগষ্ট ব্যাঙ্গালোরে একটি ছাত্র-নিবাস খোলা হইল। উহাতে তেরটি দরিদ্র স্কুলছাত্রকে আহার, বাসস্থান ও ধর্মশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রনিবাসের কয়েকজন স্থানীয় ন্যাশন্যাল কালচার ইনষ্টিটিউটে যোগদান করিত। স্বামী নির্মলানন্দ তাহাদের জন্য ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে প্যারালাল ও হোরাইজণ্টাল বার স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং ছাত্রদিগকে দৈহিক ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। এই সঙ্গে তাঁহাকে পাকশালার শ্রমসাধ্য কার্যও করিতে হইত। দুই মাস যাবৎ একটি পাচক বা পরিচারক ব্যতীত ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের রান্নাদি কার্য একক আয়াসে তিনি চালাইয়াছেন; কিন্তু উহা দ্বারা তাঁহার অন্যান্য কার্যকে তিনি ব্যাহত হইতে দেন নাই। ১২ই আগষ্ট তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ওট্টাপালমের স্ত্রী ভক্তদের অনুরোধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—অদূর ভবিষ্যতে ব্যাঙ্গালোর হইতে বাহিরে যাইবার কোন সম্ভাবনা এখন আমার নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, প্রায় তিন মাস যাবৎ আমাদের আশ্রমে কোন পাচক নাই। আমরা দুইটি স্বামী এখন এখানে থাকি। তন্মধ্যে একজন সকালে ও সন্ধ্যায় ঠাকুরের পূজারতি প্রভৃতি করে। এতদ্ব্যতীত বাজার করা, দোকানে জিনিষ কেনা এবং অন্যান্য বাহিরের কাজ এত তাহাকে করিতে হয় যে তাহার সংখ্যা নাই। আমি নিজেই রান্না করা, তরকারী কুটা, বাসন মাজা প্রভৃতি রান্নাঘরের যাবতীয় কার্য সকাল ৮টা হইতে ১২টা পর্যন্ত করি এবং আবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত একই কার্যে প্রত্যহ ব্যাপৃত থাকি। আমার কাছে যে সব চিঠি আসে সেগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিতেও অবসর পাই না। তাহা ছাড়া এখন কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি নৈসর্গিক দুর্ঘটনা এবং তদুপরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতেছে। সুতরাং একদল স্ত্রীভক্তের পক্ষে এখন কলিকাতায় যাওয়া আমি আদৌ সমীচীন মনে করি না। এই সমস্ত কারণ ও সমগ্র অবস্থা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবে। আমি তাহাদিগকে লইয়া যাইতে অনিচ্ছুক নহি; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে ব্যাঙ্গালোর ত্যাগ করা উচিত নহে। অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আর লিখিতে পারি না।"

অক্টোবর মাসে মাহের নিকটবর্তী রাইরথ স্থানের তাঁহার বন্ধুর ভ্রাতা কেশব কুরুপ বাড়ী ছাড়িয়া উত্তর ভারতে যাত্রা করেন। স্বামী নির্মলানন্দ শুধু

এই সংবাদ শুনিয়াছিলেন এবং তাহার বৃদ্ধা মাতার শোক ও দুশ্চিন্তার কথা ভাবিয়াছিলেন। অবিলম্বে তিনি ভক্ত নীলকণ্ঠ ওরফে পুরুষোত্তমানন্দ স্বামীকে লিখিলেন, "তুমি সত্বর তাহার বৃদ্ধা মাতাকে আমার পক্ষ হইতে আশীর্বাদ পাঠাও এবং লেখ যে, ইহার জন্য দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। শ্রীগুরু মহারাজ অদীর্ঘ সময়ের মধ্যেই তাঁহাকে স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিবেন। বেলুড়মঠ দর্শন এবং অধ্যক্ষ মহারাজকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, এইজন্যই তিনি হঠাৎ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।" স্বামী নির্মলানন্দ যেমন অনুমান ও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তদ্রূপই ঘটিল। কেশব কুরুপ বেলুড়মঠে যাইয়া পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষা লইয়া যথাসময়ে স্বগৃহে ফিরিলেন। অবশ্য স্বামী নির্মলানন্দজী বেলুড়মঠে তাঁহার সম্বন্ধে সমস্তই লিখিয়াছিলেন।

অক্টোবর মাসের শেষে স্বামী নির্মলানন্দ একটি পাচক পাইয়া অনেক পরিমাণে অবসর পাইলেন। পরবর্তী বৎসর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি ব্যাঙ্গালোর হইতে ত্রিবাঙ্কুরে যাত্রা করিলেন এবং পথে সালেম, ওট্টাপালম্ এবং অন্যান্য স্থানে নামিলেন। কয়েকদিন ত্রিবান্দ্রমে থাকিয়া তিনি হরিপাদে গেলেন। তথায় তিনি প্রায় এক সপ্তাহ রহিলেন। ভক্তগণকে উপদেশদান এবং ব্রহ্মচারিবৃন্দকে শিক্ষাদানই তথায় তাঁহার প্রধান কর্তব্য ছিল। ঠাকুরের পূজা সম্বন্ধে তিনি তত্রস্থ ব্রহ্মচারিবৃন্দের মনে এরূপ রেখাপাত করেন, "পূজা শুষ্ক ক্রিয়া নয়। যেমন লোকে প্রীতিভরে সেবা করে, তদ্রূপ পূজাকালে ঠাকুরের উপস্থিতি অনুভব ও ভক্তিভরে তাঁহার সেবা করিতে হয়।" বার বার তিনি ব্রহ্মচারিগণকে কর্মকুশল হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে রান্না ও সর্ববিধ গৃহকর্ম করা শিক্ষা দিতেন এবং যাহা কিছু ঠাকুর জুটাইয়া দেন তাহার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে বলিতেন। সর্বদা আশ্রমে মিতব্যয়ের প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিতেন। যখন শিষ্যবৃন্দ বাজারে শাকসব্জী কিনিবার জন্য যাইতে প্রস্তুত হইতেন তখন নির্মলানন্দজী কখনও কখনও বলিতেন, "একটু থাম, এইক্ষণে আমাদের বাগানে কি কি শাকসব্জী আছে দেখে আসি।" তিনি বাগানে ঘুরিয়া সামান্য শাক প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেন। ব্যঞ্জন-বৈচিত্র্যের জন্য তিনি নিজেই তরকারী কুটিতেন ও বলিতেন, "দেখ, এই সব সব্জী আমাদের বাগানেই ছিল। তথাপি তুমি এইসব বা ইহাপেক্ষা
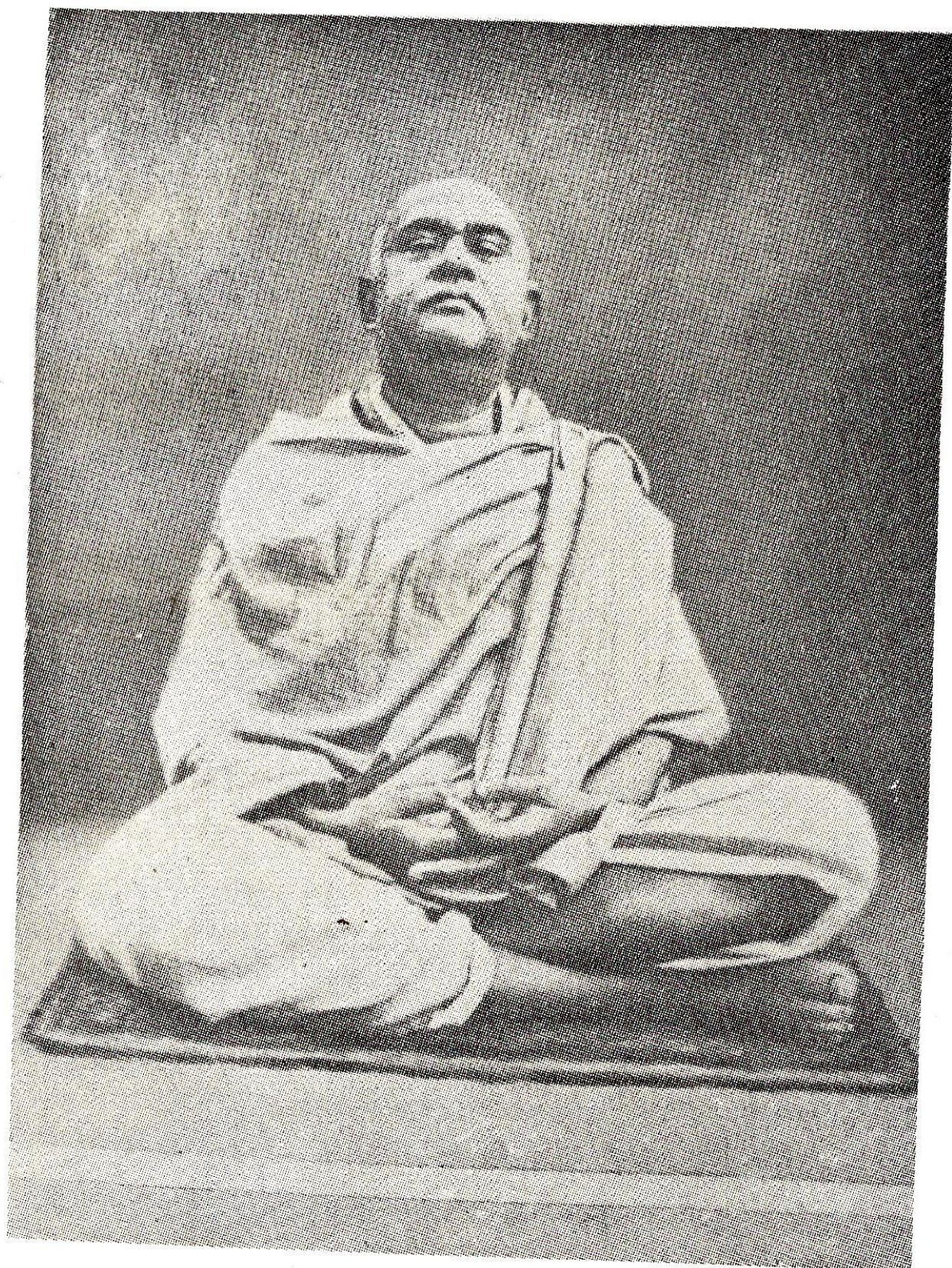
স্বামী ব্রহ্মানন্দ

নিকৃষ্ট দ্রব্য কিনিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে বাজারে যাইতেছিলে।” অন্য সময়ে তিনি দোষ-দর্শনের অপকার জোর করিয়া নির্দেশ করিতেন ও বলিতেন, “কেন তুমি নিজেকে ভাল ও সাত্ত্বিক এবং অন্যকে মন্দ ও নীচ বিবেচনা কর? তাহারা সকলে কি একই ঈশ্বরের সন্তান নয়? তাহাদের উন্নতির জন্য তোমাদের প্রার্থনা করা উচিত। যতই তুমি স্পষ্টবাদী, সত্যনিষ্ঠ হও না কেন, কাহারও অন্তরে আঘাত দিও না।” বাক্যে ও কর্মে তিনি প্রীতি, সাহস, শক্তি ও সমদর্শনের দৃষ্টান্ত দেখাইতেন। এমন কি যাহারা পাপী ও দুষ্কৃত তাহাদিগের প্রতিও তাঁহার অভয় বাণী ও সকরুণ উপদেশ ছিল। তিনি বলিতেন, “এই ভাবে চিন্তা কর—অত্যন্ত অপবিত্র বলিয়াই জগন্মাতাকে ডাকিবার বেশী অধিকার আমার আছে। সেই কারণেই আমার প্রার্থনায় তাঁহার কর্ণপাত করা উচিত। অনুভব কর যে, তুমি সত্যই জগন্মাতার সুসন্তান।” কিরূপে তিনি ভক্তবৃন্দ ও ব্রহ্মচারিগণকে জাতিভেদমূলক কুসংস্কার বর্জন করিতে প্রণোদিত করিতেন নিম্নোক্ত ঘটনাই তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত। হরিপাদের ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন। তাঁহাকে ও অন্যান্য ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া একদা স্বামী নির্মলানন্দ চেরতলা হইতে হরিপাদে ফিরিতেছিলেন। চেরতলার ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের সংস্থান করেন নাই। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি সঙ্গীবৃন্দকে কঠোর তিরস্কার করিলেন এবং একটি পুলের নিকটে নৌকা থামাইতে আদেশ দিলেন। অদূরে কয়েকটি নোংরা দোকান দেখিয়া নৌকা হইতে তিনি নামিলেন। জনৈকা মুসলমান নারী কর্তৃক প্রস্তুত চাউলের পিঠা এবং একটি অস্পৃশ্য তিয়া কর্তৃক রক্ষিত গুড়ের জল সেই দোকানে পাওয়া যায়। এই দুই দ্রব্যের কিছু কিছু স্বামীজি নিঃসঙ্কোচে কিনিলেন। ব্রহ্মচারীর উত্তরীয়ের খুটে চাউলের পিঠা বাঁধা হইল। নৌকায় আসিয়া স্বামীজি সেই চাউলের পিঠা ও গুড়জল খাইতে ব্রহ্মচারীকে বলিলেন এবং নিজে সারারাত্রি উপবাসী রহিলেন। ব্রহ্মচারীর জাতিগত কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল। নিজস্ব জলপাত্র ও বিছানা রাখিবার জন্য তিনি সকল ব্রহ্মচারীকে উপদেশ দিতেন ও বলিতেন, “অন্যের বিছানা বা কাপড় ব্যবহার করিলে বীর্যনাশ হয়।” বৃথা তর্ক করিতে ও বৃথা বাক্য বলিতে তিনি সর্বদা নিষেধ করিতেন ও স্বয়ং উদাহরণ দেখাইতেন। দুর্গম পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণকালে একদা তাঁহারা কোন ওয়ারিয়ারের গৃহে উপস্থিত হইলেন। উক্ত ওয়ারিয়ার স্বামী নির্মলানন্দজীকে

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ইংরাজী বা সংস্কৃত জানেন কি?" স্বামীজি তাঁহাকে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি ইংরাজী বা সংস্কৃত আদৌ জানেন না এবং তিনি একজন দরিদ্র ফকির ও পেটের দায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কুইল্যাণ্ডির পথে সহযাত্রী এক খ্রীষ্টান মিশনারীকে তিনি কতকটা একই প্রকার উত্তর দিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবারে পুরাণো আশ্রমগুলি পরিদর্শন এবং বহু প্রাচীন ভক্তের সহিত সাক্ষাৎ ও নূতন ভক্তের সহিত আলাপ করিয়া তিনি অবিরাম তাঁহার ভক্তদলের কল্যাণসাধনে তৎপর থাকিতেন। এমন 'সর্বভূতহিতে রত' সন্ন্যাসী বিরল দেখা যায়।

একুশ

মর্মন্তুদ শোক-সংবাদ

ইতিমধ্যে সংঘ-জননী সারদাদেবী অসুস্থ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতেছে। অমঙ্গলের আশংকায় স্বামী নির্মলানন্দ কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। শ্রীমা অন্তিম শয্যায় শায়িতা। তাঁহার জীবন-প্রদীপ দ্রুতবেগে নির্বাণোন্মুখ হইল ও তিনি মহাসমাধিমগ্না হইলেন। ইহাতে স্বামী নির্মলানন্দ গভীর শোকসন্তপ্ত হইলেন। তিনি সংঘ-জননীকে অসীম ভক্তি করিতেন এবং গর্ভধারিণীর তুল্য ভালবাসিতেন। যখন শ্রীমা ব্যাঙ্গালোরে মোটর গাড়ীতে বা ঘোড়ার গাড়ীতে চলিতেন, তখন নির্মলানন্দজী সেই গাড়ীর পাশে পাশে লাঠি হাতে করিয়া অনুরক্ত দেহরক্ষীরূপে যাইতেন। ব্যাঙ্গালোর আশ্রমের প্রেসিডেন্ট হইয়াও তিনি শ্রীমার দ্রব্যগুলি ভক্তিভরে মাথায় করিয়া বহিতেন। যখন শ্রীমা ব্যাঙ্গালোর হইতে মাদ্রাজ যান তখন তিনি বীর সন্ন্যাসী হইয়াও শিশুর ন্যায় ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়াছিলেন। মাতৃশোকে তিনি নিশ্চয়ই সান্ত্বনার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্য বাল্যকালের প্রিয় শহর পুণ্যতীর্থ কাশীধাম তিনি পরিদর্শন করেন। তখন তাঁহার অবশিষ্ট প্রিয়পাত্র ভক্তিভাজন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভুবনেশ্বরে ছিলেন। সান্ত্বনা লাভার্থ তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট যাইতে সংকল্প করিলেন। তিনি ভুবনেশ্বরে গেলেন এবং পূজ্যপাদ গুরুভ্রাতাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন ও

বাঞ্ছিত সান্ত্বনা পাইলেন। কয়েক দিবস পরে তিনি ব্যাঙ্গালোরে ফিরিলেন এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর ভক্তবর নীলকণ্ঠকে লিখিলেন, "তিন দিন পূর্বে আমি এখানে ফিরেছি। * * * পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দজী বলিয়াছেন যে, নারী ভক্তগণকে পরবর্তী ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। তখন তিনি মাদ্রাজে আসিবেন ও তাঁহাদিগকে কৃপা করিবেন। তাঁহার শরীর এখন ভাল নাই। যদি তিনি শীতকালে মাদ্রাজে আসেন তাহা হইলে স্ত্রীভক্তবৃন্দের পক্ষে মাদ্রাজে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সর্বপ্রকারে সুবিধাজনক হইবে।"

এত শীঘ্র ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মাদ্রাজে আসিবেন শুনিয়া কেরলের ভক্তবৃন্দ অতিশয় পুলকিত হইলেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই সুবর্ণ সুযোগ তাঁহারা যেন অবহেলা না করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে অক্টোবর ব্যাঙ্গালোর হইতে তিনি প্রিয় ভক্ত নারায়ণ পিলেকে লিখিলেন, "মাদ্রাজ ছাত্রাবাস গৃহনির্মাণ সমাপ্ত-প্রায়, ভক্তবৃন্দের আকাঙ্ক্ষা যে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কর্তৃক নবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটিত হউক। * * তাঁহারা তাঁহাকে ডিসেম্বর বা জানুয়ারী মাসে আনিতে ইচ্ছা করেন। পূজ্যপাদ মহারাজের ইচ্ছা আছে, মাদ্রাজের দ্বারোদ্ঘাটন সমাপনান্তে ব্যাঙ্গালোরে আসিয়া গ্রীষ্মকাল কাটাইবেন। তাম্পি প্রমুখ ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলাম যে, ত্রিবান্দ্রম আশ্রমের গৃহনির্মাণ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হইলে উহার দ্বারোদ্ঘাটন করিবার জন্য আমরা প্রেসিডেণ্ট মহারাজকে আনিতে পারি। এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার আমরা যেন সর্বপ্রকারে করিতে পারি। যতশীঘ্র সম্ভব এই বিষয়ে স্থানীয় ভক্তদের সহিত পরামর্শ ও আলোচনা করিব। * * * সুযোগমত তুমি একটি দিন অদূর ভবিষ্যতে স্থির করিয়া ভক্তগণকে ডাকিয়া আন এবং এই বিষয় আলোচনা কর। প্রেসিডেণ্ট মহারাজ বয়োবৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন ও সেইজন্য এখানে ওখানে গমনাগমনে তিনি অক্ষম হইতেছেন। যদি আমরা এই সুযোগ হারাই, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহাকে দক্ষিণ ভারতে পুনরানয়নের সম্ভাবনা আদৌ নাই। তোমাদের আলোচনার সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।"

ত্রিবান্দ্রমে উল্লিখিত আলোচনায় সর্বসম্মতিক্রমে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে এবং আশ্রমগৃহের দ্বারোদ্ঘাটনার্থ প্রেসিডেণ্ট মহারাজকে প্রার্থনা জানাইতে হইবে। ক্ষিপ্রবেগে যথাসাধ্য নির্মাণ-কার্য চলিতে লাগিল। স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ কয়েকজন সাধুসহ স্বামী ব্রহ্মানন্দ

মাদ্রাজে গেলেন। তাঁহাকে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদনের উদ্দেশ্যে দুই ব্রহ্মচারী হরিপাদ হইতে মাদ্রাজে আসিলেন। ইহার কয়েক দিবস পরে স্বামী নির্মলানন্দ দুই পূজ্য গুরুভ্রাতাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে গেলেন। তাঁহার আগমন দিবসে ব্রহ্মানন্দজী ঐ ব্রহ্মচারীদ্বয়কে তাঁহাদের গুরুদেবকে অভ্যর্থনার্থ বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তাঁহাকে আনিবার জন্য রেলওয়ে স্টেশনে একখানি মোটর গাড়ী পাঠাইবার ব্যবস্থাও সাগ্রহে তিনি করিলেন। এই সকল আয়োজন করিয়াও তিনি যেন সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার অনুগত ও অনুরক্ত তুলসীকে সর্বাগ্রে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ঘরের বাহিরে আসিয়া বাগানে তাঁহার অপেক্ষায় পায়চারী করিতে লাগিলেন। কি অপরিসীম গুরুভ্রাতৃ প্রেম! স্বামী নির্মলানন্দ ফল, মিষ্টি প্রভৃতি ব্রহ্মানন্দজীর চরণে নিবেদনপূর্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন এবং ব্রহ্মানন্দজী কর্তৃক প্রীতিভরে আলিঙ্গিত হইলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মাদ্রাজ ছাত্রাবাসের নবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটনপূর্বক গ্রীষ্মবাসের জন্য ব্যাঙ্গালোরে গেলেন। ইহাতে স্বামী নির্মলানন্দ অসীম আনন্দ অনুভব করিলেন ও বরণীয় গুরু-ভ্রাতাকে সেবা করিবার আর একটি উত্তম সুযোগ পাইলেন। পূর্ববারের ন্যায় এইবারেও গুরুভ্রাতার সেবায় তিনি সারাদিন ব্যাপৃত হইলেন। ব্রহ্মানন্দজীকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান ব্যতীত তাঁহার জীবনে তখন অন্য লক্ষ্য রহিল না। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী কর্তৃক তৎকালে তাঁহার দৈনন্দিন কার্যসূচী নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে তিনি ব্রহ্মানন্দজীর বাসকক্ষ খুলিতেন, তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেন, তাঁহার পদধূলি লইতেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, "গতরাত্রে ঘুম কেমন হইয়াছে ও এখন শরীর কেমন আছে?" অনন্তর তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "মহারাজ, আপনি কি খাবেন?" ব্রহ্মানন্দজী সহাস্যে উত্তর দিতেন, "যাহা তুমি দেবে তাহাই সানন্দে খাব।" ইহাতে তুলসী মহারাজ শ্রদ্ধাভরে নিবেদন করিতেন, "মহারাজ আপনি সর্বাপেক্ষা যাহা পছন্দ করেন তাহাই আমি আপনাকে নিবেদন করিতে ও আপনার প্রসাদ লইতে সর্বদা প্রস্তুত।" ইহাতে ব্রহ্মানন্দজীর মুখমণ্ডলে প্রীতিমধুর দিব্য হাস্য বিকশিত হইত। প্রাতঃকালে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পর তুলসী মহারাজ স্বয়ং বাজারে যাইতেন, উৎকৃষ্ট ফল-মূল-শাকসব্জী কিনিতেন ও সেইগুলি স্বয়ং আশ্রমে আনিতেন এবং ব্রহ্মানন্দজীও তৎদলভুক্ত সকলের জন্য সুস্বাদু আহার্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেন। তিনি স্বয়ং মহারাজকে

তেল মাখাইতেন এবং স্নান করাইতেন এবং তাঁহাকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইয়া পরমানন্দে তাঁহার প্রসাদ খাইতেন। যখন তিনি মহারাজের সান্নিধ্যে থাকিতেন ও তাঁহার সহিত কথা বলিতেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডল প্রীতি ও নম্রতায় সুদীপ্ত হইয়া উঠিত। একদা তিনি ব্রহ্মানন্দজীর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় তিনি মহাপুরুষ। তোমরা সকলে গভীর শ্রদ্ধা ও বিনয়সহকারে, তাঁহার সমীপে যাইবে।" তুলসী মহারাজের প্রতি ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শ্রদ্ধা ও প্রীতি এত অধিক ছিল যে, তিনি প্রায়ই ভক্তবৃন্দকে বলিতেন, "তোমরা সকলে যাও ও শোন, স্বামী নির্মলানন্দজী কি বলিতেছেন। ইহাতে তোমাদের পরম কল্যাণ হইবে।" তিনি এমন সুবিবেচক ছিলেন যে, যখন তুলসী মহারাজ ভক্তদের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন. তিনি সম্মুখস্থ দরজা দিয়া নিত্যভ্রমণে না যাইয়া অন্য দ্বার দিয়া বহির্গত হইতেন, পাছে তুলসী মহারাজের আলোচনা বাধা প্রাপ্ত হয়।

একদিন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "ভাই তুলসী, আমি শুনিতে পাই, তুমি রোজ বাজারে যাও ও নানা ভাল জিনিষ কিনিয়া রৌদ্রতপ্ত হইয়া সেই সকল আশ্রমে স্বয়ং বহন করিয়া আন। তুমি শুধু আমার সেবা করিয়াই ক্ষান্ত হও না, আমার সঙ্গীদের পর্যন্ত প্রাণপণে সেবা কর। এই সকল অনাবশ্যক কষ্ট তুমি নিজে কর কেন?" স্বামী নির্মলানন্দ করজোড়ে উত্তর দিতেন, "মহারাজ, আপনার সেবা কি কখনও কষ্টকর হয়? আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনার সামান্য সেবার সুযোগ পেয়েছি। আমার প্রার্থনা, আপনি এইজন্য আদৌ চিন্তিত হবেন না। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে আমাকে ধন্য হতে দিন।" ইহা শুনিয়া মহারাজ গভীর প্রীতি ও স্নেহভরে তাঁহার দিকে তাকাইলেন। এইরূপে দিনের পর দিন পরমানন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ত্রিবান্দ্রমে যাইয়া নূতন আশ্রমের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে সম্মত হইলেন। এই শুভ সংবাদ মালাবারের ভক্তবৃন্দকে বিজ্ঞাপিত করা হইল। শংকর মেনন (পরে স্বামী অমলানন্দ) স্বামী নির্মলানন্দকে অনুরোধ জানাইলেন, উক্ত দলকে ওট্টাপালমে লইয়া যাবার জন্য। এই নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্বক স্বামী নির্মলানন্দ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই শংকর মেননকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন, "তোমার ১৮ই তারিখের পত্র ও নিমন্ত্রণের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিবে। খুব সম্ভব আমরা এখান হইতে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে

ত্রিবাংকুর যাত্রা করিব। আমরা নিশ্চয়ই পথে ওট্টাপালমে নামিয়া দুইদিন বিশ্রাম করিব ও তোমাদের আন্তরিক আতিথেয়তা উপভোগ করিব। আমাদের যাত্রাদিবস এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। প্রেসিডেণ্ট মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গীবৃন্দ কবে ওট্টাপালমে পৌঁছিবেন তাহা তোমাকে যথাসময়ে নিশ্চয় করিয়া জানাইব। ইতি—তোমাদের শুভাকাংক্ষী স্বামী নির্মলানন্দ।"

শংকর মেননের উত্তর পাইয়া স্বামী নির্মলানন্দ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্গালোর হইতে পুনরায় তাঁহাকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন, "প্রিয় শংকর মেনন, তোমার তেসরা সেপ্টেম্বরের পত্র পেয়েছি। প্রেসিডেণ্ট মহারাজ এই মাসের শেষ পর্যন্ত এখানে থাকিবেন এবং তার পর মাদ্রাজে যাইয়া নবরাত্রি কাটাইবেন। যদি তৎপূর্বে মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ প্রশমিত হয় তিনি ওট্টাপালম্ হইয়া ত্রিবাংকুরে যাইবেন। যদি বর্তমান অবস্থা আরও একমাস চলিতে থাকে তিনি মাদুরা দিয়া যাইবেন এবং ফিরিবার পথে শোরানুর রেল লাইনে আসিয়া ওট্টাপালমে বিশ্রাম করিবেন।" স্বামী নির্মলানন্দ ত্রিবাংকুরস্থ ভক্তবৃন্দ ও বন্ধুবর্গকে আবশ্যকীয় আয়োজন করিতে লিখিলেন। ব্রহ্মানন্দজীর আগমন ও অবস্থানকে সর্বাংশে আরামপ্রদ ও আশ্রমের দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবকে অপূর্ব সাফল্যে সুমণ্ডিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইল; কিন্তু দৈবাৎ ব্রহ্মানন্দজীর অসুস্থতা পূর্বোক্ত কার্যসূচীকে পরিবর্তিত করিল। ২৮শে সেপ্টেম্বর স্বামী নির্মলানন্দ শংকর মেননকে পুনরায় লিখিলেন, "প্রেসিডেণ্ট মহারাজ হঠাৎ অসুস্থ ও মোপলা বিদ্রোহ প্রশমিত না হওয়ায় তিনি ওট্টাপালম্ যাত্রা সম্প্রতি স্থগিত রাখিয়াছেন। নবরাত্রি মহোৎসব সমাপ্ত হইলে তিনি ঐ অঞ্চলে যাইবেন। কোন্ তারিখে তিনি এখান হইতে যাত্রা করিবেন তাহা যথাকালে তোমাকে জানাইব।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ নবরাত্রি উদ্‌যাপনার্থ মাদ্রাজ যাইবার পূর্বে স্বামী নির্মলানন্দ কুন্‌হীরমণ মেননকে লিখিলেন, ওট্টাপালমের আয়োজন তত্ত্বাবধান করিতে এবং এই সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত নির্দেশলাভার্থ ব্যাঙ্গালোরে আসিতে। তদনুসারে কুন্‌হীরমণ অবিলম্বে ব্যাঙ্গালোরে গেলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রিয় শিষ্যকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ও সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখন আমরা মালাবার যাবো তখন আমাদের জন্য একটি সুন্দর বাংলো ব্যবস্থা করতে পারবে ত?" ভাগ্যবান্ কুন্‌হীরমণ করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "হ্যাঁ

মহারাজ, সবই প্রস্তুত হয়েছে। আমরা শুধু আপনার শুভাগমনের প্রতীক্ষায় আছি।" ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলিলেন, "বেশ কথা।" অনন্তর পার্শ্ববর্তী ঘরে অবস্থিত স্বামী বরদানন্দকে দেখাইয়া কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, "ওখানে গিয়ে ওকে বল, ওকে ওখানে ভাল ভাল জিনিষ খেতে দেবে।" ইহা কি শুধু কৌতুক, না অন্য কিছু? সে যাহাই হউক, কুন্হীরমণ নির্মলানন্দজীর সহিত আলোচনা করিয়া ব্রহ্মানন্দজীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। উভয়ে তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই ওট্টাপালমে নামিবেন। অবশ্য, মহাপুরুষ শিবানন্দ মহারাজ তাঁহাকে সহাস্যে বলিলেন, "যদি ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তবেই যাওয়া হবে।" সেইদিন স্বামী নির্মলানন্দ ব্রহ্মানন্দজীকে অনুরোধ করিলেন ব্রহ্মচারী শান্তচৈতন্যকে সন্ন্যাস দিবার জন্য। পরদিন বিরজা হোম অনুষ্ঠানান্তে ব্রহ্মানন্দজী শান্তচৈতন্যকে বৈদিক সন্ন্যাস দিলেন ও তাঁহার নাম রাখিলেন স্বামী সুখানন্দ। ব্রহ্মচারী বীরেশও (পরে স্বামী সম্ভবানন্দ) ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট ব্রহ্মচর্য দীক্ষালাভ করিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ব্যাঙ্গালোর হইতে মাদ্রাজে গেলেন। মাদ্রাজে বঙ্গীয় প্রথায় মৃন্ময়ী প্রতিমায় শারদীয়া দুর্গা-পূজা যথোচিত সমারোহে অনুষ্ঠিত হইল। কোন অজ্ঞাত কারণে ব্রহ্মানন্দজীর মন হঠাৎ পরিবর্তিত হইল। তিনি অবিলম্বে কলিকাতা যাইতে মনস্থ করিলেন ও তাঁহার কেরল ভ্রমণ বন্ধ হইয়া গেল। পরবর্তী দুর্ঘটনা হইতে অনুমিত হয়, তিনি স্বীয় মহাপ্রয়াণের পূর্বাভাস প্রাপ্ত হন।

ইহাতে স্বামী নির্মলানন্দ অতিশয় মর্মাহত হইলেন। সারা জীবনে এইরূপ মর্মব্যথা তিনি কখনও পান নাই। তাঁহার ও শত শত ভক্তের আশা-আকাংক্ষা সমূলে ভূমিসাৎ হইল। সমগ্র কেরলে ব্যাপক ব্যবস্থা ব্যর্থ হইল! তিনি কেরলে আসিয়াই শুনিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতায় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছেন। তিনি অবিলম্বে ত্রিবান্দ্রম হইতে ওট্টাপালমে আসিলেন এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল ব্যাঙ্গালোর হইতে তারযোগে এই দুঃসংবাদ পাইলেন যে, ব্রহ্মানন্দজীর বাঁচিবার কোন আশা নাই। অবিলম্বে তিনি কলিকাতা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হায়! রেলওয়ে স্টেশনে যাইয়া তিনি স্বামী সারদানন্দের জরুরি তার পাইলেন, আমাদের মহারাজ ৯ই তারিখে সোমবার রাত্রে মহাসমাধিমগ্ন হইয়াছেন। তিনি এই হৃদয়-বিদারক দুঃসংবাদ প্রশান্ত গম্ভীরভাবে পড়িলেন ও বলিলেন, "চল, এখন ফিরে যাই।" এই

বলিয়া তিনি স্থানীয় ভক্ত নারায়ণ নায়ারের গৃহে ফিরিলেন ও স্বীয় আরাম চেয়ারে শোকাতিশয্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, মৃদুস্বরে সুমধুর মাতৃনাম উচ্চারণ করিলেন এবং বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। শীঘ্রই তিনি শোকভাব সংবরণপূর্বক কলিকাতা যাত্রার সংকল্প ত্যাগ করিলেন ও ত্রিবান্দ্রম যাইতে প্রস্তুত হইলেন। মহাসমাধি উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের ভক্তবৃন্দ কি করিবেন, তৎসম্বন্ধে নির্দেশ দিয়া তিনি পরদিন 'ওট্টাপালম্ ত্যাগ করিলেন। তিনি ত্রিবান্দ্রমে যাইয়া দুই সপ্তাহ রহিলেন এবং ব্রহ্মানন্দজীর মহাসমাধি উপলক্ষে তথায় বিশেষ পূজা-হোম সমাপনান্তে ব্যাঙ্গালোরে ফিরিলেন।

বাইশ

অবিশ্রান্ত প্রচারভ্রমণ

খ্রীষ্টীয় ১৯২২ অব্দের শেষ ভাগে স্বামী নির্মলানন্দ করুণাকর মেননের নিমন্ত্রণে কোয়েমবাতুর পরিদর্শন করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন স্বামীজি বাদাগারে গমন করেন, তখন করুণাকর মেনন তথায় সাব রেজিষ্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স ছিলেন। কোয়েমবাতুর হইতে স্বামীজি মালাবারে যাইয়া পুরাতন আশ্রমগুলি পরিদর্শনপূর্বক ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দোস্‌রা জানুয়ারী ব্যাঙ্গালোরে প্রত্যাগমন করেন।

কুইল্যাণ্ডির ভক্তবৃন্দের অনুরোধে স্বামী নির্মলানন্দ উক্ত বৎসরে ৩০শে মার্চ তথায় যাইয়া জন্মোৎসবসমূহে পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হন। উক্ত আশ্রম সম্বন্ধে কোনও আইন-বিষয়ক আলোচনাও ছিল। আশ্রমগৃহের চারিদিকে যে প্রাঙ্গণ ও উদ্যান ছিল তদ্ব্যতীত আর একটি বাগানও মিশনকে দান করা হইয়াছিল। ঐ বাগানের মালিক বাগানটি পুনরায় অধিকারের উদ্দেশ্যে আশ্রমে রেজিষ্টার্ড নোটিশ জারি করিয়াছিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ এই ব্যাপার কোর্টের সাহায্য ব্যতীত মিটাইবার জন্য কুন্‌হীরমণ মেননকে বলিলেন এবং তত্রস্থ আশ্রমের ব্রহ্মচারীকে লিখিলেন, "শ্রীগুরু মহারাজের ইচ্ছা হইলে এই ব্যাপার সহজে মিটিয়া যাইবে। যদি তাহা না হয়, আমরা উক্ত স্থান ছাড়িয়া ওট্টাপালম বা পট্টম্বীতে একটি আশ্রম স্থাপনের প্রযত্ন করিব।

তিনি যথাসময়ে আসিয়া জন্মোৎসবে পৌরোহিত্য করিলেন। কুইল্যাণ্ডি এমন একটি কেন্দ্রস্থল ছিল, যেখান হইতে বৎসরের পর বৎসর পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন দ্বারা উত্তর মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়ার ভক্তগণের উপর স্বামী নির্মলানন্দ প্রভাব বিস্তার করিতেন। একাধিকবার তিনি পদাথনাদের দ্বিতীয় রাজার অতিথিরূপে পুরামেরী প্রাসাদে আমন্ত্রিত হন। উত্তর মালাবারে যে সকল প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন এই রাজা তাঁহাদের উপযুক্ত বংশধর ছিলেন। রাজা ও রাণী উভয়ে স্বামীজির প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন।

ওট্টাপালমের চেম্পল্লী ভ্রাতৃবৃন্দ উতকামণ্ডের নিম্নদেশে কুন্নুরে সেণ্ট্রাল ষ্টোর্স নামক বড় দোকান চালাইতেন। তাঁহাদের নিমন্ত্রণে স্বামী নির্মলানন্দ কুন্নুরেও গমন করেন। তথায় আশ্রম স্থাপনার্থ জমি-সংগ্রহের প্রস্তাবও উঠিল। তথায় একদল অস্পৃশ্য পঞ্চমা তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিল। কৃপাপূর্বক তিনি তাহাদের পল্লী ও মন্দির দেখিতে গেলেন এবং সেই মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। তিনি তথায় কিছু ধর্মোপদেশ দান করেন। সর্বভূতে তাঁহার সমদৃষ্টি জন্মিয়াছিল।

এই বৎসর স্বামী নির্মলানন্দ কোয়েমবাতুর জেলায় গোবিচেট্টিপালয়ম্ নামক একটি নূতন স্থান পরিদর্শন করেন। তখন অবসরপ্রাপ্ত জজ কৃষ্ণন্ নায়ার তথাকার জেলা-মুন্সিফ ছিলেন। যখন কৃষ্ণন্ নায়ার মালাবারের জেলা-মুন্সিফ ছিলেন তখন তাঁহার সহিত স্বামীজি কুন্হী রমণ মেনন কর্তৃক পরিচিত হন। স্থানীয় বিবেকানন্দ সোসাইটির বার্ষিক উৎসবে পৌরোহিত্য করিবার জন্য স্বামীজি নিমন্ত্রিত হন। সুবক্তা কুন্হী রমণ মেনন তথায় পূর্ব বৎসর একটি সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই উৎসবে বক্তৃতা দানার্থ তিনিও নিমন্ত্রিত হইলেন। তথায় স্বামীজির বক্তৃতা সম্বন্ধে কুন্হী রমণ বলেন, "স্বামীজি সভাপতিরূপে যে ভাষণ দেন তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হন। শ্রোতৃবৃন্দের প্রশ্নসমূহের যে উত্তর তিনি দেন তাহাতে জিজ্ঞাসুর সন্দেহ দুরীভূত হয়। যদিও স্বামীজি সোসাইটির কর্মীবৃন্দের উৎসাহে ও তাঁহার ভক্তের আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় গ্রহণ করেন, তথাপি ফিরিবার পথে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, সোসাইটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি অধিক আশা পোষণ করেন না; কারণ প্রচুর অর্থবল ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হইতে পারে না।"

গোবিচেট্টিপালয়ম্ হইতে স্বামীজি কেরালায় গমন করেন। মালাবারের আশ্রমসমূহ পরিদর্শন ও কতিপয় ভক্তের আতিথ্যগ্রহণান্তে তিনি ত্রিবান্দ্রমে গমন করেন। তথায় আশ্রমের নির্মাণকার্য সমাপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ত্রিবান্দ্রম হইতে ১৫ই জুন তিনি ব্যাঙ্গালোরে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার ভ্রমণসমূহ সাধারণ পর্যবেক্ষকের নিকটেও অদ্ভুত মনে হইত। তাঁহার ভ্রমণাবলী কত ঘন, কত দীর্ঘ ও কত ব্যাপক ছিল! তিনি কত কষ্টসহিষ্ণু ও ভ্রমণপটু প্রচারক ছিলেন! শীত বা গ্রীষ্ম, ঝড় বা বৃষ্টি, দিবা বা রাত্রি তিনি অবিশ্রাম ভ্রমণরত থাকিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেনযাত্রা ক্বচিৎ আরামদায়ক হইত। একদা তিনি একাকী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে রাত্রিযাপন করিয়া ও অবশিষ্ট পাথেয় অর্থ হরিপাদের ভক্তবৃন্দকে ফেরৎ দিয়া তাঁহাদিগকে চমৎকৃত করেন। অদ্ভুত স্থান, অদ্ভুত মুখাকৃতি, অদ্ভুত ভাষা এবং অদ্ভুত ও অনভ্যস্ত আহার—যাহা তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রায় অরুচিকর ও অনুপযোগী ছিল তাঁহার গুরু মহারাজের ভাবপ্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তিনি কিরূপে জীবনযাপন করিতেন তাহা নিজেই যথাযথভাবে এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, "শ্রীগুরু মহারাজের শুভেচ্ছা আমার জীবনে প্রতিক্ষণে পূর্ণ হউক। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি তাঁহার আদেশ যথাসাধ্য পালন করিব। কোনও জিজ্ঞাসা নাই, কোনও অবহেলা নাই, ষোল আনা আনুগত্যই আমার ধ্রুব নীতি। ওয়া গুরুজীকী ফতে!" তিনি কোথাও বিশ্রাম লইতেন না, কোনও ক্ষুদ্র কর্ম উপেক্ষা করিতেন না। জগদ্ধিতার্থ সর্বশক্তি ব্যয় করিতে পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। দলপতি বিবেকানন্দের মতই তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রকৃতি দেবী তীব্রতম প্রতিবাদ করিলেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি কেরল প্রদেশে পুনরায় গেলেন এবং ডাক্তার তাম্পির চিকিৎসাধীনে থাকিয়া ভগ্নস্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতিবিধান করিলেন। তৎসঙ্গে আশ্রম নির্মাণের কার্যেও তিনি মনোযোগী হইলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আশ্রম নির্মাণের নক্সাকারী ইঞ্জিনিয়ার হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মাণ সমাপ্তির পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। হৃষিকেশবাবু স্বামীজির অনুরক্ত বন্ধু-ভক্ত ছিলেন এবং ত্রিবান্দ্রম আশ্রমকে প্রাসাদোপম ও চিরস্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপাতী পরিশ্রম করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে স্বামীজি নিজেই নির্মাণ কার্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহাতে যদিও কার্যের গতি

মন্থর হইল, তথাপি উহা সন্তোষজনক হইল। তিনি বুঝিলেন যে, পরবর্তী বৎসর আশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন সম্ভবপর হইবে। ঠাকুর-ঘরের দরজা ও সিংহাসন তিনি কারুকার্যে মণ্ডিত করিতে চাহিলেন। তাঁহার পরিকল্পনা অনুসারে কার্য করিতে বহু মাস লাগিল; কিন্তু তিনি ইহাতে পরিতৃপ্ত হইলেন।

তেইশ

অনির্বাণ হোমশিখা

যে সকল যুবক স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগপূর্বক তাঁহার চরণাশ্রিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি এখন স্বামী নির্মলানন্দের কৃপাদৃষ্টি পড়িল। বহু বৎসর ধরিয়া যাঁহারা ঠাকুরের দিব্যকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকজন আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসংকল্প হন। তখন পর্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, বেলুড়মঠের অধ্যক্ষই ভক্তগণকে মন্ত্র-দীক্ষা এবং ত্যাগীবৃন্দকে ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস দিবেন। গতবার সংঘাধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দজী যখন ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে অবস্থান করেন তখন তিনি নির্মলানন্দজীকে বলিয়াছিলেন, "দীক্ষাগ্রহণের জন্য ভক্তগণকে দূরবর্তী বেলুড়মঠে আমার কাছে আর পাঠাইও না। তুমিই প্রকৃত প্রার্থিগণকে দীক্ষা দিও।" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং দীক্ষাদানে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যগণও দীক্ষা দিতে সহজে সম্মত হইতেন না; কারণ দীক্ষাদান অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ কার্য এবং গুরুকে শিষ্যের জীবন-ভার বহন করিতে হয়। কিন্তু স্বামী নির্মলানন্দের হৃদয় অত্যন্ত সদয় ও করুণ ছিল এবং পরদুঃখে কাতর হইত। জীবকুলকে অজ্ঞানান্ধকার হইতে জ্ঞানালোকে লইয়া যাওয়াই তাঁহার জীবন-ব্রত ছিল। বিশেষতঃ যাঁহারা সর্বস্ব ত্যাগপূর্বক তাঁহারা শরণ লইয়াছিলেন, তাঁহাদের গুরুভার লইতে তিনি সানন্দে সম্মত হইলেন। তাঁহাদের সর্বপ্রকার দোষ-দুর্বলতা উপেক্ষা করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে সন্ন্যাস দিতে চাহিলেন।

খৃষ্টীয় ১৯২৩ অব্দে ২২শে ডিসেম্বর হরিপাদ রামকৃষ্ণ আশ্রমে এগার জন ব্রহ্মচারী শুভক্ষণে সমবেত হইলেন। হরিপাদ আশ্রম কেরল প্রদেশে সর্ব-প্রথম ঈশ্বরালয়, যেখানে ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ সমাজ-শৃংখল হইতে মুক্ত হইয়া

স্বাধীন ভাবে ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন হইতে পারেন এবং জন্মগত বর্ণভেদাদি জলাঞ্জলি দিয়া চতুর্থ আশ্রম বরণের সুযোগ প্রাপ্ত হন। সন্ন্যাসাদর্শের দুর্জ্ঞেয় স্বরূপ অবগত করাইবার জন্য স্বামী নির্মলানন্দ ব্রহ্মচারীবৃন্দকে সন্ন্যাস সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে কিছু কিছু বলিবার পর তিনি নিজে ভাবাবেশে কিঞ্চিৎ জ্বালাময়ী উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, "প্রকৃত সন্ন্যাসের অর্থ—ত্যাগ নহে, গ্রহণ। কয়েক বিঘা জমি ও কয়েকখানি গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সারা বিশ্বকে স্বগৃহ রূপে পায়। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে মানব-সন্তান ঈশ্বর-সন্তানে পরিণত হয়। কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনের পরিবর্তে সন্ন্যাসী সমগ্র মানবজাতিকে স্বজনরূপে স্বীকার করে। দুঃখ-দৈন্য হইতে অব্যাহতি লাভও সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য নহে। তাহা কাপুরুষের পক্ষেই শোভনীয়। সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য—চরম দারিদ্র্য বরণ ও সর্বাবস্থায় ঈশ্বর-স্মরণ। প্রকৃত সন্ন্যাসী ঈশ্বর-দর্শন লাভ করে ও সদানন্দে থাকে ও সর্বভূতকে সুখ-শান্তি দান করে।"

পরদিন শুভ ব্রাহ্মমুহূর্তে এগারজন ব্রহ্মচারী স্বামী নির্মলানন্দের নির্দেশে যথাবিধি বিরজা হোম সমাপনপূর্বক বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাদিগকে কাষায় বস্ত্র প্রদানান্তে নিম্নোক্ত এগারটি সন্ন্যাস নাম দিলেন—স্বামী চিৎসুখানন্দ, নির্বিকারানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, শেখরানন্দ, চিদম্বরানন্দ, নৈষ্ঠিকানন্দ, চিৎপ্রভানন্দ, চিদ্‌ভাসানন্দ, শুভ্রানন্দ, বাগীশ্বরানন্দ ও ধীশ্বরানন্দ। এই পুণ্য অনুষ্ঠানের পর স্বামী নির্মলানন্দ কোন দর্শক ভক্তকে বলিলেন, "আমি শুধু তাহাদিগকে শ্রীগুরুমহারাজের চরণে সমর্পণ করেছি। তাহারা তৎপদে নিবেদিত হয়েছে। শ্রীগুরু মহারাজের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করেছি। তাহাদের সহিত আমার আর কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রীগুরু-মহারাজ তাহাদিগকে এখন চালাবেন।" কি ঋতম্ভরা সারগর্ভা উক্তি! পুনরায় তিনি বলিলেন, "আমি ঠাকুরের হাতে যন্ত্র মাত্র।" তাঁহার ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "আমি একটি গ্রামাফোন মাত্র, মহাপুরুষদের ভাবগুলি আমি যথাযথ আবৃত্তি করি। স্বামী বিবেকানন্দ একটি বৃহৎ নল, যাহার মাধ্যমে শ্রীগুরুমহারাজের ভাবগঙ্গা প্রধানতঃ প্রবাহিত। আমরাও ছোট ছোট নল এবং একই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত আছি।"

সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভের পরে কতিপয় নবীন সন্ন্যাসী আলোচনা করিতেছিলেন,

কিরূপে তাঁহারা সমাজে বাস করিবেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাদের আলোচনা দূর হইতে শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা পোষ্টম্যানদের মত হও। তোমরা পোষ্টম্যানদিগকে চিঠি-পত্র বিলি করিতে দেখ নাই? পত্রগুলি যতই জরুরী বা মূল্যবান হউক না কেন, যে পোষ্টম্যান সেইগুলি বিলি করে সে কখনও বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে বিবেচিত হয় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবরাশি সাধন ও প্রচার করাই তোমাদের একমাত্র কর্তব্য। তোমরা তাঁহাদের পোষ্টম্যান হও, তাঁহাদের ভাব-সম্পদ্ বিতরণ কর; কিন্তু ধর্ম-শিক্ষক রূপে নয়, পোষ্টম্যান রূপে।" সন্ন্যাসীর আহার সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, "যাহা প্রভু জুটিয়ে দেন তাহা সানন্দে গ্রহণ কর। যদি তোমার শক্তি সৎকর্মে ও সৎচিন্তায় নিয়োজিত হয় তোমার আহার স্বতঃই সাত্ত্বিক হইবে। নচেৎ উত্তম আহারও তামসিক আহারে পরিণত হয়।" স্বামী নির্মলানন্দ কেরল ত্যাগ করিয়া ব্যাঙ্গালোর যাত্রা করিলেন ও পথে কুনুরে নামিলেন। এইবারও তিনি কেরল প্রদেশের সমস্ত আশ্রম পরিদর্শন করিলেন। ব্যাঙ্গালোরে ফিরিয়া তিনি দুইজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস দিয়া তাঁহাদের নাম রাখিলেন স্বামী দেশিকানন্দ ও সন্তবানন্দ।

চব্বিশ

গুরুভ্রাতার পুণ্যস্মৃতি

অনন্তর সর্বাপেক্ষা প্রধান ও জরুরী কাজ রহিল ত্রিবান্দ্রম আশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন। সুদীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া উহার নির্মাণ কার্য চলিতেছিল। উহা প্রস্তর নির্মিত ও পর্বত-শিখরে অবস্থিত। ইহার তিন দিকে মনোহর সুবিস্তৃত প্রাকৃতিক দৃশ্য বিদ্যমান। স্বামী নির্মলানন্দ যখন ব্যাঙ্গালোরে ছিলেন তখন মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান স্যার পুট্টান্না চেট্টি কার্যোপলক্ষে ত্রিবান্দ্রমে আসেন ও উক্ত বিরাট আশ্রম পরিদর্শনান্তে মন্তব্য করেন, "এই আশ্রম অত্যন্ত সুরম্য স্থানে অবস্থিত ও তিন দিকে মনোহর দৃশ্য-বেষ্টিত; কিন্তু এত অধিক অর্থ শুধু গৃহ-নির্মাণের জন্য ব্যয় করা উচিত হয় নাই। আরও অল্প অর্থ ব্যয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর গৃহেই আশ্রমের কাজ ভাল ভাবেই চলিত। সংগৃহীত অর্থের

অবশিষ্ট অংশ জমা রাখিলে আশ্রমের পরিচালন সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হইত।” স্যার পুট্টান্না চেট্টির মন্তব্য শুনিয়া স্বামী নির্মলানন্দ বলিয়াছিলেন, “হাঁ, হাঁ, নানা লোকের নানা মত! শ্রীগুরুমহারাজের নামাঙ্কিত এই প্রস্তরময় আশ্রম-গৃহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে এবং বহুজনের নিকট তাঁহার ভাবপ্রচার ও প্রেরণা দানের উৎসস্বরূপ থাকিবে। তোমরা কি দক্ষিণ ভারতের বিরাট প্রাচীন মন্দিরগুলি দেখ নাই? সেইগুলি অদ্যাপি অভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান; আর শত শত ক্ষুদ্রতর মন্দির কালস্রোতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত অথবা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। তোমরা মনে করিও না যে, প্রাচীনগণ বিরাট মন্দির নির্মাণে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ভুল করিয়াছেন। জগদ্ধিতায় উহারও উপযোগিতা আছে। তাহা ছাড়া, আমি চাই না, আশ্রমবাসী সাধুবৃন্দ বিলাসী বাবুর মত আরামে থাকুক। যখন তাহারা দেখিবে, আশ্রমের ব্যয়নির্বাহার্থ প্রচুর ধন-সম্পদ্ জমা আছে তাহারা আরামপ্রিয় ও ভোগবিলাসী হইবে। সেই হেতু ভবিষ্যৎ পরিচালনের জন্য আমি কোন তহবিল সৃষ্টি করি নাই। সাধুবৃন্দ প্রশংসনীয় ধর্মজীবন যাপন করিলে নিশ্চয়ই জনসাধারণের আর্থিক সহায়তা লাভ করিবে। তখন আশ্রম ভাল ভাবেই চলিবে। যদি তাহারা অযোগ্য হয় ও ভক্তবৃন্দের সহযোগিতা ও সহানুভূতি না পায় তবে তাহাদের পক্ষে অনশনে থাকাই শ্রেয়স্কর হইবে।”

ত্রিবান্দ্রম আশ্রমের পরিকল্পনা সুবিস্তৃত হওয়ায় উহার নির্মাণে বহু হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। ভক্তবৃন্দ ও বন্ধুবর্গের আন্তরিক সহযোগিতায় ও অর্থদানে এবং স্বামী নির্মলানন্দের বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯২৪ খ্রীঃ মার্চ মাসে আশ্রমের প্রধান গৃহ-নির্মাণ সমাপ্ত হয়। উক্ত বর্ষে ৭ই মার্চ শুক্রবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ৮৯তম শুভ জন্মতিথিতে উহার উৎসর্গ দিবসরূপে নির্ধারিত হইল। এই অনুষ্ঠান অতিশয় চমৎকার হইল। প্রাতঃকাল হইতে কেরলের নানা স্থান হইতে আগত ভক্তবৃন্দ দলে দলে আশ্রমে উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং অপার্থিব দিব্যভাবে অভিভূত হইলেন। ঠাকুর-ঘরের সুনির্মিত ও সমুন্নত বেদীতে সুনির্দিষ্ট শুভক্ষণে স্বামী নির্মলানন্দ দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতিকৃতি দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা ও সঙ্গীত সহকারে স্থাপন করিলেন। অনন্তর ঠাকুর-ঘরের দরজা খোলা হইল ও তিনি স্বয়ং আরতি করিলেন। যাঁহারা ঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে

চাহিলেন তাঁহারা তদনুষ্ঠানে অনুমতি পাইলেন। বৈদিক হোমও যথাবিধি সম্পন্ন হইল। ১৬ই মার্চ রবিবার পর্যন্ত দশদিন ধরিয়া উদ্বোধন উৎসব মহা-সমারোহে চলিতে লাগিল ও সমগ্র কেরল প্রদেশে অপূর্ব ধর্মীয় জাগরণ আনিল। শেষ দিন বিশাল জনতার সমক্ষে আশ্রমের উদ্বোধন সমাপ্ত হইল। উক্ত দিন সন্ধ্যায় যে বিরাট ধর্মসভা আহূত হয়, তাহাতে স্বামী নির্মলানন্দ সভাপতিরূপে একটি হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ দিলেন ও ভক্তবর কুলক্কুনাথ রমণ মেননের অসাধারণ দানশীলতার উল্লেখ করিলেন। উক্ত ভক্ত তাঁহার পৃষ্ঠপোষক এ. আর: রাজরাজ বর্মার স্মৃতিরক্ষার্থ আশ্রমের ঠাকুর-ঘর ও উহার মার্বেলাবৃত মেঝে নির্মাণ এবং স্বর্গত জননীর স্মৃতিরক্ষার্থ আশ্রম প্রাঙ্গণে একটি কূপ খননের বিপুল ব্যয়ভার বহন করেন। এই পুণ্য কর্মে স্বামীজি একটি দরিদ্রা স্ত্রীভক্তের মূল্যবান নোলক (নাসিকার অঙ্গুরীয়ক) দানের কথা উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না। কেরলের ধনী-নির্ধন ভক্তবৃন্দ সকলেই মুক্ত হস্তে অর্থাদি দান করায় এত বড় আশ্রম নির্মিত হইতে পারিল। স্বামী নির্মলানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মানস পুত্র ব্রহ্মানন্দজীর পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই আশ্রম উৎসর্গ করেন।

ত্রিবান্দ্রমে আশ্রম প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই প্রবুদ্ধ কেরল কার্যালয় অন্যত্র স্থাপনের প্রয়োজন হইল। স্বর্গগত সরকারী উকিল পি. জি. গোবিন্দ পিলে নির্মলানন্দজীর সহিত বহুবার বাক্‌যুদ্ধ করিবার পরে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন এবং অবশেষে আল্লেপ্পিতে তাঁহার বৃহৎ উদ্যানবাটী ঠাকুরের কাজে দান করেন। উক্ত বর্ষের জুন মাসে ঐ বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত ও প্রবুদ্ধ কেরল আফিস স্থাপিত হয়। স্বামী নির্মলানন্দ ঈশ্বরকোটী গুরুভ্রাতা যোগানন্দ স্বামীজির পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থ উক্ত আশ্রম উৎসর্গ করেন। এই আশ্রমের প্রভাবে পড়িয়া কয়েকজন মৎস্যজীবী প্রতিবেশী ভক্ত পার্শ্বস্থ পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্যমঠ স্থাপনপূর্বক নিয়মিত ভাগবত সেবাপূজা চালাইতে লাগিল। তাহারাও স্বামী নির্মলানন্দকে ভক্তিভরে নিমন্ত্রণ করিল। স্বামীজিও তাঁহাদের মঠে যাইয়া সেবাপূজা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন ও সর্বান্তঃকরণে তাহাদের উপর ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। এই স্থানে তিনি মহাভক্ত দানবীর খাতায়ুখিমজীর সহিত পরিচিত হন। উক্ত শেঠ কেরলের বিভিন্ন রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং ব্যাঙ্গালোর ও কলিকাতার আশ্রমসমূহে ব্যবহারার্থ বহু হাজার টাকা মূল্যের নারিকেলী চাটাই দান করেন। এই ভ্রমণে স্বামী নির্মলানন্দ

মুত্তমে রামকৃষ্ণ আশ্রমের ভিত্তিস্থাপনও করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে পূর্ণিমা দিবসে বিহিত অনুষ্ঠান সহকারে এই আশ্রম স্থাপিত হয়। তদীয় ঈশ্বরকোটী গুরুভ্রাতা প্রেমানন্দ স্বামীজির পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থ তিনি এই আশ্রমের নাম রাখেন প্রেমানন্দ আশ্রম। স্বামী নির্মলানন্দের গুরুভ্রাতৃপ্রেম অসাধারণ ও অনুকরণীয়।

পঁচিশ

উত্তর ভারতে দশ মাস

সংঘগুরু ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মহাসমাধির সহিত রামকৃষ্ণ মিশনের আদি যুগের অবসান হয়। তিনি ছিলেন গুরুভ্রাতৃবৃন্দের দৈবনির্দিষ্ট রাজা, সকলের পূজ্য। তিনি স্বয়ং মিশনের পরিচালন বা তত্ত্বাবধান করিতেন না এবং কোন নির্দেশও দিতেন না। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও প্রেরণায় এই সংঘ চলিত। তৎপরে মহাপুরুষ শিবানন্দ মহারাজ দ্বিতীয় অধ্যক্ষ রূপে নির্বাচিত হন। তিনি আর একবার দক্ষিণ ভারত পর্যটনের সংকল্প করেন। তদনুসারে তিনি মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে যান ও তথা হইতে স্বাস্থ্যকর নীলগিরিতে উপস্থিত হন। স্বামী নির্মলানন্দের দুই ভক্ত পূর্বোক্ত চেম্পাল্লী ভ্রাতৃদ্বয় তখন তথায় ছিলেন।

তাঁহারা মহাপুরুষজীকে দর্শন ও প্রণাম করিতে যান এবং মহাপুরুষজীও ভক্তিমান্ ভ্রাতৃদ্বয়কে কৃপাপূর্বক মন্ত্রদীক্ষা দেন। তাঁহাদের ভক্তিপূত নিমন্ত্রণে তিনি তাঁহাদের বাসগৃহেও পদার্পণ ও ভিক্ষাগ্রহণ করেন। উক্ত গৃহের দোতলায় উঠিবার সময় তিনি নির্মলানন্দজীর একটি পূর্ণাকৃতি বৃহৎ ফটো দেওয়ালে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, 'বেশ, তুলসী মহারাজ এখানে পূর্বেই এসেছেন।' এই কথা বলিয়া তিনি প্রীতিভরে সেই ফটো স্পর্শ করিলেন। স্বামী নির্মলানন্দও শুনিয়া সুখী হইলেন যে, উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় মহাপুরুষজীর কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১৪ খ্রীঃ পহেলা জুলাই তিনি উহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখিলেন, "তোমার পত্র পাইয়া এবং তোমরা দুই ভাই মহাপুরুষজীর কৃপালাভে ধন্য হইয়াছ জানিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। তিনি অন্যান্য সাধু সহ তোমাদের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া আরও আনন্দিত

হইলাম। তথায় আশ্রম স্থাপনার্থ জমি নির্বাচিত ও মিশনের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়াছে এবং তোমার দাদা পরে আমাকে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ দিবেন জানিয়া খুব সুখী হইলাম। এই পত্র প্রাপ্তির পর যখন তুমি আবার মহাপুরুষজীকে দর্শন করিতে যাইবে তাঁহাকে আমার ভালবাসা ও সাষ্টাঙ্গ জানাইবে।”

মহাপুরুষ মহারাজ ২৮শে জুলাই ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে উপনীত হইলেন। ঠিক সেই সময়ে কেরল প্রদেশে প্রবল বন্যা হয় ও ইহার ফলে বহু জনের মহাবিপদ ও সর্বনাশ ঘটে। ত্রিবাংকুরে বন্যাপীড়িতদের সেবা কার্যের জন্য স্বামী নির্মলানন্দজী অবিলম্বে স্বামী সুখানন্দ ও স্বামী দেশিকানন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ত্রিবান্দ্রম ও আল্লেপ্পি আশ্রমদ্বয়ের সাধুবৃন্দও এই সেবাকার্যে অচিরে যোগ দিলেন। ইহা কয়েকমাস ধরিয়া চলে ও ইহাতে বিশ হাজারের অধিক টাকা দুর্গতদের মধ্যে বিতারিত হয়। এই সময়ে মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের নিকট হইতে স্বামী নির্মলানন্দ জরুরী আহ্বান পান ও ১৯২৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে কলিকাতায় যান। তখন হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত দশ মাস যাবৎ তিনি উত্তর ভারতে থাকেন ও সংঘগুরু মহাপুরুষজী দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করেন। এই দশ মাসে নির্মলানন্দজী সমগ্র উত্তর ভারতে ব্যাপক ভ্রমণ ও প্রচারকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

পূর্ববৎ তিনি সর্বদা কর্মরত ও ভ্রাম্যমান ছিলেন এবং এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে যাইয়া ধর্মপিপাসুগণের মধ্যে ধর্ম-সুধা বিতরণ ও পবিত্রাত্মাদিগকে অধ্যাত্ম আলোক প্রদানাদিতে সতত ব্যাপৃত থাকিতেন। বস্তুতঃ তিনি সর্বত্র ধর্মমেঘবৎ জ্ঞান, শান্তি ও প্রেম বর্ষণ করিতেছিলেন। এই বারও তিনি নানাস্থানে অসংখ্য বন্ধু, ভক্ত ও শিষ্য করিলেন। তিনি পাটনা, ছাপরা, বেনারস, সেওয়ান, ঢাকা, মৈমনসিং দিনাজপুর, কুমিল্লা ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিলেন। এই সকল স্থানের মধ্যে অধিকাংশগুলিতে তিনি একাধিক বার গমনপূর্বক তপোলব্ধ সুদুর্লভ জ্ঞানালোক সকলকে অকাতরে বিতরণ করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসর তিনি এই স্থানসমূহে যাইতেন এবং ভক্তদের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। আর যেখানে রামকৃষ্ণ আশ্রম ছিল তথায় আশ্রমের অতিথি হইতেন। যেখানে তিনি যাইতেন তথায় শত শত নরনারী তাঁহাকে দর্শন করিতে, তাঁহার উপদেশ শুনিতে এবং তাঁহার

সংস্পর্শে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিতে আসিতেন। কলিকাতা হইতে কাশীধাম যাইবার পথে তিনি পাটনা ও ছাপরায় বিশ্রাম করেন। পাটনায় বিভূতিরঞ্জন ঘোষ, শম্ভুপরমেশ্বর প্রসাদ, নন্দীপতি মুখোপাধ্যায়, উমাচন্দ্র সেন মজুমদার, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শংকরমৌলি দত্ত, প্রবোধ রায়চৌধুরী, জীবন কুমার আচার্য, প্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রায় সাহেব বিমান বিহারী বসু ব্যাঙ্গালোরে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করেন। পাটনায় তিনি যতবার গিয়াছেন প্রায়ই নন্দীপতি মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। আর ছাপরায় যাইলেই তিনি কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের গৃহে অতিথি হইতেন। উল্লিখিত ভক্তবৃন্দ ব্যক্তিগত ভাবে স্বামীজির অনুরাগী হন নাই, তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রকন্যাদিও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সর্বত্র শিশুগণই তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র ছিল। তিনি তাহাদের সহিত খেলিতেন ও গল্প করিতেন, মাতা বা পিতার ন্যায় তাহাদিগকে স্নেহ-আদর করিতেন ও উপহার বা প্রসাদ দিতেন এবং ক্রীড়াচ্ছলে ধর্মশিক্ষা দিয়া উচ্চতর লক্ষ্যে তাহাদের মনের গতি ফিরাইয়া দিতেন। বর্তমানের নরনারী অপেক্ষা ভাবী বংশধরগণের কল্যাণ সাধনে তিনি অধিকতর মনোযোগ দিতেন। শিশুদের নিকট তিনি ধর্মশিক্ষক সাজিতেন না; তাহাদের নিকট তিনি প্রিয়জন বা ক্রীড়াসঙ্গী বা অভিভাবকের স্থান লইতেন। সেইজন্য শিশুর দলও সর্বত্র নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকট ভিড় করিত। শুধু শিশুগণ নহে, বয়স্কগণ ধর্মানুরাগী না হইয়াও তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন; কারণ স্বামীজির নিঃস্বার্থপরতা, সরলতা, কর্মদক্ষতা, স্পষ্টবাদিতা ও মানবপ্রেম প্রভৃতি সদ্গুণ তাহাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

সাধারণতঃ যিনি তাঁহার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতেন তিনিই তন্মধ্যে হিতাকাংক্ষী বা পথপ্রদর্শক পাইতেন। বিশেষতঃ দরিদ্র, দুর্বল ও অনাথ নরনারীগণই তাঁহার কৃপাপাত্র ছিল। অযাচিত, অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত ভাবেই তিনি সকলের দুঃখ দূর করিতেন। অনেক দরিদ্র ছাত্র ও অসংখ্য দরিদ্র পরিবারকে তিনি অর্থাদি সাহায্য করিতেন এবং দুঃখ-দৈন্যের সময়ে কাহাকেও সান্ত্বনা প্রদানে কাতর হইতেন না। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ নয়ন ও সহায়ক হস্তদ্বয় সর্বোপরি প্রসারিত হইত। ১৯৩৪ খ্রীঃ স্বামী নির্মলানন্দ সর্বপ্রথম পাটনা সহরে যান। তৎপরে তিনি বহুবার তথায় গিয়াছেন ও বহু শিষ্য করিয়াছেন। প্রথম গমনে

কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি তথায় কয়েক দিন থাকিয়া কাশীতে যান ও অনতিবিলম্বে পাটনায় ফিরিয়া আসেন। সেবার যখন তিনি স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের ফটকের সম্মুখে মোটর গাড়ী হইতে নামেন, তখন অধ্যাপক নন্দীপতি মুখোপাধ্যায়ের উপর তাঁহার সুদৃষ্টি পড়িল ও তিনি সহাস্যে বলিলেন, তোমার জন্যই এসেছি। নন্দীপতি বাবু এই উক্তির তাৎপর্য বুঝিলেন ও তাঁহার নিকট দীক্ষা লইলেন।

পাটনায় যখন শম্ভু পরমেশ্বর প্রসাদ দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাকে কাশীধামে যাইতে বলিলেন। শম্ভুপ্রসাদ তদনুসারে একাকী কাশীতে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি বিবাহিত গৃহস্থ। সস্ত্রীক দীক্ষাগ্রহণ তোমার কর্তব্য।" শম্ভু প্রসাদ পাটনায় ফিরিয়া তাঁহার পত্নীকে লইয়া পুনরায় কাশীতে গেলেন। পুণ্যতীর্থ কাশীধামের চতুঃসীমার মধ্যে দীক্ষাদান প্রচলিত নহে; কারণ তথায় বাবা বিশ্বনাথই স্বয়ং মন্ত্রদাতা ও মুক্তিদাতা। সেইজন্য স্বামীজি সস্ত্রীক শম্ভুপ্রসাদকে কাশীর বাহিরে লইয়া যাইয়া দীক্ষা দিলেন। সেওয়ানের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের ধর্মপত্নী অন্নপূর্ণা দেবী সদ্গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণে ব্যাকুল হন। তিনি বহু সাধু দর্শন করিলেন; কিন্তু কাহকেও তাঁহার পছন্দ হইল না। অবশেষে তিনি গ্রীষ্মকালে একদিন দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে কাশীস্থ রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে গুরুর সন্ধানে যান। তিনি আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক স্বামী-নির্মলানন্দকে প্রশান্ত প্রসন্ন বদনে উপবিষ্ট দেখিলেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প করিলেন। স্বামীজি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন ও বহুকালের পরিচিত প্রিয়জনবৎ সস্নেহে আলাপাদি করেন। অন্নপূর্ণা দেবী কাশীর বাহিরে তাঁহার নিকট দীক্ষালাভ করেন।

কলিকাতা নগরীর বাগবাজার পল্লীবাসী কিরণচন্দ্র দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ দীক্ষাপ্রার্থী হন। তখন ধীরেন্দ্রনাথ কাশীধামস্থ স্বীয় গৃহেই অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাকে কাশীধামের মধ্যে দীক্ষাদানে অসম্মত হন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যগণও এই প্রবুদ্ধ প্রথা মানিয়া চলিতেন। বাঁকুড়ার ভক্ত বিভূতি ঘোষও ধীরেন্দ্রনাথের জন্য স্বামী নির্মলানন্দকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন; কিন্তু স্বামীজি তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। অনুরাগী গুরুভক্ত ধীরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "আমার সঙ্গে বাস করিবার তৃতীয় রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিলাম

যে, মহারাজ আমাকে মন্ত্র দীক্ষার জন্য ডাকিতেছেন এবং আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। অতি প্রত্যূষে আমি তাঁহার মধুর আহ্বান শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। তখন আমার বাড়ীর প্রায় সকলেই নিদ্রিত ছিলেন। স্বামীজি আমাকে স্নান সমাপনান্তে দীক্ষা লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। খুব সুখী বোধ করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণকালের জন্য চমৎকৃত হইয়া আমি সেই ঘরে গেলাম, যথায় তিনি বিশ্রাম লইতেন। আমি দেখিলাম যে, তিনি আমাদের বাগান হইতে কিছু ফুল ইতি মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং দর্শকবৃন্দ তাঁহাকে যে সব ফল উপহার দিতেন তাহার কিছু তথায় রাখিয়াছেন। আমি তৎসমীপে আসন গ্রহণ করিলাম এবং স্বামীজি আমাকে মন্ত্র-দীক্ষা দানে কৃতার্থ করিলেন। তিনি কোনও অর্থ গুরুদক্ষিণা রূপে লইলেন না। তিনি মৃদু হাস্যে আমাকে বলিলেন, "একটি ফল হাতে নিয়ে আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।" নির্বাক বিস্ময়ে আমি তাঁহার আদেশ পালন করিলাম। একটু পরে সূর্য উঠিল এবং দর্শকবৃন্দ আসিতে লাগিলেন। আমার ন্যায় ডাক্তার খান্দালওয়ালাও তাঁহার নিকট মন্ত্র-দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনিও তখন আসিলেন ও মন্ত্র-দীক্ষা লাভে ধন্য হইলেন। পাটনায় স্বামীজির কোনও শিষ্যের ভ্রাতা তাঁহার নিকট দীক্ষা লইতে একান্ত উৎসুক হইলেও গম্ভীরভাবে স্বামীজি তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। ইহাতে স্থানীয় আশ্রমের সাধুবৃন্দ এবং অন্যান্য ভক্ত তাঁহার জন্য স্বামীজিকে ধরিয়া বসেন। তাঁহাদের অনুরোধ এত প্রবল হইল যে, অন্তর্যামী স্বামীজি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে দীক্ষা দিলেন।

দীক্ষা লাভের কিছুকাল পরে উক্ত ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুর ও তৎ শিষ্যবৃন্দকে নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হন। একদিন তিনি যখন পূর্বোক্ত দুষ্কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন সুস্পষ্ট স্বরে স্বামী নির্মলানন্দকে বলিতে শুনিলেন "এখন হইতে তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই এবং তুমি আমার শিষ্য নও।" তখন গুরু ত্রিবান্দ্রামে ও শিষ্য পাটনায়, উভয়ের মধ্যে প্রায় দুই হাজার মাইলের ব্যবধান। এই আকাশ বাণী শুনিবার পর শিষ্য গুরুকে কয়েকখানি চিঠি লিখিয়াও কোন উত্তর পান নাই।

পাটনার এক প্রধান উকিল স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনো সিদ্ধ গুরুর কৃপায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব কিনা। তৎক্ষণাৎ স্বামীজি উত্তর দিলেন, "ইহা নিশ্চয়ই সম্ভব।" অনন্তর তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিলেন "মনে করুন কোনো

লক্ষপতির বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া এক ভিক্ষুক যাইতেছে, লক্ষপতি উক্ত ভিক্ষুককে দেখিয়া দয়ার্দ্র হইলেন এবং তাঁহার কোষাগার হইতে একলক্ষ টাকা লইয়া তাহাকে দান করিলেন, একদিনেই সেই রিক্ত ব্যক্তি ধনপতি হইল; কিন্তু লক্ষপতির কোষাগারের বিশেষ হ্রাস পাইল না। তদ্রূপ কোনো সিদ্ধ সাধু বহু জন্মার্জিত পুণ্যফলে বিপুল অধ্যাত্ম সম্পদ প্রাপ্ত হন। উহার এক অংশ কাহাকেও দিয়া তিনি তাহাকে মুক্ত করিতে পারেন। এইরূপে যাঁহারা ঈশ্বর বা মহাত্মার কৃপায় সিদ্ধি লাভ করেন তাঁহারা কৃপা-সিদ্ধ। ঈশ্বর-কৃপা বা গুরু-কৃপা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।"

স্বামী নির্মলানন্দকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সিদ্ধ পুরুষ সর্বজ্ঞ হন কিনা! তিনি কি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সব তত্ত্ব জানিতে পারেন? স্বামীজি উত্তর দিলেন "ইহা খুবই সম্ভব; যিনি ঈশ্বর উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি সব কিছু জানিতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত অন্য বস্তুর উপর তিনি মন দেন না এবং কিরূপে জগৎ চালিত হয় তাহাও জানিতে চান না বা যাঁহারা আধিকারিক পুরুষ তাঁহারা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া দেহধারণ করেন এবং তাঁহারাই সৃষ্টি তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারেন"। পূর্বোক্ত প্রবীণ উকিল স্বামীজিকে আর এক প্রশ্ন করিলেন, "অসৎ কর্মকে নষ্ট করা অথবা উহার ফল হ্রাস করা সৎ কর্মের দ্বারা সম্ভব কি?" স্বামীজি উত্তর দিলেন 'কুকর্মের ফল কিঞ্চিৎ লাঘব হয় এবং বিরল ক্ষেত্রে উহা নষ্ট হয় সৎকর্ম দ্বারা, যদি সেই সৎকর্ম তদুদ্দেশ্যে সম্পাদিত এবং কুকর্ম তুল্য অথবা তদপেক্ষা শক্তিশালী হয়।"

একদা কোনও ভক্তের দ্বিতীয় পুত্র চরিত্রহীন বালকদের সঙ্গে মাতা-পিতাকে না বলিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া যায়। সে কোথায় গেল, কেহ জানিত না। দুই মাস যাবৎ তাহার কোনও সন্ধানও পাওয়া গেল না। তাহার সন্ধান লাভের সর্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইল এবং ঘটনাটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। পুত্রপ্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অবশেষে শোকার্ত পিতা সমস্ত বিষয় স্বামীজিকে লিখিয়া জানাইলেন এবং আশঙ্কা করিলেন—নিরুদ্দিষ্ট পুত্র বোধ হয় জীবিত নাই। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন স্বামীজি অবিলম্বে উত্তর দিলেন, "কোনও চিন্তা করিবেন না, বালক নিরাপদে আছে এবং শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।" তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে সত্যই বালক ফিরিয়া আসিল এবং সিদ্ধ সাধুর ভবিষ্যৎ বাণী যথার্থ হইল।

এইরূপ অনেক অলৌকিক ঘটনা স্বামীজির পাটনায় অবস্থান কালে ঘটিয়াছিল। বিহারে "সেওয়ান" নামক স্থানে তিনি বার্ষিক গমন করিতেন। তথায় তিনি ভক্তিমতী শিষ্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর আতিথ্য স্বীকার করিতেন। এই অন্নপূর্ণা দেবীকে তিনি কাশীধামে দীক্ষা দিয়াছিলেন। "সেওয়ানে" স্বামীজির বহু শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। অন্নপূর্ণার কন্যা জয়া লক্ষ্ণৌ সহরের রেলওয়ে ইঞ্জিয়ার শ্রীহরিহর চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরিণীতা হন। তাঁহার বিবাহের পরে স্বামীজি লক্ষ্ণৌতেও যাইতেন।

উত্তর প্রদেশে এবং বিহারে প্রথম দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ করিয়া স্বামীজি কলিকাতায় ফিরিলেন ও তথা হইতে তিনি পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে চলিলেন। পূর্ববঙ্গে নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী দেওভোগ গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত ৺দুর্গাচরণ নাগ আবির্ভূত হন। তাঁহার অবস্থান ও তপস্যার ফলে উক্ত স্থান তীর্থীভূত। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবিতকালে পূর্ববঙ্গে বহু ব্যক্তি রামকৃষ্ণ আন্দোলনে আকৃষ্ট হন নাই। পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ ও নির্মলানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ তথায় গমনপূর্বক বহু আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

তথাপি বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় তথায় ব্যাপক জাগরণ হয় নাই। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নির্মলান্দ তথায় যাইয়া দীর্ঘকাল প্রচার করেন এবং পরবর্তী বৎসর সমূহেও পুনঃ পুনঃ গমন করেন। তথায় তিনি অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া শত শত ধর্মপিপাসুকে প্রেরণা দান করেন এবং মন্ত্রদীক্ষা দেন। তৎ কর্তৃক প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া বহু শিক্ষিত যুবক রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। তন্মধ্যে কয়েকজন এখন মিশনের কর্মঠ অভিজ্ঞ সেবক। ঢাকায় অধিকাংশ সময় তিনি স্থানীয় মঠে কাটাইতেন। মৈমনসিংহ, কুমিল্লা, শিলং ও বরিশালে প্রেরণাপ্রদ উপদেশ দিয়া তিনি অসংখ্য নরনারীকে ধর্ম ভাবে উদ্বুদ্ধ করেন।

মৈমনসিংহ শহরে তাঁহার কয়েকটি শিষ্য একটি ক্ষুদ্র আশ্রমে স্থাপন পূর্বক ঠাকুরের পূজারতি করিতে থাকেন। কুমিল্লাতে স্বামী নির্মলানন্দ ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষের অতিথি ছিলেন। উক্ত ডাক্তারের ধর্মপত্নী স্বামীজিকে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে দেখিয়াছিলেন। অঘোরবাবু যখন দিনাজপুরে সিভিল সার্জন ছিলেন সেখানেও স্বামীজি তাঁহাদের অতিথি হন। উক্ত ডাক্তার

যখন কুমিল্লায় ছিলেন তাঁহার বাসায় স্বামীজি স্থানীয় নিবেদিতা বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রী ও শিক্ষিকাকে মন্ত্র-দীক্ষা দেন। তথায় এক নিম্নজাতীয়া ছাত্রী ছিল, যাহার বুদ্ধি বয়স অনুসারে অপেক্ষাকৃত অপরিণত ছিল। তাহাকে সকলেই অবহেলা করিত, ইহা লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি ব্যথিত হন এবং তাহাকে দীক্ষা দেন। তিনি ডাক্তারের পত্নীকে জিজ্ঞাসা করেন—"এই নিম্নজাতীয়া বালিকাকে আপনি দয়া করে ঠাকুরঘরে যেতে দেবেন কি?" অবশ্য ইহাতে গৃহকর্ত্রীর কোনও আপত্তি হইল না এবং স্বামীজি তাহাকে ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া দীক্ষা দিলেন। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি স্বামীজির অনুকম্পা এত অধিক ছিল যে, তিনি বাণ্ডিল বাণ্ডিল কাপড় জামা কিনিয়া তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। কুমিল্লায় তাঁর অবস্থান সুদীর্ঘ উৎসবে পরিণত হইল। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রিগণ এবং শিক্ষক-অধ্যাপকগণ এই উৎসবে দলে দলে যোগদান করিতেন। একদা তিনি জ্বরাক্রান্ত হইয়া কয়েকদিন কষ্ট ভোগ করেন। ডাক্তার চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেলুড় মঠে বা ঢাকা মঠে খবর দিব কি?" স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন? কি জন্য?"

ডাক্তার বলিলেন—"স্বামীজি আপনার সেবার জন্য।"

স্বামীজি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—"আপনি কি আমার শুশ্রূষা করিতেছেন না? এখানে কি সেবার কোনও অভাব হইতেছে? আপনি কি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন?" এই বলিয়া স্বামীজি ডাক্তারকে বেলুড়মঠে বা ঢাকা মঠে খবর দিতে নিষেধ করিলেন। যদিও তিনি দীর্ঘস্থায়ী জ্বররোগে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন তথাপি তাঁহার মলমূত্র ত্যাগের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে দেন নাই। একদা তিনি পায়খানা হইতে ফিরিয়া দেখিলেন—তাঁহার বিছানা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ও বিষণ্ন হইয়া দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—"কে আমার বিছানায় হাত দিয়েছে?" ইহাতে তিনি বিচলিত হইয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিলেন এবং গঙ্গাজল আনাইয়া বিছানার উপর ছিটাইয়া দিলেন এবং অনুচ্চস্বরে বলিলেন "অসৎ-চিন্তাগ্রস্ত লোকে আমার বিছানা যেন কখনও না ছোঁয়।"

কোনও ব্যক্তির সুদীর্ঘ অসুখ সম্পর্কে বলিবার সময় স্বামীজি ডাক্তারের দ্বিতীয়া দুহিতাকে বলিয়াছিলেন "আমি রোগশয্যায় বেশী ভুগিব না।

আমি অসুখে পড়িয়াছি ইহা কেহ জানিবার পূর্বেই আমার হঠাৎ দেহত্যাগ হইবে।"

তিনি উক্ত কন্যার অনুরূপ মৃত্যুর ভবিষ্যৎবাণী করিলেন এবং যথাকালে ইহা সত্যও হইয়াছিল। স্বামী নির্মলানন্দ সিদ্ধাই বা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন "যদি অলৌকিকতা দেখিতে চাও নাগ মহাশয়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর। তিনি ছিলেন ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধাই।" এই ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে, যে কয়জন ভাগ্যবান তাঁহাকে অতিথিরূপে পাইয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে ধর্ম বা দর্শন সম্বন্ধে যে কোনও প্রশ্ন করিতে পারিতেন, তাঁহাকে পাইয়া তাঁহারা সুখী হইতেন। তাঁহার অসীম স্নেহ-প্রীতি অনুভব করিতেন এবং প্রতিদানে তাঁহাকেও ভালবাসিতেন। তাঁহাদের কোনও সন্দেহ থাকিলে তিনি নীরবে তাহা ভঞ্জন করিতেন। প্রশ্ন করা ও উত্তর পাইবার ভার সাধারণতঃ দর্শকদের উপর পড়িত। অনুর্বর জমিতে বীজ উপ্ত হইয়া থাকিলে তিনি ঐ জমিকে উর্বর করার জন্য সচেষ্ট হইতেন। উর্বর জমি পাইলে তথায় বীজবপন করিতে ব্যগ্র হইতেন। পুরাতন চারাগাছগুলিকে কিঞ্চিৎ সবল করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন।

ছাব্বিশ

জ্ঞানালোক বিকিরণ

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া তিনি বোম্বাই নগরে গেলেন। উক্ত নগরে প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্যার ঈশ্বরদাস লক্ষ্মীদাস এবং তৎপুত্র শেঠ পুরুষোত্তম দাস ঈশ্বর দাস তাঁহার পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহারা ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোর যাইয়া আশ্রমের সম্মুখে এক বড় বাংলোতে দেড় বৎসর বাস করেন, তখন তাঁহাদের সহিত যে পরিচয় হয়, তাহা ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্যে পরিণত হয়। স্বামীজি তাঁহাদের পরিবারের স্বজন ও শিক্ষকরূপে গণ্য হইতেন। তাঁহাদের অনেক আত্মীয় এবং কুটুম্ব ও স্বামীজির সহিত সু-পরিচিত হন। এবং তৎ কর্তৃক দীক্ষিত হন। তাঁহাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্বক প্রায় প্রতি বৎসর তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতেন তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় ও সন্তোষ বিধানে তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইতেন এবং তাঁহার

ঈপ্সিত কার্যসাধনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহারাই ত্রিবান্দ্রামে রামকৃষ্ণ আশ্রমে চারি হাজার টাকা ব্যয়ে বিজলী বাতি বসাইতে তাঁহাকে সমর্থ করেন। অসংখ্য দরিদ্র ছাত্র ও অনাথা বিধবাকে নিয়মিত সাহায্য করিবার জন্য তাঁহারা বিপুল অর্থ যোগাইতেন। এই সকল গুপ্তদান ও অন্যান্য সাহায্যের কথা স্বামীজি বা তাঁহারা সাধারণকে কিছুমাত্র জানাইতে চাহিতেন না। এই সম্বন্ধে কোথাও কোনও উল্লেখ বা প্রচার তাঁহারা পছন্দ করিতেন না। স্বামীজিও এই ব্যাপারে তাঁহাদের অভিলাষ এত আক্ষরিক ভাবে মানিয়া চলিতেন যে, এই বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলেও তিনি নীরব থাকিতেন। বোম্বাইতে কিছুদিন কাটাইয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ব্যাঙ্গালোর প্রত্যাগমন করেন। তথায় প্রত্যহ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা প্রসারিত ও পরিপুষ্ট হইতেছিল। তখন স্থানীয় বিদ্যমান ছাত্রাবাসের গৃহনির্মাণার্থে মহীশূর সরকার পনের হাজার বর্গফুট জমি বিনা সর্তে দান করেন। আশ্রমকার্যের তত্ত্বাবধান, সর্ব কর্মে সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য কেন্দ্রের প্রগতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্বামীজি জুলাই পর্যন্ত তথায় রহিলেন। অনন্তর তিনি কেরলের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং পথিমধ্যে নানা কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া উক্ত বর্ষের আগষ্ট মাসে ত্রিবান্দ্রামে পৌছিলেন।

ত্রিবান্দ্রাম আশ্রমের গৃহপ্রসারণ প্রয়োজনীয় ছিল। আশ্রমের চারিদিকে পার্বত্য জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া উপকারী বৃক্ষ ও ফুল-ফলের গাছ রোপণ করা ও আবশ্যক গৃহের নক্সা অঙ্কন ও অন্যান্য কার্যানুষ্ঠান নিজ অর্থে করাইয়া তিনি তথায় মাসাধিককাল কাটাইলেন। এইবার তিনি সাতজন ব্রহ্মচারীকে পূর্ববৎ বিরজা হোম করাইয়া সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিলেন এবং তাঁহাদের নাম রাখিলেন—স্বামী নৃসিংহানন্দ, ওজসানন্দ, ঊর্জসানন্দ, পুরঞ্জনানন্দ, বালকৃষ্ণানন্দ, আর্জবানন্দ ও উমেশানন্দ। ভক্তবর শ্রীকুন্হীরমণ মেনন ঠাকুরঘর নির্মাণে যথেষ্ট অর্থদান করেন। দৈবাৎ তিনি দেহত্যাগ করায় তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীশঙ্কর মেনন্ ওরফে স্বামী অমলানন্দ তাঁহার পুণ্য স্মৃতিতে নিত্য ঠাকুর পূজাদির জন্য তিন হাজার টাকা দান করিলেন। স্বামীজি তৎপর মুণ্ডমে প্রেমানন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া মাদ্রাজ হইয়া ব্যাঙ্গালোর ফিরিলেন।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নির্মলানন্দ তৃতীয়বার কূর্গে গমন করেন। তিনি বিরাজপেটে আসিয়াছেন শুনিয়া অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ডিরেক্টর অব এগ্রিকাল্‌চার শ্রীচেঙ্গাপ্পা

তাঁহাকে পোন্নামাপেটে যাইতে আহ্বান করেন। এই আমন্ত্রণ সাদরে গৃহীত হইল এবং স্বামীজি মোটরকারে পোন্নামাপেটে গেলেন। উক্ত স্থানের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার দর্শনার্থ সমবেত হন। অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল। তাঁহার উত্তরাবলী ও কথোপকথন এত হৃদয় গ্রাহী হইল যে, তথায় আশ্রম স্থাপনের সংকল্প ভক্তদের অন্তরে দৃঢ়মূল হইল।

পোন্নামাপেটে তাঁহাকে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত নৈতিক জীবনের সরলতা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করা হইল। স্বামীজি আগ্নেয় উত্তরে বলিলেন—"এইরূপ প্রবর্তন প্রগতি বিরোধী। মোটের উপর ভারতীয়গণ কি সরল জীবন, সন্তোষময় জীবন যাপন করিতেছে না? সেই সন্তোষপূর্ণভাবে জীবনযাপন সম্ভোগের ফল নহে; উহা অলসতা, নিরাশ্রয় এবং উচ্চতর ও মহত্তর কর্ম সম্পাদনের অক্ষমতা হইতে উদ্ভুত, এই তমোজাত পরিতৃপ্তি হইতে মানুষকে জাগ্রত ও উন্নত করিতে হইবে। এই তৃপ্তি মৃত্যুর চিহ্ন, ইহা জীবনের নিদর্শন নহে নিরন্তন সংগ্রামের পরে যে সাত্ত্বিক অবস্থা লাভ হয়, ইহা তাহার চিহ্ন নহে; আমাদের দেশের লোকেরা যথোচিত জীবন সম্ভোগ করে নাই, আমাদের জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিতে হইবে, অবনত করা অনিষ্টকর, ত্যাগ করার পূর্বে ভোগ করা দরকার। জীবনের সর্বাঙ্গীণ অভিজ্ঞতা পুরামাত্রায় উপভোগ না করিলে খাঁটী ত্যাগ হয় না।"

একই সময়ে তিনি সমালোচনা করিলেন, যে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি ও জীবনধারার অনুকরণ করা আমাদের পক্ষে অনুচিত। অন্যত্র তিনি আমাদের দেশবাসীদের অনুন্নত জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আবেগ সহকারে বলিতেন।

পোন্নামাপেট হইতে বিদায়ের পূর্বে তিনি চেঙ্গাপ্পা ও তাঁহার আত্মীয় যুগলকে পরদিন প্রাতে বিরাজপেটে তৎসমীপে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা তাঁহার নির্দেশ অনুসারে তথায় যথাকালে যাইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভে ধন্য হন।

চার বৎসর পূর্বে প্রথম সংঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দজী দেহরক্ষা করিয়াছেন। মিশন ও উহার কার্য দ্রুতবেগে প্রসার লাভ করিয়াছে, কেবল তাঁহার অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও মঙ্গলময় স্নেহ-শাসন অন্তর্হিত। তাঁহার অনুপস্থিতিতে বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ অনুভব করিলেন, সম্প্রসারণশীল সংঘের উপর কোনও প্রকার

সর্বময় কর্তৃত্বের প্রয়োজন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে বেলুড় মঠের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধুবৃন্দ ও ভক্তগণের মহাসম্মেলন আহূত হইল। স্বামী নির্মলানন্দ আমন্ত্রিত হইলেন, এবং স্বামী সারদানন্দ তখন তথায় যাইবার জন্য তাঁহাকে স-প্রেম আহ্বান জানাইলেন। স্বামীজি তাঁহাদের আহ্বানে সত্বর সাড়া দিলেন ও ২রা ডিসেম্বর কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। বেলুড় মঠ হইতে আবার তিনি উত্তর ভারতের নানা আশ্রম পরিদর্শন পূর্বক হরিদ্বার পর্যন্ত গেলেন। তিনি হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া সম্মেলনে যোগ দিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় (২২৩ পৃষ্ঠায়) কোনও পর্যবেক্ষক কর্তৃক ইহার নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। সারাদিনের কর্মসূচী সমাপ্তির পর সাধারণতঃ সন্ধ্যায় প্রশ্নোত্তর বৈঠক আয়োজন করা হইত। ইহাতে সংঘের প্রধান সন্ন্যাসীবৃন্দ ধর্ম ও কর্ম সম্বন্ধে প্রতিনিধিবৃন্দ ও দর্শকগণের সন্দেহ ভঞ্জনের সুযোগ দিতেন। স্বামী শিবানন্দ, সারদানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ, অভেদানন্দ, সুবোধানন্দ ও নির্মলানন্দ প্রভৃতি সকলেই অল্পাধিক কাল শ্রীশ্রীঠাকুরের পদপ্রান্তে উপবেশনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে এই মহাসংঘের তরুণ সাধু-ভক্তদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সকল সাধারণ বৈঠক সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ হইয়া উঠিল। অনেকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, ঠাকুরের এতগুলি সাক্ষাৎ শিষ্যকে একত্র দর্শনের অপূর্ব সুযোগ হয়তো আর এই জীবনে মিলিবে না। স্বামী নির্মলানন্দ বেলুড় মঠ হইতে যথা সময়ে ফিরিলেন এবং তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দকে ব্যাঙ্গালোরে স্বাগত জানাইলেন। মহাপুরুষ শিবানন্দজী ২২শে অক্টোবর ব্যাঙ্গালোর শুভাগমন করেন এবং তাঁহাকে লইয়া স্বামী নির্মলানন্দ ২৮শে নভেম্বর মাদ্রাজে উপনীত হন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত ইংরাজী মাসিক 'বেদান্ত কেশরী'তে প্রকাশিত হয়। স্বামী নির্মলানন্দ সেইবার মাদ্রাজ মঠে চার দিন অবস্থান করেন এবং ২০শে নভেম্বর স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দকে ধর্মোপদেশ দেন। ২৯শে তারিখে তিনি রামকৃষ্ণ মঠে সমবেত সাধু-ভক্তদিগকে অগ্নিময় বাগ্মিতাপূর্ণ ধর্মপ্রসঙ্গে চমৎকৃত করেন এবং সেই রাত্রেই ব্যাঙ্গালোর যাত্রা করেন।

সাতাশ

ওট্টাপালমে নিরঞ্জন আশ্রম

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে স্বামী নির্মলানন্দ ওট্টাপালমে 'নিরঞ্জন আশ্রম' স্থাপন করিতে যান। ওট্টাপালম রেলওয়ে ষ্টেশনের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাল-পুরম্ নামক গ্রাম বিদ্যমান। উক্ত গ্রামের কতিপয় নাম্বুদ্রির ব্রাহ্মণ ভারত নদীর পূর্ব তীরে এক ছোট গৃহ নির্মাণ করেন। সেই স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। স্বামী নির্মলানন্দের সংস্পর্শে আসিবার পর তাঁহারা অনুভব করিলেন—তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশ্রম প্রস্তাবিত মন্দির অপেক্ষা তাঁহাদের অধ্যাত্ম অভাব অধিকতর পরিমাণে মিটাইবে। স্বামীজির নিকট এই প্রস্তাব করায় তিনি আশ্রম স্থাপন করিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে উক্ত ভূমির সত্বাধিকারী পালথল ইল্লোম তান এবং উহার দখলকারী শ্রীবাসুদেব নাম্বুদ্রিপাদ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত জমি ও বাড়ী স্বামী নির্মলানন্দকে দানপত্র করিয়া দেন, ইহার অদূরে যে বিষ্ণুমন্দির জীর্ণ অবস্থায় ছিল তাহাও স্বামীজিকে দেওয়া হইল। উক্ত মন্দির ও গৃহের মেরামত ও প্রসারণাদি কার্যের জন্য নিম্নোক্ত দুই হাজার টাকা দান পাওয়া গেল ;—পালাতবাড়ীর শ্রীমতী পারকুট্টি আম্মা এক হাজার টাকা, শ্রীশঙ্কর মেনন্ পাঁচশত টাকা এবং কুইল্যাণ্ডী আশ্রম পাঁচশত টাকা। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ অন্যান্য ভক্তবৃন্দ এবং অনুরাগী জনসাধারণের সহায়তায় অন্যান্য বাড়ী ও স্বতন্ত্র ঠাকুরঘর নির্মিত হইল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর শুক্রবার স্বামী নির্মলানন্দ এই আশ্রমে যথাবিধি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাঁহার ঈশ্বরকোটী গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দের পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থ উহার নাম রাখিলেন 'নিরঞ্জন আশ্রম'। পুরানো মন্দিরে যে সুশ্রী বিষ্ণু মূর্তি ছিলেন তাহাও ঠাকুর ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইল। অদ্ভুত, সুখদ ও সুদৃশ্য উক্ত মূর্তির নাম গদাধর বিষ্ণু মূর্তি। পুরানো মন্দির হইতে একটি শিবলিঙ্গ আনিয়া কিছুকাল পরে পৃথক কক্ষে রক্ষিত হয়। পরবর্তী কালে এই লিঙ্গ স্বামীজি কতৃক পঞ্চমুখ শিবমূর্তিতে পরিণত হয়।

প্রয়োজন অনুসারে আশ্রম গৃহ ও প্রাঙ্গণ পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত ও প্রসারিত হইয়াছে। আশ্রম-সংলগ্ন বাগানে নারিকেল গাছ, ফুলগাছ ও আখ গাছগুলির দ্রুত বৃদ্ধি দেখা গেল। ঐ বাগানের পরিমাণ চার একরের অধিক। সুপ্রশস্ত ও বক্রগতি ভারত নদী ও সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র এবং পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে চির হরিৎ সমুচ্চ পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত প্রসারিত অসংখ্য উদ্যান এমন এক মনোহর ভাবোদ্দীপক দৃশ্য সৃষ্টি করে যাহার তুলনা অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। এই ওট্টাপালমের প্রতি স্বামী নির্মলানন্দের অন্তর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। এইখানেই তাঁহার স্থূল দেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইয়াছে। এইস্থানকে তিনি এত ভালবাসিতেন বলিয়াই বোধ হয় তিনি তাঁহার পার্থিব শরীর তথায় রক্ষা করিলেন।

আঠাশ

কূর্গ হইতে ত্রিবান্দ্রাম

সত্বর স্বামী নির্মলানন্দ কূর্গের অন্তর্গত পোন্নামপেটে গেলেন এবং আশ্রমের জমি মনোনীত করিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার তথায় আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন পূর্বক তিনি ব্যাঙ্গালোর ফিরিলেন। উক্ত বর্ষের ৬ই জুন তিনি পুনরায় পোন্নামপেটে আসিলেন আশ্রম গৃহের নির্মাণকার্যের সমাপ্তি দেখিতে এবং দ্বারোদ্‌ঘাটনের দিন স্থির করিতে। ১০ই জুন নূতন আশ্রমের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হইল। তথায় তিনি ১১ই তারিখ পর্যন্ত রহিলেন এবং প্রধান কর্মী শ্রীকাল মাইয়া ও অন্যান্য ভদ্রলোকদের সহিত অনেক ধর্ম প্রসঙ্গ করিলেন। কূর্গে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্বন্ধে তিনি বলিলেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এখন তোমরা একটি আশ্রম পেয়েছ। ইহাই কূর্গ জেলার প্রধান আশ্রম হইবে, ইহার পরে এই জেলায় অন্যান্য ছোট ছোট আশ্রম নানা স্থানে স্থাপিত হইতে পারে। উক্তরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবরাশি এই জেলায় ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হউক। কালক্রমে কূর্গের প্রত্যেক গৃহ এক এক রামকৃষ্ণ মন্দিরে পরিণত হইবে। আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, সেইসব দেখিয়া যাইতে পারিব না কিন্তু আমি দেখিতেছি উহা নিশ্চয় ঘটিবে।" বর্তমান লেখক পোন্নামপেট আশ্রম পরিদর্শন কালে উহার প্রশান্ত নির্জন পরিবেশ চতুর্দিকস্থ প্রাকৃতিক

দৃশ্য এবং মধুমক্ষিকা-পালন-কুটীর দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। স্বামীজি নিজে যে সভাপতির অভিভাষণ দিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে তিনি শ্রীকাল মাইয়াকে বলিয়াছিলেন—"হয় তো তোমাদের এম. এল. সি-গণ ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ এমন কি তুমিও অসন্তুষ্ট হইয়াছ তাহারা তোমাদিগকে সভায় ধন্যবাদ না দেওয়ার জন্য। এই ধন্যবাদ জ্ঞাপনে আমি কি উপকৃত হই, না তাহারা?" ভক্ত কর্মী শ্রীকাল মাইয়া নম্রভাবে উত্তর দিলেন—"না স্বামীজি, তাঁহাদের উচিত আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া।"

স্বামীজি বলিলেন—"না শ্রীগুরু মহারাজকেই ধন্যবাদ প্রদান তাহাদের কর্তব্য ; কারণ তাঁহার অপারকরুণায় এই আশ্রম উৎপন্ন হইয়াছে ; তাঁহার কৃপায় আমি এমন অন্তর্দৃষ্টি—এমন অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়াছি যাহার বলে আমি ঠিক বুঝিতে পারি কোন কোন স্থান তিনি পছন্দ করেন। আমি যখন প্রথম এখানে আসিয়াছিলাম তখন কি আমি বলি নাই যে, এখানে নিশ্চয় একটি আশ্রম হইবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিনা চেষ্টায় আমি ইহা বুঝিতে পারি, আমি জানিতে চেষ্টা করিলে ভুল হইতে পারে। এই আশ্রম নির্মিত হইয়াছে আমার কল্যাণের জন্য নহে—তোমাদের কল্যাণের জন্য। আমি এইখানে একদিনও নাও থাকিতে পারি, ইহা আমার সৃষ্টি নহে—তাঁর সৃষ্টি, সুতরাং এই আশ্রম চলিতে থাকিবে।"

আবার এখানে তিনি এই ভাব প্রকাশ করিলেন যে, "বক্তৃতাবলীর মাধ্যমে নহে কিন্তু ব্যক্তিগত আলোচনার দ্বারাই ধর্মভাব উপদিষ্ট হয়, লোকে প্রভাবিত হয় ও অনুপ্রেরণা পায়। তোমরা কি শ্রীগুরু মহারাজের অপূর্ব জীবনী পড় নাই? 'শ্রীম' কথিত 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পড়িলে দেখিবে—কিরূপে ঠাকুর বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যাইতেন ও ধর্ম প্রসঙ্গ করিতেন, এমন কি স্বামী বিবেকানন্দও কেবল ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দ্বারা মানুষকে ধর্মাভাবে প্রভাবিত করিতেন। সুতরাং লোকের সহিত সাক্ষাৎ করা ও তাহাদিগকে ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ করই এখন ভারতে আবশ্যক।" মালাবার দিয়া স্বামীজি কূর্গ হইতে তেল্লিচেরিতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জুন আসিলেন। তথায় তিনি শ্রীগোপাল মেননের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তথা হইতে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই ত্রিবান্দ্রমে মিউজিয়াম লেক্‌চার হলে স্থানীয় হিন্দু বনিতা সংঘের উদ্যোগে আহূত বৃহতী সভায় স্বামী নির্মলানন্দ যে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন তাহার নিম্নোক্ত সারাংশ উক্ত বর্ষে সেপ্টেম্বর মাসের 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক ইংরাজী মাসিকে প্রকাশিত হয়।

"আমাদের ধর্মকে কর্মজীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদের ধর্মই গৃহস্থ জীবনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। আদর্শ হিন্দু জননীর সুশিক্ষায় ও সান্নিধ্যে আমাদের গৃহস্থাশ্রম মধুময় হইয়া উঠে। পাশ্চাত্ত্য দেশ সমূহে বিশেষতঃ আমেরিকায় প্রচলিত প্রথা অনুসারে তদ্দেশীয় বণিতাবৃন্দ মিশ্রিত সমাজে কৃত্রিম সামাজিকতা ও লৌকিকতার মধ্যে বাস করে। ভারতীয় বিশেষতঃ হিন্দু নারীগণ স্বগৃহে যে নীরব নির্মল সাধনা করেন, তাহা বহির্ভারতে অতুলনীয়। ভারতের এবং আমেরিকার সামাজিক ও পারিবারিক প্রয়োজন অত্যন্ত পৃথক, সুতরাং হিন্দুনারীর অন্তঃপুরস্থ আত্মোৎসর্গ অনিন্দনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদামণি আদর্শ হিন্দুমাতা ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ধর্মানুভূতির কাতর প্রার্থনা করেন যাহাতে তিনিও ঈশ্বর দর্শনের বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইতেন এই ধর্মমূর্তি দেবী পত্নী তাঁহার চরণে প্রণতা হইয়া তাঁহাকে 'মা কালী' বলিয়া ডাকিতেন। ইহাই প্রকৃত স্ত্রীধর্ম কিন্তু আমাদের নারীগণ সম্প্রতি এই আধ্যাত্ম আনন্দের জন্য আকাঙ্খিত না হইলেও চলিবে। ঐহিক উন্নতিলাভের জন্য তাঁহারা এখন যত্ন করিলে সমাজ সমৃদ্ধ হইবে। বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, ক্ষুধার্তকে অন্নদান ও দুঃস্থের অভাবমোচন প্রভৃতি সৎকার্যে আমাদের নারীগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া দরকার। সর্বোপরি স্ব স্ব সন্তানদের জীবন গঠনের দিকে মনোযোগী হওয়া তাঁহাদিগের উচিৎ। কারণ মার্কিন মনীষী এমার্সন সত্যই বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ নাগরিকদের উপর দেশের গৌরব নির্ভর করে। আবার আমাদের পুত্রকন্যাগণকে বিদেশীয় অনুকরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রচীন প্রথার উদ্দেশ্য বুঝিয়া বর্তমান যুগে সর্ব কার্য করিতে হইবে। হারমোনিয়ামের সর্বগ্রাসী শব্দতরঙ্গ ব্যতীত বালিকাগণ গান গাহিলে তাহাদের কণ্ঠস্বর সুমধুর হইবে। বিশুদ্ধ সঙ্গীত ও চারুশিল্প গৃহে গৃহে অনুশীলন করা আবশ্যক। কোনও বস্তু ভালো হইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ইহার যথোচিত সদ্ব্যবহার আবশ্যক। পিতা পক্ষে পুত্রকন্যাদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ প্রদান অসম্ভব বলিয়া হিন্দু জননীর দায়িত্ব বস্তুতঃ বিপুল। পশ্চিম দেশীয়া মহিলাবৃন্দ কিরূপে শিশুপালন করেন ও শিশুশিক্ষা দেন তাহা অনুকরণ করা হিন্দু নারীদের পক্ষে অনিষ্টকর নহে। কিন্তু সামগ্রিক অনুকরণ দূষণীয়। হিন্দু শিশুগন পাশ্চাত্ত্যের স্বাস্থ্যনীতি ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুকরণ করিলে অশেষ

উপকৃত হইবে। অধিকন্তু তাহাদের বিলাসিতা ও ভোগলিপ্সা আমাদের পক্ষে মারাত্মক। হিন্দু সমাজে বিবাহ সমস্যা সমাধানও সুনীতিমূলক হওয়া উচিৎ। ধর্মপত্নী বিচারপূর্বক ধর্মপতির সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণের বিবাহ চরমাদর্শের দৃষ্টান্ত। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ মৃত্যুমুখে পতিত হন, শুনা যায়, তিনি তাঁহার পত্নীকে বলিয়াছিলেন—"তোমার মত ভাগ্যবতী আর কেহ নাই। অনেক নারীর ভাল ভাল পুত্র-কন্যা থাকিতে পারে কিন্তু তুমি সুসন্তান নরেন্দ্রনাথের জননী।"

ভারতীয় মাতৃগণের হস্তেই ভারতের ধর্মজাগরণ নির্ভর করে। ভারত-মাতা বহু মহতী মাতার প্রসবিনী হউন। ধর্মই আমাদের মহত্বের ভিত্তি হউক। আপনারা দেখুন—যেন আমাদের সন্তানগণ সযত্নে লালিত-পালিত ও ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।"

সুপণ্ডিত সুবক্তা স্বামী নির্মলানন্দ এই বক্তৃতার প্রারম্ভেই মন্তব্য করেন যে, শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশই মহিলা। তাঁহাদিগের কাছে কিছু বলার যোগ্যতা তাঁহার নাই, ইহা সত্ত্বেও তাঁহার বক্তৃতা সকলেই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। ইহা মূল্যবান জ্ঞানরত্নে পরিপূর্ণ ছিল। স্বামীজির বক্তৃতার বিশেষত্ব ছিল—বাগ্মিতা ও সুস্পষ্টতা। তৎশিষ্য শ্রীপদ্মনাভ তাম্পী কর্তৃক তাঁহার বক্তৃতা মালয়ালম্ ভাষায় অনূদিত ও সুকথিত হয়। ইহার পরে আবার কোলাট্টম্ সহযোগে সমাপ্তি সঙ্গীত হয়।

১৪ই তারিখে তিনি ওট্টাপালমে যান; তত্রস্থ আশ্রমে তিনি তিন দিন থাকিয়া স্বয়ং পুষ্পোদ্যান প্রসারণে এবং অন্যান্য কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। ১৭ই তারিখে তিনি ত্রিবান্দ্রাম্ যাত্রা করিলেন। যখন তিনি ওট্টাপালম্ রেলওয়ে ষ্টেশনে ট্রেনে উঠিলেন, উক্ত ট্রেনে সহযাত্রী এক নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি জাতি?" স্বামীজি উত্তর দিলেন, "সন্ন্যাসীদের কোনও জাতি নাই।" উক্ত নাম্বুদ্রি অন্যায় জিদ করিলেন—"পূর্বাশ্রমে কোন বর্ণভুক্ত ছিলেন?" স্বামীজি উত্তর দিলেন—"হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সন্ন্যাসীকে পূর্বাশ্রম সম্পর্কে কোন ও প্রশ্ন করা অনুচিত।" অন্যান্য লোকে তাঁহাকে একই প্রশ্ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জবাব পাইয়াছে। একজনকে তিনি উত্তর দেন—"আমি অস্পৃশ্য পরিবারের ঘরে জন্মিয়াছি।" অন্য একজনের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ পিতার নিকট ধর্ম শিক্ষা পাইয়াছি। উল্লিখিত নাম্বুদ্রির

বর্ণগৌরব আর দন্তজাত আত্মপ্রকাশ করিল না। সত্যই তিনি ওট্টাপালাম্ আশ্রম সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, ওট্টাপালমে নাম্বুদ্রি দুর্গে তিনি বড় ফাটল করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত বর্ণগত সংকীর্ণতা তিনি রুদ্র হস্তে চূর্ণ করেন। ইহা দাক্ষিণাত্যে তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।

ত্রিবান্দ্রাম্ শহরে স্বামী নির্মলানন্দের বহু ভক্ত ও শিষ্যা-শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার মিলিত হইয়া ধর্ম বিষয়ক আলোচনা, ভাবের আদান-প্রদান ও পরস্পর তুলনা করিতে নির্দেশ দেন। তাঁহারা পালা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে মিলিত হইয়া তদ্রূপ ধর্মচর্চা করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহারা 'হিন্দুবনিতা সংঘ' গঠন করিলেন। তাঁহারা স্বামীজিকে তাঁহাদের এক সভায় নিমন্ত্রণ করিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই সন্ধ্যায় তাঁহারা মিউজিয়াম-লেক্চার হলে দলে দলে সমবেত হইলেন। স্বামীজি সাড়ে চারটায় সভাস্থলে আসিলেন। উদ্বোধন-সঙ্গীত ও প্রার্থনার পর উক্ত সভায় স্বামীজি ইংরাজীতে একটি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—সাধারণতঃ নারী জাতি এবং ত্রিবাঙ্কুরস্থ নারীদের কল্যাণ সম্বন্ধে বিবিধ সমস্যা। স্ত্রীভক্তদের বাড়ীতে ইহার যে সকল অধিবেশন হইত, তৎসমুদয় শুধু যে তাহাদের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা নহে, তাঁহাদের পরিবারস্থ অন্যান্য মহিলাবৃন্দ তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন এবং নারী সমাজের উপর ঐ প্রভাব প্রসারিত হয়। ইহাই স্বামীজির এক মৌলিক উপায় নারীবৃন্দকে সমুন্নত ও সুশিক্ষিত করিবার। তিনি বুঝিয়াছিলেন—অন্তঃপুরে ধর্ম-জাগরণ ব্যাপক ও গভীর না হইলে রামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত ধর্মান্দোলন চিরস্থায়ী হইবেনা। স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছিলেন—"ভুলিও না ভারত, তোমার নারী জাতির আর্দশ সীতা,সাবিত্রী ও দয়মন্তী। এক ডানায় যেমন পাখী উড়িতে পারেনা, তেমনি নারীকুল জাগ্রতা না হইলে দেশের উন্নতিও হইবে না।"

বেলুড়মঠের নিয়মাবলীতে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "বেলুড়মঠের ন্যায় আর একটি মঠ স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্থাপিত হইবে।" সংঘমাতা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করিয়া নারীমঠ স্থাপনের সংকল্প তিনি করিয়াছিলেন। যুগাচার্যের সংকল্প অর্ধ শতক পরে পূর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণেশ্বরে ও হলিউডে সারদামঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ঊনত্রিশ

গভীর শূণ্যতা

স্বামী নির্মলানন্দ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে তার যোগে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ কলিকাতায় অত্যন্ত পীড়িত। তখন তাঁহার পায়ে যন্ত্রণাদায়ক বিষফোঁড়া হইয়াছিল এবং সেই সময়ে ভীষণ প্লাবনের নিমিত্ত রেলওয়ে লাইন নানাস্থানে ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় রেলপথে অনেক ঘুরিয়া কলিকাতা যাইতে হইত। এই সকল অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অবিলম্বে বক্রপথে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। এইবার ওট্টাপালমে তিনি যাত্রা ভঙ্গ করিলেন না। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পর ইহাই প্রথম ও শেষ অভগ্ন অখণ্ড ভ্রমণ। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই আগষ্ট প্রাতঃকালে তিনি মাদ্রাজে পৌঁছিলেন। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় মাদ্রাজ মঠে ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যাত হইত। উহার শ্রোতৃবৃন্দ শাস্ত্র ব্যাখ্যার পরিবর্তে ধর্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর সভা করিবার জন্য স্বামীজিকে ধরিয়া বসিলেন। তাঁহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সম্মত হইয়া তখন তাঁহার মনে যে ভাব প্রবলতম ছিল, সেই সম্বন্ধে অগ্নিময় আলোচনা করিলেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল "প্রেম"—ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেমই ধর্মজীবনে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন—"অন্তরে ও বাহিরে প্রেমাস্পদ ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব ও অনুধ্যানের জন্য ভক্ত বহু জন্ম লইতে ও সর্ববিধ দুঃখ ভোগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত।" সেই রাত্রেই তিনি বোম্বাই হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ছয়দিন ক্রমাগত ট্রেনযাত্রা করিবার পর, তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তিনি যখন উদ্বোধন কার্যালয়ে উপনীত হইলেন তখন তত্রস্থ সাধুবৃন্দ পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া জল খাবার খাইতে দিলেন। এই সকল উপহার উপেক্ষা করিয়া এবং বিশ্রামাদি বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া তিনি সোজা তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতাকে দেখিতে ছুটিলেন। উত্তরায়ণের অপেক্ষায় শরশয্যাগত ভীষ্মতুল্য শক্তিশালী কর্মযোগী ও বীরচেতা জ্ঞানীবর স্বামী সারদানন্দ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, এবং তাঁহার প্রিয় তুলসীর

আগমন প্রতীক্ষারত। বাক্‌শূণ্য ও সংজ্ঞাহীন। স্বামী নির্মলানন্দ তৎসমীপে যাইয়া স্বীয় আগমন জানাইলেন। ধীরে ধীরে সারদানন্দজী চক্ষু উন্মীলন করিলেন ও তাঁহার প্রেমানন্দ গুরুভ্রাতাকে সপ্রেম নয়নে দেখিলেন। উভয়ের গণ্ডদেশ প্লাবিয়া প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইল। কি অতল গভীরতা! কি অসীম প্রীতি!! কি আধ্যাত্মিক প্রেম-মূর্তি একে অন্যের মধ্যে দেখিলেন কে জানে!!!

ধীরে ধীরে স্বামী সারদানন্দের চক্ষুদ্বয় পুনরায় নিমীলিত হইল। দিব্য হাস্য ও দিব্য ভাবে তাঁহার মুখমণ্ডল সুশোভিত হইল। সৌম্য শান্ত ভাবে তিনি মহাসমাধিতে চিরমগ্ন হইলেন—"হরি ওঁ রামকৃষ্ণ" উচ্চারণে এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা বহির্জগতের নিকট ঘোষিত হইল। স্বামী নির্মলানন্দ অন্তরে গভীর শূণ্যতা অনুভব করিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের মহাপ্রয়াণে তাঁহার জীবন দুর্বিসহ ও নিরানন্দ মনে হইতে ছিল। উক্ত স্বর্গগত গুরু ভ্রাতার শুভ ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি ত্রিবান্দ্রাম আশ্রম-কার্য সমাপনে কৃতসংকল্প ছিলেন। তখন স্বামী সারদানন্দ জীবিত ছিলেন। তিনি ও এখন স্থূল দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। ইহাতে তিনি হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইলেন; কিন্তু ঠাকুরের কাজের জন্য যন্ত্রবৎ দেহভার বহন করিতে লাগিলেন।

ত্রিশ

ব্রহ্মদেশে তিনবার

ভারতের নানা স্থান ও সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে যে সকল জরুরী আহ্বান আসিল সেইগুলিতে সাড়া দিবার জন্য স্বামী নির্মলানন্দ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি সু-বিস্তৃত পরিভ্রমণের নিমিত্ত শুভ যাত্রা করিলেন। এইবার তিনি পাটনা ছাপরা, পূর্ণিয়া, কলিকাতা, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ত্রিপুরা, মৈমনসিং দিনাজপুর, কাশী, লক্ষ্নৌ, বোম্বাই ও উত্তর ভারতের অন্যান্য সহর এবং ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন, মান্দালয় ও আকিয়াব প্রভৃতি স্থান পর্যটন করেন। এই অধ্যায়ে আমরা তাঁহার ব্রহ্মদেশে তিনবার ভ্রমণ বৃত্তান্তের কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

যখন তিনি বর্মা যাত্রার পথে বারাণসীতে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তাঁহার মূত্রে শতকরা ২৮ ভাগ শর্করা দেখা গেল। অভিজ্ঞ চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন—তাঁহার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় সুদীর্ঘ ভ্রমণ বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে তিনি

উদ্দীপ্ত-বদনে বলিলেন—"আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের যন্ত্র মাত্র। যতদিন এই নশ্বর দেহ থাকিবে ততদিন তাঁহার কাজ করিয়া যাইবো, সে জন্য আমি কোনও অসুখ বা অসুবিধা গ্রাহ্য করিবো না।"

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তিনি রেঙ্গুন গমনার্থ জাহাজে উঠিলেন। স্বামী সচ্চিদানন্দ ও বিশ্বেশ্বরানন্দ তাঁহার সঙ্গে গেলেন। রেঙ্গুনের বিশিষ্ট নাগরিকগণ এবং সর্বধর্ম ও সর্বশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে সশ্রদ্ধ সম্বর্ধনা করিলেন এবং একটি সু-লিখিত ইংরেজী অভিনন্দন-পত্র দিলেন। উক্ত অভিনন্দন-পত্রে সত্তরজন বিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষর ছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রায় বাহাদুর এস্ আর রেড্ডিয়ার এবং সম্পাদক ছিলেন রায় বাহাদুর এম্, এ, এস্ আইয়ার। অবশিষ্ট আটষট্টি জন সভ্যের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রায় সাহেব ক্ষেত্রমোহন বসু। ব্যারিষ্টার এম্ এম্ রাফি, থিয়জফিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক ব্যারিষ্টার উ, পু, বা, বঙ্গীয় ছাত্র সমিতির সম্পাদক, চট্টল সমিতি, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার বা, মাউ, খান বাহাদুর এ, চান্দু, আর্য্য সমাজের সভাপতি ব্যারিষ্টার সি কে অম্বি, ডাক্তার পি, কে, দে, ব্যারিষ্টার ই, এম্ প্যাটেল, ব্যারিষ্টার সি এইচ ক্যাম্প্যাগ্নাক, অধ্যাপক গোপালকৃষ্ণ আইয়ার ব্যারিষ্টার উ, পাউটুন প্রভৃতি। উল্লিখিত ইংরাজী অভিনন্দন পত্রের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল

শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজ

অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাঙ্গালোর

পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীজি!

আমরা অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ রেঙ্গুনের নাগরিকবৃন্দের পক্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে আপনার এই প্রথম শুভাগমন উপলক্ষে আপনাকে আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা ও সাদর সম্বর্ধনা জানাইতেছি। আমরা ইহা জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, আপনি বিশ্ববরেণ্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের এক সাক্ষাৎ শিষ্য এবং সুবিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা।

আমরা নিশ্চিত ভাবে অনুভব করি, ইহা শুনিয়া আপনি সুখী হইবেন যে, ব্রহ্মদেশে রামকৃষ্ণ মিশন দীর্ঘকাল জনসেবা দ্বারা এই দেশের ইতিহাসে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে এবং ব্রহ্মদেশে রামকৃষ্ণ মিশনে প্রতিনিধিবৃন্দের জনহিতকর কার্যাবলী এবং স্বামী শ্যামানন্দ কতৃক সম্পাদিত আরাকানে ও কাওকারাইকে

বন্যাপীড়িতদের অদ্ভুত সেবাকার্য্য এবং জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে রেঙ্গুনস্থ সর্বশ্রেণীর দরিদ্র নরনারীদের জন্য পূর্ব রেঙ্গুনে হাসপাতাল সংস্থাপন জনসাধারণের বিশ্বাস এবং বর্মা সরকার ও রেঙ্গুন কর্পোরেশনের সাহায্য লাভে সমর্থ হইয়াছে। রেঙ্গুনের নাগরিকবৃন্দ ইতিমধ্যেই আপনার শ্রদ্ধাস্পদ গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট কর্মী স্বামী বোধানন্দ, স্বামী সর্বানন্দ, স্বামী শংকরানন্দ প্রভৃতি সাধুদের অভ্যর্থনার সুযোগ পাইয়াছেন।

আজ আমরা বর্মার এই প্রধান সহরে আপনার সহিত সাক্ষাৎলাভের সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছি। আপনার দর্শনলাভ আমাদের পরম সৌভাগ্য, কারণ যে রামকৃষ্ণ মিশন মানবজাতির সেবারূপ ধর্মে ব্রতী, আপনি উহার অন্যতম উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে লক্ষ লক্ষ নরনারীর উন্নয়নে আপনার অমূল্য জীবন সমুৎসৃষ্ট। আমাদের কোনও সন্দেহ নাই যে, এখানে আপনার উপস্থিতি এবং অবস্থানকালীন সুমহৎ ও নিঃস্বার্থ ধর্মপ্রচার প্রচুর সুফল প্রসব করিবে এবং সর্ব শ্রেণীর নাগরিকবৃন্দের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও মৈত্রী স্থাপনে সহায়ক হইবে। পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীজি! উপসংহারে আপনাকে আর একবার আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করিতেছি এবং আন্তরিক অভ্যর্থনা নিবেদন করি। ইতি—”

ব্রহ্মদেশের আর এক প্রধান শহর আকিয়াব। উহার নাগরিকবৃন্দও স্বামী নির্মলানন্দকে সম্বর্ধনা করিলেন, এবং একখানি অভিনন্দন-পত্র দিলেন। উক্ত অভিনন্দন-পত্রে আছে—“আপনি বিশ্ববিদিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের এক সাক্ষাৎ শিষ্য:এবং সুবিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের এক প্রধান ও বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা। আমরা অবগত আছি—এই নগরের অধিবাসিবৃন্দ আপনাকে যে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন তাহার প্রদর্শন বা প্রকাশন অপেক্ষা অধিকতর অপ্রীতিকর আপনার কাছে আর কিছুই নাই। আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি আমাদিগকে এইজন্য মার্জনা করিবেন। কারণ আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উৎসারিত।”

এই অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজি যাহা বলিলেন তাহা তৎপ্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মান আরও গভীর করিল। অনেক ধর্মাত্মা তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মদেশে পর্যটনের ফলে বর্মা সরকার

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমকে একটি মূল্যবান অট্টালিকা হাসপাতালের জন্য ব্যবহার করিতে দিলেন এবং রেঙ্গুনের করপোরেশন উক্ত সেবাশ্রমে নারী বিভাগ খুলিবার জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দান মঞ্জুর করিলেন।

পর বৎসর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধে তিনি কালিকট হইতে যখন কেরলে যাইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন ব্রহ্মদেশ হইতে আর এক আহ্বান পাইলেন। রেঙ্গুন সেবাশ্রম স্থানীয় করপোরেশন হইতে যে পঁচিশ হাজার টাকা দান পাইয়াছিল তদ্ব্যয়ে হাসপাতালে মহিলা বিভাগ নির্মিত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের গভর্ণর উহার দ্বারোদঘাটন করিতে সম্মত হন। সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শ্যামানন্দের প্রাণপাতী পরিশ্রমে হাসপাতাল ও মিশনকার্য উত্তরোত্তর দ্রুতবেগে বর্ধিত হইয়াছিল। তিনি স্বামী নির্মলানন্দকে উক্ত উদ্বোধন উৎসবে উপস্থিত থাকিবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। তদ্‌অনুসারে স্বামী নির্মলানন্দ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্যাঙ্গালোর হইতে যাত্রা করিয়া রেঙ্গুনে উপস্থিত হইলেন। তিনিই ব্রহ্মদেশের গর্ভণরকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি ব্রহ্মদেশের অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিয়া অসংখ্য ধর্ম-পিপাসুকে মন্ত্র দীক্ষা দিলেন এবং ভারতে প্রত্যাগমন করিলেন।

স্বামী নির্মলানন্দ তিনবার ব্রহ্মদেশে পদার্পণ করেন—প্রথম বার ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় বার ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তৃতীয়বার তিনি ব্রহ্মদেশে পদার্পণ করেন। এইবার তিনি ব্রহ্মদেশীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পৌরোহিত্য করিবার জন্য আহূত হন। উক্ত হিন্দু সভায় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তিনি যে সভাপতির অভিভাষণ দেন তাহা সুচিন্তিত ও সারগর্ভ। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের পুনরুজ্জীবনের উপায়সমূহ সুবিস্তৃত ও সুপরিষ্কার ভাবে এই বক্তৃতায় আলোচিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ আধুনিক সামাজিক সমস্যার সমাধানে সনাতন ধর্মের যৌক্তিক প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ও সুপক্ক সিদ্ধান্ত ইহাতে সুব্যক্ত হইয়াছে।

উল্লিখিত অভিভাষণের সারাংশ এখানে প্রদত্ত হইল :—

"নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

ব্রহ্মদেশের ভাইভগিনীগণ! আমাকে ব্রহ্মদেশীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার

বর্তমান অধিবেশনে পৌরোহিত্য করিবার গুরু দায়িত্ব আপনারা আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন। দুঃসময় সমুপস্থিত। আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙ্গন দেখা দিয়াছে। আমি রাষ্ট্রনীতিবিদ্ নহি। তথাপি বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। জাতীয় শাসনতন্ত্র দেশের ভিতর হইতে ক্রমশঃ গঠিত হয়। বাহির হইতে প্রক্ষিপ্ত হইলে উহা সর্বশ্রেণীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ হয় না। যে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের মোক্ষার্থ এবং মানব জাতির শান্তি স্থাপনার্থ আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহার এক দীন শিষ্য। আমাকে সম্মানিত করিয়া আপনারা তাঁহাকেই সম্মান দিতেছেন।

"ভাই ভগিনীগণ! আমাদের সম্মুখে ভীষণ বিপদ আসন্ন। আমরা অভূতপূর্ব্ব বিবর্ত্তনে বিরাট বিপ্লবের দ্বারদেশে সমাগত। আমাদের বেদে ও পুরাণে ব্রহ্মদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দেশ যে বুদ্ধের শিষ্যগণ কর্তৃক অধ্যুষিত, তিনি আমাদের ভগবান বিষ্ণুর অবতার। ব্রহ্মদেশ মহাভারতের পূর্ব্ব মুখ পাত্র ও বৃহত্তর ভারতের মহা সৌধ। জাভা, সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া, চীন ও জাপান প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যের দেশ সমূহের সহিত ইহা ভারতকে সংযুক্ত করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশীয় বাণিজ্যমূলক যান্ত্রিক শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাবে ভারতের ন্যায় ব্রহ্মদেশের সাংস্কৃতিক অপমৃত্যু সমাসন্ন। দ্রুতবেগে সে সকল পরিবর্ত্তন আমাদের সমাজ ও জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে সেইগুলির পরিণাম স্বামী বিবেকানন্দের মতে ত্রিবিধ হইতে পারে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য তিন বর্ণের সংমিশ্রণ দ্বারা পুরাকালের বৌদ্ধ ধর্মবৎ অধুনা এক নবধর্ম উদ্ভূত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান জীবনের প্রয়োজনের উপযোগী এক নবধর্ম বর্হিজগৎ হইতে আসিয়া ভারতবাসীগণকে অভিভূত করিতে পারে। তৃতীয়তঃ আমাদের সমাজের সুশিক্ষিত শ্রেণীদের মধ্যে নাস্তিকতা ও অধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এবং অবশিষ্টগণ হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা উপেক্ষা করিয়া ইস্‌লাম বা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে পারে।

"এই বিষয়ে সকলে একমত যে ভারতের, স্বতন্ত্র আত্মা বিদ্যমান। হিন্দু সমাজকে অতীতের নিজস্ব আদর্শ অনুসরণ করিতে হইবে। উক্ত আদর্শে আমাদের সামাজিক প্রগতির সুনীতি নিহিত! স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন "প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক জাতির এক স্বতন্ত্র জীবনধারা আছে, উহাকে

কেন্দ্র করিয়া জাতির সর্ব্ব অঙ্গ সংহত ও সংবদ্ধ। কোনও দেশে রাষ্ট্রশক্তিই জীবনীশক্তি, ইংলণ্ড ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে শিল্পোন্নতিই জাতির জীবনাদর্শ। ভারতের ধর্মজীবনই জাতীয় বীণায় আবহমান কাল হইতে ঝঙ্কৃত হইয়াছে। যে জাতি বহু যুগ যাবৎ অনুসৃত আদর্শকে ত্যাগ করিয়া অন্য আদর্শকে বরণ করিতে চেষ্টা করে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চিরাচরিত জাতীয় সাধনা বর্জন গর্ভপাত তুল্য অনিষ্টকর। যে আন্দোলন বা সরকার ভারতে ধর্ম-সাধনাকে অবান্তর করিবে, সে এই দেশে বেশী দিন টিকিবে না। সুতরাং ধর্মাদর্শকে পুনরায় উজ্জীবিত করো।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতাকাশ ধর্ম্মমেঘে পরিব্যাপ্ত। ভাগীরথীর পক্ষে পুনর্বার গোমুখীতে ফিরিয়া যাইয়া নূতন পথে প্রবাহিতা হওয়া সম্ভব হইলেও ভারতের পক্ষে ধর্ম্ম ত্যাগ রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক বা অন্য আদর্শ গ্রহণ অসম্ভব। ভারতীয় জাতীয়তার প্রথম বিশেষত্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের অক্ষয় সামর্থ।

ইহার দ্বারাই ভারতের শক্তি কেন্দ্রীভূত। অন্য কিছু বহাকে একীভূত করিতে পারিবে না। ভারতীয়তার দ্বিতীয় বিশেষত্ব রাজনীতি নিরপেক্ষতা, ভারতীয় নেশনের তৃতীয় বিশেষত্ব—সর্বক্ষেত্রে ধর্মসূত্র প্রয়োগ। ধর্মই ভারতে মাটীর তীর্থত্ব সম্পাদন করে। সনাতন ধর্মানুরাগেই আমাদের প্রকৃত স্বদেশী প্রেম। এই অনুরাগই ভারতকে তীর্থে পরিণত করিয়াছে।

"ভারতবাসীর প্রধান সুরই ধর্ম এবং রাজনীতি, অর্থনীতি বা শিল্প বা সঙ্গত বা বিজ্ঞান বা সাহিত্য বা চারুকলা বা অন্য কোন ও কিছু অ-প্রধান, ইহার পরিবর্তন অসম্ভব। হিন্দু জগতে সর্বাগ্রে ধর্ম-জাগরণ প্রয়োজন। ধর্ম-জাগরণ না আসিলে হিন্দুসমাজ সঞ্জীবিত হইবে না; ধর্ম-জাগরণ আসিলে দেশের সর্ব বিষয় জাগ্রত হইবে। এই জাগরণ আনিতে হইবে প্রথমে নিজ জীবনে পরে স্বীয় কুলে। কুলধর্ম সংরক্ষণ সর্বতোভাবে আবশ্যক। সমাজশরীরে বিশুদ্ধ ধর্ম-শোনিত প্রবাহিত না হইলে শক্তি বৃদ্ধি হইবে না। নারীগণকে শিক্ষিত করে অনুন্নত জনগণকে সমুন্নত করে—দেশব্যাপী জাগরণ আনিবার ইহাই অব্যর্থ উপায়। যজুর্বেদের ষড়বিংশ অধ্যায়ে বিহিত আছে যে 'ঋতোস্তরা অমৃত পথ্য' বৈদিক প্রজ্ঞা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, শূদ্র, বৈশ্য এবং তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীভুক্ত চারণ-গণকেও প্রদান করিতে হইবে। পরবর্তী যুগে যখন বেদবিদ্যা নারীজাতি ও শূদ্রগণের নিকট নিষিদ্ধ হইল তখন মহাকাব্য 'রামায়ণ ও মহাভারত বিরচিত

এবং পুরাণসমূহ গ্রথিত হইল। জন সাধারণের মধ্যে ধর্মশিক্ষা ব্যাপক ভাবে প্রচারার্থ কথকতা আরম্ভ হইল। বেদবিদ্যা ব্রাহ্মণেতর বর্ণগণের নিকট নিষিদ্ধ হইবার পর হইতেই সামাজিক অবনতি ঘটিল এবং সমাজের অবহেলিত সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণে অগ্রসর হইল। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—'মুসলমানগণ যখন এই দেশে প্রথম আগমন করেন তখন তাঁহাদের ঐতিহাসিক মতে এই ভারতবর্ষে ষাট কোটী হিন্দুর অধিবসতি ছিল। এই গণনায় অত্যুক্তি দোষ না থাকিয়া বরং অনুক্তি দোষ আছে; কারণ মুসলমানদের অত্যাচারেই অনেক প্রজা ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, হিন্দুর সংখ্যা ষাট কোটীর অধিক ছিল, কিছুতেই ন্যূন নহে। কিন্তু আজ সেই হিন্দু বিশ কোটীতে পরিণত হইয়াছে। তাহার উপর খৃষ্টান রাজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দুই কোটী লোক খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে এবং প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষাধিক লোক খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে।

হিন্দুদের এই ধর্মান্তর গ্রহণ ও ধর্মান্তরিত করণ অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে। নচেৎ হিন্দু-সমাজের লোকসংখ্যা ক্রমশঃই অল্প হইবে, এবং জাতি দুর্বল হইয়া পড়িবে। শুধু তাহাই নহে, যে সকল হিন্দু অ-হিন্দু হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকেও পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিতে হইবে। আমাদের সংঘজননী সারদাদেবীও ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—"মুসলমান বা খৃষ্টান-দিগকেও হিন্দুধর্মে আনিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইবে।" তবে জোর পূর্বক ধর্মান্তরিত করণ অনুচিত। সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয় দ্বারা এই শুভকার্য আরম্ভ করা আবশ্যক। ইউরোপে ও আমেরিকায় রামকৃষ্ণ মিশন বেদান্ত প্রচার দ্বারা সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয় বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া করিতেছেন। ইহার ফলে শত শত শ্বেতাঙ্গ নিজদিগকে হিন্দু বলিতে গর্ব অনুভব করিতেছেন এবং সরকারী লোকগণনায় হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

একত্রিশ

কর্মক্ষেত্র প্রসারিত

প্রথম বার ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া স্বামী নির্মলানন্দ পুনরায় পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করেন। তথা হইতে ৺ কাশীধামে যাইয়া বেশ কিছু দিন অবস্থান পূর্বক তিনি অনেক প্রেরণাপ্রদ প্রশ্নোত্তর-সভা চালিত করেন। তৎকালে ত্রিবাঙ্কুরের কোনও ভদ্রলোক ৺কাশীতে মণিকর্ণিকা ঘাটে থাকিতেন; তিনি স্বামীজিকে দর্শন করিতে যান এবং স্বামীজিও কেরলের এক ব্যক্তিকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হন। উক্ত ব্যক্তি স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য ও নানা গুণে বিভূষিত ভক্ত অধ্যাপক শেষাদ্রির ছাত্র হওয়ায় স্বামীজি আরও আনন্দিত হন। সেই ভদ্রলোক স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করেন—"কিরূপে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন সম্ভব?" স্বামীজি উত্তর দিলেন—"অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন নিশ্চয় সম্ভব। ইহা বজ্রবৎ সুদৃঢ় সংকল্প সহায়ে লাভ করা যায়। প্রায়ই তোমরা তোমাদের আদর্শ বিস্মৃত হও। তখন ব্রহ্মচর্য খণ্ডিত হয়। ইহাতে নিরাশ হইও না। এই জীবনে তুমি এই উচ্চ লক্ষ্যে উপনীত না হইতে পারিলেও পরজন্মে নিশ্চয়ই পারিবে। এক জীবনে সাধনায় সর্ব বস্তু লাভ হয় না। এই লক্ষ্য লাভের আগ্রহই অনেক সাধনার ফলে জন্মায়! কোনও সুমহৎ উদ্দেশ্যে প্রাণপাত করা কি পরম সৌভাগ্য নহে? সদাদর্শ অনুসরণে অপরিসীম শক্তি লাভ হয়।" স্বামী নির্মলানন্দ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি স্থায়িভাবে ৺কাশীবাস করিবেন কিনা, পরে বলিলেন—"কেরল সুন্দর জায়গা, তথায় ফিরিয়া যাও এবং জনগণের মধ্যে সেবাকার্য করো; যখন আমি পরের বারে কেরলে যাইবো, তখন তুমি আমার সহিত কেরলে দেখা করিবে। আমার অন্তর কেরলে পড়িয়া আছে; আমি তথায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র; ঐ স্থানই আমার প্রিয় স্থান।"

ত্রিবাঙ্কুরবাসী ভদ্রলোককে স্বামীজি ৺কাশী ছাড়িয়া কেরলে যাইতে পরামর্শ দিলেন কিন্তু তিনি অন্যান্য বহু ব্যক্তিকে কেরল ছাড়িয়া স্থায়ীভাবে ৺কাশীবাসের উপদেশ দিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দের শিষ্য স্বামী পরমেশ্বরানন্দের

বিধবা জননীকে তিনি ঐ নির্দেশ দেন। যখন স্বামীজি দিব্যভাবে আবিষ্ট ছিলেন তখন একদিন তিনি উক্ত তরুণ সন্ন্যাসীকে ৬কাশীধামে যাইয়া তাঁহার মাতার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার সেবায় নিরত থাকিতে বলেন। অদ্যাপিও তিনি তাহাই পালন করিতেছেন। কিছুদিনের জন্য তিনি কোনও ধনী ব্যক্তির বাগানবাড়ীতে বাস করেন। ইহাতে স্বামীজি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"দেখ, কোনও কৃপণের নিকট হইতে একটি কপর্দকও বক্তিগত ব্যবহারের জন্য লইও না। ইহাতে তুমি অবনত হইবে। কিন্তু সৎকার্যের জন্য কৃপণের নিকট হইতে দান গ্রহণে দোষ নাই ; উক্তরূপ অর্থদানের দ্বারা কৃপণের চিত্তও শুদ্ধ হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য কৃপণের অর্থ লইলে ধর্মহানি হয়।"

৬কাশীধাম হইতে স্বামী নির্মলানন্দ বোম্বাই হইয়া ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ১৯শে মে বাঙ্গালোরে ফিরিলেন। অল্পকাল পরে তিনি তথা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে পৌরোহিত্য করিবার জন্য পোন্নামাপেটে গমন করেন। উক্ত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে স্বামী সন্তবানন্দ উহার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি অনুরক্ত সহকর্মীবৃন্দের সহযোগে সেই জন্মোৎসবকে জাতীয় উৎসবে পরিণত করেন। কুর্গ জেলার সর্ব অংশ হইতে নারীবৃন্দ, শিশুগণ ও পুরুষগণ হাজারে হাজারে আসিয়া উৎসবে যোগ দিলেন। বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠান-সূচীও সারাদিন ব্যাপিয়া চলিল এবং উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইল।

উক্ত বর্ষের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা—আগষ্ট মাসে ত্রিবান্দ্রাম আশ্রমে পাঁচজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস প্রদান। তিনি নূতন সন্ন্যাসীদের নাম দিলেন স্বামী শ্রীকণ্ঠানন্দ, শৈলজানন্দ, অদ্রিজানন্দ, মৃঢ়হরানন্দ ও বিশ্বম্ভরানন্দ। উক্ত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গালোর আশ্রমে আরও চারজন ব্রহ্মচারীকে তিনি সন্ন্যাস দানান্তে তাঁহাদের নাম রাখিলেন স্বামী বিশদানন্দ, বিশালানন্দ, আগমানন্দ ও নিবৃত্তানন্দ। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর সালেমে তৎকর্তৃক নূতন আশ্রম উৎসর্গীকৃত হইল। সালেম হইতে স্বামীজি ওট্টাপালমে গেলেন। ঐ মাসে তৎকর্তৃক আর এক অসামান্য অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। ইহার দ্বারা প্রদর্শিত হয় তাঁহার বিশাল উদারতা, অনুন্নতদের প্রতি অসীম সহানুভূতি এবং বৃদ্ধাবস্থাতেও কঠোরতা সহনার্থ সহাস্য প্রস্তুতি। ওট্টাপালমের প্রায় বারো মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পালঘাট তালুকের অভ্যন্তরে তোলানুর গ্রাম অবস্থিত।

উক্ত পল্লীগ্রামে যাইবার ভালো রাস্তাও তখন ছিলনা। তথায় সুব্রহ্মণ্য ও ষষ্ঠদেবের মন্দির অবস্থিত। ইহার অধিকারী ছিল নিম্নশ্রেণীর কোন এজবা জাতীয় পরিবার। বহু পূর্বে উহার প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হইয়াছিল। অধিকারী পুরাতন মন্দিরটী পুনর্নির্মাণ করিতে চাহিলেন। সাধারণতঃ ইহা বৈদিক নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন এবং স্বামী নির্মলানন্দের কথা শুনিয়া তিনি স্বামীজির সমীপে গেলেন এবং অনুষ্ঠান সম্পাদনার্থ তাঁহাকে সশ্রদ্ধ আবেদন করিলেন। নানাবিঘ্ন সত্ত্বেও স্বামীজি উহা স্বয়ং সম্পাদন করিতে কৃপাপূর্বক সম্মত হইলেন। বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া তিনি পূর্বরাত্রে সেই দুর্গম মন্দিরে পৌঁছিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে মহোৎসাহে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। গ্রামবাসিগণ একটি সংস্কৃত অভিনন্দন-পত্র উপহার দিয়া তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন। ইহার উত্তরে তিনি স্কন্দ ও শেষ দেবদ্বয়কে আরাধনার সুযোগ দানার্থ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন,—"এই দেবদ্বয় কেরলের উদ্ধারকর্ত্তা ও পুনর্জীবনদাতা। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যও তিনি তৎসঙ্গে বিবৃত করিলেন। যাহারা ওট্টাপালম বা অন্যত্র যাইতে পারে নাই তাহারা সেদিন তাঁহার পুণ্য দর্শন লাভে ধন্য হইল। সমবেত পল্লীবাসিবৃন্দকে শুভাশীস দানান্তে তিনি সেই সন্ধ্যায় উক্ত স্থান ত্যাগ করিলেন।

তখন কালিকট বেদান্ত সমিতির সভাপতি ছিলেন জামোরিন কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রী এ, ভি, কে, মেনন এবং সম্পাদক ছিলেন উকীল শ্রীকুন্হিরমন মেনন। উভয়ে স্বামীজিকে বিনীত অনুরোধ জানাইলেন—কালিকট যাইয়া তত্রস্থ বেদান্ত সমিতিতে পদার্পণ করিতে। স্বামীজি সানন্দে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্বক কালিকটে গেলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর কালিকটে জামোরিন কলেজের প্যালেস হলে আহূত সভায় স্বামীজিকে এক অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইল। তিনি উহার যথাযোগ্য উত্তর দিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে সমিতির কুশল কামনা করিলেন। যদিও কোনও নিমন্ত্রণ প্রেরিত হয় নাই, তথাপি কালিকটের তিন শতাধিক শিক্ষিত ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত হন। একটি কথোপকথন-সভায় স্বামীজিকে মহিমময় রূপে দেখা গেল। কেহ কেহ মন্তব্য করিলেন—শ্রোতৃবৃন্দ যতই বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ও ভাবগ্রাহী হন ততোই কথোপকথনে স্বামীজির দিব্য প্রভা প্রকটিত হয়।

অনন্তর তিনি দ্বিতীয়বার ব্রহ্মদেশে যান এবং তথা হইতে ফিরিয়া পুনরায় বঙ্গে ও বিহারে বিস্তৃত ভ্রমণ করেন। অবিরাম পরিভ্রমণ ও অক্লান্ত কর্ম তাঁহার লৌহবৎ সবল শরীরের পক্ষেও দুঃসহ হইয়া উঠিল এবং তাঁহার শরীর বিশ্রাম দাবী করিল। এই দাবী ডবল নিউমোনিয়ার আকারে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পাটনায় তাঁহাকে আক্রমণ ও শয্যাগত করিল। তখন তিনি স্বীয় শিষ্য নন্দীপতি মুখোপাধ্যায়ের অতিথি ছিলেন। কোনও অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন তাঁহাকে চিকিৎসা করিলেন। কিছুদিন পরে কলিকাতার ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষকে ডাকা হইল। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—রোগীর মূত্রে শতকরা উচ্চহারে শর্করা বিদ্যমান। মূত্রস্থ শর্করা না কমা পর্যন্ত উচ্চজ্বরে কষ্টকর কাশি ও অন্যান্য উপসর্গ কমিল না। তাঁহাকে ইন্‌সুলিন ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া হইল। স্বামীজি এই ব্যাধির প্রকোপে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। ডাক্তারগণ ইহাতে খুব আপত্তি করিলেন কিন্তু তিনি মেরুবৎ তাঁহার সংকল্পে অটল রহিলেন। তিনি বলিলেন—"প্রথমতঃ আমার শিষ্য ও ভক্তদের অত্যন্ত কষ্ট ও দুশ্চিন্তা হইতেছে, দ্বিতীয়তঃ বৃদ্ধ ডাক্তার ব্যথিত হইবেন যদি তাঁহার দাতব্য চিকিৎসাকে জবাব দেওয়া হয়, এবং অন্য চিকিৎসককে নিযুক্ত করা হয়।"

অবশেষে তাঁহাকে কলিকাতায় অপসারিত করা হইল। কলিকাতায় যাইয়া তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং উক্ত বর্ষের মধ্যভাগে বোম্বাই হইয়া বাঙ্গালোরে ফিরিলেন। তথা হইতে আবার তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন এবং কেরলস্থ বহু কেন্দ্র পরিদর্শনান্তে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ত্রিবাঙ্কুরে তিনটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। কায়মকুলম, কুন্নথুর ও পালেইতে এই তিনটী আশ্রম। সেপ্টেম্বর মাসে আবার তিনি কলিকাতায় গেলেন। অসুস্থতা ও দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বারো বৎসর ধরিয়া ঠাকুরের ভাব প্রচারার্থ তিনি উত্তর ভারতে প্রতি বৎসর ভ্রমণ করিতেন।

১৯৩০ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে আতুর, আরুর, নেয়ুর ও মুভভুপুজা নামক চারি স্থানে এবং কোচিন রাজ্যে পুতুকাডে পাঁচটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। পুতুকাড আশ্রমের জন্য জমি দান এবং গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করেন—নাম্বুদিরি ভদ্রলোক ভীমপুর শংকরন নাম্বুদিরিপাদ।

কোচিন রাজপরিবারের হিজ হাইনেস্ রাম বর্মা থাম্বুরান, এবং কেরল বর্মা থাম্পুরন উক্ত আশ্রমের প্রধান সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময় স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী দক্ষিণ ভারত-ভ্রমণে গমন করেন। তখন তিনি ত্রিবান্দ্রমে রামকৃষ্ণ আশ্রম পরিদর্শনান্তে বলিয়াছেন,—"তুলসী মহারাজকে মহাজ্ঞানী ও কর্মযোগী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এখন আমি দেখি যে, তিনি মহা ভক্ত। ঠাকুরঘর যেরূপ কারুকার্য সুশোভিত তাহা চমৎকার। অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানাইবেন এবং বলিবেন যে, এই আশ্রম দেখিয়া আমি খুব সুখী হইয়াছি।"

বস্তুতঃ বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমে এই দুই গুরুভ্রাতার সাক্ষাৎকার মর্মস্পর্শী। স্বামী নির্মলানন্দ নিজ আসন হইতে ক্ষিপ্র বেগে উঠিয়া সমাগত গুরুভ্রাতার সহিত দেখা করিতে ছুটিলেন। উভয়ে প্রেমভরে পরস্পরকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাকে টানিয়া জোর করিয়া স্বীয় আরাম চেয়ারে আরামদায়কভাবে বসাইলেন যদিও বিজ্ঞানানন্দজী পার্শ্বস্থ এক বেঞ্চে বসিতে চাহিয়াছিলেন। পরস্পর অভিবাদনান্তে নির্মলানন্দজী নিজেই প্রিয় গুরুভ্রাতার জন্য কফি প্রস্তুত করিতে গেলেন এবং বিজ্ঞানানন্দজী পছন্দ করিতেন বলিয়া কফিতে চিনির বদলে মিছরী দিলেন ও স্বহস্তে প্রস্তুত কফি আনিয়া গুরুভ্রাতাকে খাইতে দিলেন।

উক্ত কালে এর্ণাকুলমে নির্মলানন্দজীর গমন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর্নাকুলমের নাগরিক ও মহাভক্ত শ্রীঅম্বাদিশঙ্কর মেনন্ স্বামীজিকে স্বগৃহে নিমন্ত্রিত করিয়া রাজোচিত সম্বর্ধনা করেন। অনেক প্রধান ব্যক্তিও এই উপলক্ষে তথায় সমবেত হন এবং স্বামীজির প্রেরণাপ্রদধর্মপ্রসঙ্গের অফুরন্ত প্রবাহ চলিতে থাকে। তাঁহার অমৃতোপম ধর্মকথা শুনিয়া সকলেই পরম প্রীতি লাভ করেন। এই বৎসর তিনি পুনরায় ব্রহ্মদেশে যান। উল্লিখিত বর্ষগুলিতে তাঁহার জীবনের অন্তিম অধ্যায়ের পূর্বাধ্যায় সূচিত হয়। এই সময় যোগ ও সন্ন্যাসের অদ্ভুত সমন্বয় চরম মহিমার উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। উক্ত কালে তাঁহার কর্মক্ষেত্র দক্ষিণভারত হইতে উত্তরভারত, এমন কি সাগরপারে এবং সুদূর ব্রহ্মদেশে পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল এবং সুবিশাল মাতৃভূমিকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। ভারতের সর্বত্র তাঁহার প্রচার প্রশংসিত, আকাঙ্ক্ষিত ও সমাদৃত হইয়াছিল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মুখোচ্চারিত সত্য বাক্য—মাতৃভূমির ডাকে স্বামী নির্মলানন্দ আমেরিকা হইতে আসিয়াছিলেন—তখন অপেক্ষা অন্য কোনও সময় পূর্ণতম অর্থে প্রমাণিত ও সার্থক হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের অনেক রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ নির্মলানন্দজী কলিকাতা রামকৃষ্ণ সারদা মঠের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। কেরলের ধর্মগুরু বাংলার বিবেকানন্দ মিশনের অধিনায়কত্ব করিবার জন্য সুপ্রার্থিত হইলেন। বিবেকানন্দ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদামঠ কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা সকলেই পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় মঠের ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ উহার প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এইরূপে এক আধ্যাত্মিক হারকিউলিসের জন্য বহু কর্ম একত্রিত হইল। স্বামীজি এই গুরুভার অনায়াসে বহন করিলেন, অথচ অনাসক্ত আত্মারাম আত্মক্রীড় সন্ন্যাসীরূপে স্বতন্ত্র রহিলেন।

দৃশ্যমান কর্মক্ষেত্র হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের অন্তর্ধ্যান ভক্তদের হৃদয়ে যে শূন্যতা সৃষ্টি করিল, তাহা পূরণ করা প্রয়োজন। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, স্বামী নির্মলানন্দের অধ্যাত্মশক্তি ও অপার্থিব প্রীতিলোক কল্যাণার্থ এই অভাব পূরণে অগ্রসর হইবে। দক্ষিণ ভারতের শক্তিকেন্দ্র হইতে অধ্যাত্ম প্রবাহের প্রাচুর্য্য কলিকাতায় যাইয়া তরঙ্গ তুলিল। বাঙ্গালোরেও ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। বেলুড়মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বাঙ্গালোর হইতে অপসারণের জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। এখন বাঙ্গালোর আশ্রমের স্বত্বাধিকার ও পরিচালন সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল। এই সম্বন্ধে স্বামী নির্মলানন্দ যে বৈপ্লবিক অভিমত প্রকাশ করিলেন, তাহা বেলুড়মঠের কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হইল না। বেলুড়মঠের কর্তৃপক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে বাঙ্গালোর জজকোর্টে মোকদ্দমা করিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ বৎসর এই মোকদ্দমা চলিল। ইহাতে স্বামী নির্মলানন্দ যে সাক্ষ্য দান করেন তাহা বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম-ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এই পুস্তকের প্রথমে প্রদত্ত। সক্রেটিস্ ও যীশুখ্রীষ্ট বিচারালয়ে যে সাক্ষ্যদান করেন ইহা তাহারই সহিত তুলনীয়। বিচারক জেলা জজ রায় দিলেন যে, স্বামী নির্মলানন্দ বাঙ্গালোর আশ্রমের উন্নতিকল্পে বহু বর্ষ অক্লান্ত

পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি আমরণ ইহার অধ্যক্ষতা করিতে পারেন যদি তিনি বেলুড়মঠ কর্তৃপক্ষের আনুগত্য এবং জজ কোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত লোক্যাল কমিটির তত্বাবধান মানিয়া লইতে রাজী থাকেন।

নির্মলানন্দজীর পঁচিশ বর্ষব্যাপী পরিশ্রম বাঙ্গালোর আশ্রমকে রাজর্ষির তপোবনে পরিণত করিয়াছিল। স্বামী নির্মলানন্দ ইহার উন্নতিবিধানে প্রাণপাত করিয়াছিলেন। এখন তিনি বয়োবৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যহীন। ঐহিক সুখসাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে সুনীতি ত্যাগ তাঁহার স্বভাবের বিরোধী ছিল। "আমার ভিক্ষা পাত্র আছে"—এই বলিয়া তিনি বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রম ত্যাগ করিয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন। মর্মভেদী হাহাকারে মর্ত্য ও স্বর্গ প্রকম্পিত হইল! ধর্মের নামে এমন অধর্ম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অবশ্য চিরতরে মতভেদ ও তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটিল, কিন্তু ইহা সুদূর প্রসারী ফল প্রসব করিল। বর্তমান লেখকের বিনম্র অভিমত এই যে, স্বামী নির্মলানন্দ জজ কোর্টের রায় অনুসারে বাঙ্গালোরে আশ্রমের অধ্যক্ষপদে পূর্ববৎ প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই উভয়ের পক্ষে শোভনীয় ও শান্তিপ্রদ হইত। অনন্তর বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ এই মিথ্যা রটনা করিলেন যে, স্বামী নির্মলানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য নহেন। সেইজন্য ঠাকুরের অন্যান্য ষোলজন সন্ন্যাসী শিষ্যের জন্মতিথি সামান্যভাবে উদ্‌যাপিত হইলেও নির্মলানন্দজীর জন্মতিথি তথায় পালিত হয় না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বৎসর যাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া তাঁহারাই মুখে ও গ্রন্থে সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ঐতিহাসিক অবিসংবাদিত ঘটনারূপে প্রচলিত হইয়াছিল তাহাই মিথ্যা বলিয়া ঘোষিত হইল। এই সত্যের অপলাপে শত শত ভক্ত মর্ম্মাহত হইলেন। ভারত-আত্মা আর্ত্তনাদ করিলেন। তুমি যতোই শক্তিশালী হওনা কেন, ইতিহাসকে অস্বীকার করিতে পারো না। ইতিহাসের ইন্দ্রজাল সুগুপ্ত সত্য আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীর সম্মুখে তুলিয়া ধরে। এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই পাঠক-পাঠিকা ইহা অবগত হইবেন।

পঁচিশ বৎসরাধিক অনুকরণীয় অধ্যাত্ম ও ঐহিক কর্মানুষ্ঠানের পর স্বামী নির্মলানন্দ বাঙ্গালোর ত্যাগ করিলেন। তত্তুল্য সেবাব্রত অতি অল্প লোকেই আচরণ করিতে সমর্থ। ইহার সদৃশ জনহিতকর কর্ম ভারতবর্ষে যুগাবতারের কোনও শিষ্য কর্তৃক ইতঃপূর্বে চেষ্টিত বা সাধিত হয় নাই। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে

জুন মাসে স্বামী নির্মলানন্দ ত্রিবান্দ্রমস্থ ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এখানে তিনি শ্রীগুরু মহারাজের পাদপদ্মে শেষ দল ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস দানার্থ উৎসর্গ করিলেন। পূর্বে এই ছয় জন ব্রহ্মচারী তাঁহার নিকট দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্য লইয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে তাঁহাদের নাম হইল স্বামী রামানন্দ, পরমানন্দ, সচ্চিদানন্দ, অমলানন্দ এবং কৃষ্ণানন্দ। উক্ত আশ্রমে কয়েক দিন থাকিবার পর তিনি বোম্বাই দিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তিনি বাংলা দেশের নানা স্থান ভ্রমণান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ভক্ত ডাক্তার ৺দুর্গাপদ ঘোষ তাঁহার চিকিৎসার ভার লইলেন। ৺যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ও অন্যান্য বহু ভক্ত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিলেন। তাঁহার অবস্থা উদ্বেগজনক হইল। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এবং স্যার নীলরতন সরকারকে ডাকা হইল। তাঁহারা সকলে সর্বসম্মত অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, উক্ত রোগ মারাত্মক। রোগী এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, নড়িতে বা কথা বলিতেও পারিতেন না! আরোগ্যের আশা নির্মূল হইয়া উঠিল। কোনও রকমে তিনি ডাক্তারদের অভিমত অবগত হইলেন। তখন তিনি স্বামী ত্রিপুরানন্দ ও নিজ ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষকে ডাকিয়া বলিলেন—"চিন্তিত হইও না, আমি এখন মরিবো না, শ্রীগুরু মহারাজের আরও কিছু কাজ আমাকে করিতে হইবে। তাহা শেষ করিবার জন্য আমার বাঁচিয়া থাকা দরকার। বড় বড় ডাক্তারগণ যাহা ইচ্ছা বলুন আমি তাঁহাদের চিকিৎসার অধীন হইতে চাহিনা। আমি গরীব সাধু, আমি শুধু তোমার ঔষধ খাইবো। তুমি যাহা ভাল মনে করো সেই ঔষধ আমাকে খাইতে দাও। যদি মনে করো যে আমাকে ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া দরকার, আমাকে রোজ তিন চারিটি ইন্‌জেক্‌সন্ দিতে পারো। তাহাতে আমি ভয় পাইবো না।"

যে ভাবে এই সকল আশ্বাসবাণী উচ্চারিত হইল, তাহা বস্তুতঃ জোরালো ও নির্ভীক, কিন্তু যে বাক্যগুলিতে উহা প্রকাশিত হইল, সেগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট। তিনি এতই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও প্রত্যেকেই ভাবিয়াছিলেন—তাঁহার অন্তঃকাল সমাগত। প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ সেবারত ভক্তবৃন্দকে পরামর্শ দিলেন—নিকটস্থ ও দূরবর্তী শিষ্যবৃন্দকে আসিবার জন্য তার করিতে। তদনুসারে স্বামীজীকে না জানাইয়া তাঁহার অনুমতি

না লইয়া সেবকবৃন্দ সমস্ত প্রধান আশ্রমে তার যোগে সংবাদ পাঠাইলেন। ইহার ফলে ভারতের নানা স্থান এবং সুদূর ব্রহ্মদেশ হইতে ভক্তবৃন্দ দলে দলে গুরু-দর্শনে আসিলেন। যদিও স্বামীজী তাঁহাদিগকে দেখিয়া সুখী হইলেন তথাপি তিনি গভীরভাবে দুঃখিত হইলেন এইজন্য যে, এই দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য তাঁহাদের অধিক অসুবিধা ও অর্থ ব্যয় হইল। সমুদ্বিগ্ন সেবকগণ ভক্তবৃন্দকে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটজনক জানাইবার জন্য তিনি তাঁহাদের উপর বিরক্ত হইলেন। তাঁহার দৈহিক সামর্থ্য অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছিল এবং জীবনপ্রদীপ নির্বাপিতপ্রায় হইয়াছিল। সেই অবস্থাতেও তাঁহার আত্মশক্তি পূর্ব গৌরবে সমুজ্জ্বল ছিল এবং তাঁহার প্রজ্ঞা, প্রাখর্য ও প্রাচুর্যে দীপ্তিময়ী ছিল। সদসতের ভেদ জ্ঞান ও কর্তব্যবোধ পূর্ববৎ অব্যাহত ছিলো। ত্রিবাঙ্কুর এবং অন্যান্য সুদূর শহর হইতে যে সকল শিষ্য তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি স-স্নেহ আচরণে ইহা পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। যখন তাঁহাকে ভক্তগণের আগমন-সংবাদ দেওয়া হইল তিনি তাঁহাদের বিশ্রাম ও আহারের সুব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দিলেন এবং যখন ভক্তগণ তাঁহার সম্মুখে আসিলেন, তাঁহার প্রথম প্রশ্ন হইল—"কে তোমাদিগকে স্ব স্ব স্থান ছাড়িয়া এখানে আসিতে বলিয়াছে?" অনুরক্ত শিষ্যবৃন্দ করযোড়ে উত্তর দিলেন "আপনার অসুস্থতার সংবাদ তারযোগে পাইয়া আমরা এখানে আসিয়াছি। আপনাকে দর্শন করা আমাদের কর্তব্য মনে হওয়ায় আমরা না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনার অনুমতির অপেক্ষা করিতে আমাদের মন চাহিল না। এখন আমরা আপনাকে দর্শনলাভ করিয়াছি। আপনি আদেশ দিলে এইক্ষণেই আমরা ফিরিয়া যাইবো।" তখন তিনি পার্শ্বস্থ সেবকবৃন্দের দিকে তাকাইয়া স্পষ্ট সুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এই সকল ভক্তকে এই দূর স্থানে আমার সম্মতি ব্যতীত টানিয়া আনিয়া অযথা কষ্ট দেওয়া কত অযৌক্তিক হইয়াছে।" তাঁহারা, বিনয়ে নিবেদন করিলেন, ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁহার তদ্রূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যখন তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলিলেন "তাহা হইলে তোমরা এবং তোমাদের ডাক্তারগণ স্থির করিয়াছ যে, আমি এখনই মরি। না, না, আমি এখন মরিবো না।" এইভাবে তিনি প্রায় আধ ঘণ্টা এমন উত্তেজনা সহকারে বলিতে লাগিলেন যেন তিনি পুনরায় সুস্থদেহ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহী শিষ্যগণ, সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ এবং

বন্ধুগণকে দুশ্চিন্তায়, অসুবিধায়, ও অনর্থক অর্থব্যয়ে পড়িতে হইয়াছে বলিয়া তিনি এত বিচলিত হইয়াছিলেন! এখন তিনি স্নেহভরে সমাগত শিষ্যবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমাদের কোনও দোষ নাই, তোমরা এখন ফিরিয়া যাইও না।" তন্মধ্যে শুধু একজনকে শীঘ্রই ফিরিয়া যাইতে হইল, কারণ আশ্রম হইতে তাঁহার অনুপস্থিতি বিপজ্জনক হইবার সমধিক সম্ভাবনা ছিল।

যতদিন দূরাগত ভক্তবৃন্দ তাঁর কাছে রহিলেন ততদিন তিনি নিজেই নির্দেশ দিতেন—কিরূপে তাঁহাদের যত্ন লইতে হইবে, দিনে বা রাত্রে তাঁহারা কি খাইবেন এবং কোন্ কোন্ দ্রষ্টব্য স্থানে তাঁহারা যাইবেন ইত্যাদি। একদিন তাঁহারা নানা স্থান দর্শন করিতে প্রেরিত হইলেন। কথা ছিল—তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিবেন। কিন্তু গঙ্গার জোয়ারে তাঁহাদের নৌকা আসিতে কয়েক ঘণ্টা দেরী করিল। সন্তানতুল্য স্নেহাস্পদ শিষ্যদের প্রত্যাগমন পর্যন্ত তিনি ভোজন করিলেন না। এইরূপ ছিল তাঁহার শিষ্য-স্নেহ, কর্তব্যবোধ ও আতিথেয়তা! তিনি প্রায়ই বলিতেন, "সাধুর প্রধান নজর থাকিবে অন্যের প্রতি, নিজের দিকে নহে।" সুস্থ ও রুগ্ন দেহে এই নীতি তিনি আন্তরিকভাবে পালন করিতেন। যে ডাক্তার স্বামীজির চিকিৎসা করিতেন, রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি শুধু বলিতেন, "সমস্ত অভিজ্ঞ ডাক্তার একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার অবস্থা সংকটজনক কিন্তু রোগী বলেন যে, তিনি এখন মরিবেন না। এই সকল মহাপুরুষদের সম্বন্ধে কে কি বলিতে পারে? তাঁহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি যখন মুক্তকণ্ঠে কথা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের কথা আমার মনে পড়ে। এ বিষয়ে স্বামীজির সহিত তাঁহার সাদৃশ্য আছে। আর স্বামীজিই তাঁহার আদর্শ।" পূর্ব হইতেই উক্ত ডাক্তার বেলুড় মঠের সাধুদের চিকিৎসক ছিলেন। যখন ডাক্তারগণ ইহার অভিমত সমর্থন করিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার জীবন এখন বিপদ্‌মুক্ত নয় তখন তিনি কলিকাতার আবহাওয়া ও অন্যান্য অবস্থা তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে বলিয়া ত্রিবান্দ্রম আশ্রমে যাইতে সিদ্ধান্ত করিলেন। ডাক্তারগণ পরামর্শ দিলেন—আরও কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থান তাঁহার পক্ষে প্রয়োজন এবং সুদীর্ঘ ট্রেনযাত্রা না করিয়া ষ্টীমারে মাদ্রাজ গমন স্বাস্থ্যকর। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন—তাঁহার

স্বাস্থ্য এখনও সম্যক নিরাময় হয় নাই; কিন্তু তাঁহার বলিষ্ঠ সংকল্প এবং লৌহবৎ সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত প্রভাবশালী হইল। তিনি ট্রেনে সোজা ত্রিবান্দ্রম আশ্রমে গেলেন এবং তথায় পাঁচ মাস অবস্থান পূর্বক স্বাস্থ্যোন্নতি, শিষ্যদের শিক্ষা ও আশ্রমের উন্নতিবিধানে ব্যাপৃত রহিলেন।

বত্রিশ

বিবেকানন্দ মিশনের অধ্যক্ষতা

কোনও ব্রহ্মচারীর আচরণ সম্বন্ধে মতভেদ হেতু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বেলুড়মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীবৃন্দ ও গৃহী ভক্তদের মধ্যে প্রচণ্ড মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। অবশেষে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শিষ্য ব্যারিষ্টার শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় উক্ত বিরোধের একটা মীমাংসা হয়। ইহা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে মন কষাকষি রহিয়া যায় এবং একদল সাধু বেলুড়মঠ হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। বেলুড়মঠের তৎকালীন কর্ণধারগণের দুর্ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক প্রাচীন ভক্তও মঠের সংস্রব ত্যাগ করেন। উল্লিখিত সাধুদের প্রচেষ্টায় ও ভক্তগণের সহায়তায় উক্ত বর্ষে জন্মাষ্টমী দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সালেই ১৩ই ডিসেম্বরে বিবেকানন্দ মিশন স্থাপিত হয়। বাগবাজার পল্লীতে ৩।১ রামকৃষ্ণ-লেনস্থ বাড়ী ভাড়া লইয়া এই নূতন মঠ ও মিশন আরম্ভ করা হয়। স্বামী নির্মলানন্দ ওই সময় নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনর্লাভের জন্য কিছুদিন পুনাতে ছিলেন এবং সেখান হইতে বাঙ্গালোর যান।

এই নব প্রতিষ্ঠিত মঠ ও মিশনের সাধুবৃন্দ-এবং ভক্তদের সমবেত অনুরোধে স্বামী নির্মলানন্দ এই দুই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষপদ সানন্দে গ্রহণ করেন। তিনি বাঙ্গালোরে হইতে ১৯২৯ সালের ১১ই নভেম্বর নিম্নোক্ত তারযোগে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথকে স্বীয় সম্মতি জানাইলেন—"As all desiring I agree". ইহার অর্থ—যখন সকলে ইচ্ছা করেন আমি সম্মত আছি। পরে তিনি পত্রযোগেও জানাইলেন, "তোমাদের সকলেরই যখন একান্ত ইচ্ছা আমাকে প্রেসিডেন্ট

করিবার জন্য ও যদি বোঝ যে, আমার নাম দিলে ওখানকার কাজের সুবিধা হইবে তাহলে আমার কোন অমত নাই। আমি সর্বান্তঃকরণে ঠাকুর ও শ্রীমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তোমাদের কাজের খুব সুনাম, প্রসার, সফলতা ও উন্নতি হউক। তাঁহাদের কাজ তাঁহারা করিবেন। আমরা মুটে, খেটে খাই মাত্র।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের একশত উনত্রিশ জন অনুরাগী ভক্ত-সাধু লইয়া ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ডিসেম্বর বিবেকানন্দ মিশন প্রতিষ্ঠিত এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের একুশধারা অনুসারে রেজিষ্টার্ড হয়। এই সকল সভ্যের মধ্যে ২২ জন সাধু এবং ১০৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও অনুরাগী ভক্ত। তাঁহারা সকলে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য, সেবাব্রতী কর্মবীর, বেদান্তকেশরী নির্মলানন্দজীকে বিবেকানন্দ মিশনের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণের জন্য স-ভক্তি প্রার্থনা জানাইলেন। স্বামীজি তাঁহাদের আন্তরিকতা উপলব্ধি করিয়া উক্ত দায়িত্বপূর্ণ অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করেন এবং মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত নয় বৎসর উক্ত পদে আরূঢ় ছিলেন। তিনিই বিবেকানন্দ মিশন ও রামকৃষ্ণ সারদামঠের প্রথম অধ্যক্ষ।

বিবেকানন্দ মিশনের সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্যে ছয়টি নিম্নলিখিত হইল —

(১) সকল ধর্মের মূল তত্ত্বগুলির সহিত সার্বভৌমিক বেদান্তের অনুশীলন ও সাধনা। (২) মানবের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশই শিক্ষা—স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ত এই সংজ্ঞা অনুসারে শিক্ষা প্রদান ও শিক্ষা প্রচার এবং তদুদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালন। (৩) স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী শিক্ষা বিস্তার। (৪) নারায়ণসেবা বোধে মানবসেবা কার্যে ব্রতী হওয়া। (৫) কার্যনির্বাহক সমিতির অনুমোদনে পুস্তক, সংবাদপত্র, মাসিক-পত্র, মুদ্রণ ও প্রকাশ। (৬) মিশনের উদ্দেশ্যগুলির সহিত কোনও না কোনও রূপে সংশ্লিষ্ট ও সহায়ক যে কোনও কার্য সম্পাদনের আয়োজন।

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণান্তে বিবেকানন্দ মিশনের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ স্বামী নির্মলানন্দ ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০ হাওড়া ষ্টেশনে আসিলেন। তথায় তিনি মিশনের সভ্যগণ কর্তৃক সমারোহে সম্বর্ধিত হন। ২২শে সেপ্টেম্বর সোমবার মহালয়া দিবসে কলিকাতার শ্যামবাজার পল্লীতে স্বর্গত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাসগৃহে তাঁহাকে এক সুবৃহৎ ধর্মসভায় বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজী তিন ভাষায় তিনটি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। বিবেকানন্দ মিশনের উপাধ্যক্ষ কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি একটি উপযুক্ত বক্তৃতায় পূজ্যপাদ অধ্যক্ষকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন

করেন। কলিকাতা সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এম. এ. কর্তৃক সংস্কৃত অভিনন্দন এবং মিশনের সম্পাদক শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত কর্তৃক বাংলা অভিনন্দন এবং মিশনের অন্যতম উপাধ্যক্ষ ৺যতীন্দ্রনাথ বসু এম. এ. এম. এল. সি. কর্তৃক ইংরাজী অভিনন্দন পঠিত হয়।

বাংলা অভিনন্দন

শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহোদয়ের

করকমলে—

ভক্তিভাজন মহাত্মন্!

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ মধ্যেই জগতে একটি নূতন ধর্ম প্লাবনের সূচনা হয়। এবারও সর্বসাধারণের অপরিচিত এক ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম-প্রান্তে এক মহীয়সী শক্তি ভাগবতী তনুতে প্রকাশ হইয়া শোকতাপজর্জরিত মানবগণের অশান্ত হৃদয়ে শান্তির আলোক বর্তিকা জ্বালিয়া অজ্ঞানতাজনিত অশেষ দুঃখ-দৈন্য, ক্লেশ-তাপ ও তিমির নাশ করিতে আরম্ভ করেন।

সন ১২৪২ ৬ই ফাল্গুন (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী) হুগলী জেলার জাহানাবাদ মহকুমার অজ্ঞাতনামা কামারপুকুর গ্রামে এই মহাশক্তির প্রকট মূর্তি শ্রীগদাধর বিগ্রহে দেখা দেন। বাল্যকাল হইতে অতিমানুষিক লীলাসকল ধীরে ধীরে অনুষ্ঠিত হইয়া যৌবনকালেই এই ধৃত ধর্মবপু পুরুষোত্তমের অভূতপূর্ব সাধনা লোক-লোচনের গোচরীভূত হয়, ও শেষে সেই অনন্যসাধারণ জ্যোতির্বিকাশ বর্তমান জগতে এক অভিনব মহাধর্মসমন্বয়-চক্র প্রবর্তনকারী রূপে প্রতিভাত হইয়া স-সাগরা মেদিনীকে আলোকিত করে। এই লোকোত্তর পুরুষ আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আখ্যায় জগদ্বিখ্যাত। যখন জগতে মহাশক্তির আধার অবতাররূপে প্রকাশ হন তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ—লীলাসহচর অন্তরঙ্গগণকেও আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। এই বারেও আচার্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দ প্রমুখ অসাধারণ ত্যাগ-তপস্যার মূর্ত বিগ্রহ সকল দেখা দিয়াছেন; তাঁহারা প্রভুর লীলা-সহায়ক—'জনমে জনমে দাস তব দয়া নিধে।'

মহাত্মন্! আপনিও সেই ধর্ম-সেনানীগণের অন্যতম প্রধান একজন। আবাল্য বিবেক-বৈরাগ্যাশ্রিত আপনার মন অতি সহজেই এই মহাধর্মবীরের

অ-মানবশক্তি উপলব্ধি করিয়া যৌবন প্রারম্ভেই শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন। শেষে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবেকানন্দ-অনুমোদিত বৈরাগ্যপথ অবলম্বনে সন্ন্যাসী হয়েন। পরে কিঞ্চিন্‌ন্যূন অর্ধ শতাব্দী কাল চুয়াল্লিশ বৎসর ধরিয়া শ্রীগুরু-প্রবর্তিত মহাপথ অবলম্বনপূর্বক যতিরাজ শ্রীশ্রীবিবেকানন্দকে অনুসরণ করিয়া প্রতীচ্যে ১৯০৩ হইতে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর ও তৎপরে প্রাচ্যে পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ করিয়া নানাজাতির মানবগণের নিকট 'সত্যের বার্তা' 'শিবের জ্ঞান' ও 'সুন্দরের আনন্দ' প্রচার করিয়া তাহাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি প্রদেশে বিগত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে বিবেকানন্দের আদর্শ ও শিক্ষা প্রচার কল্পে আঠারোটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া অনন্যসাধারণ কর্মশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বর্মা, বম্বে, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য প্রদেশ এবং জন্মভূমি বঙ্গদেশে সর্বত্র বহুবার পরিভ্রমণপূর্বক স্বীয় দেশবাসীর ধর্মতৃষ্ণায় শান্তি দান করিয়া তাহাদের প্রভূত মঙ্গল সাধনে চিরযত্নশীল রহিয়াছেন।

আজ তাই আপনার জন্মভূমি কলিকাতাবাসিগণ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরণাশ্রিত সাধুগণের সমবায়ে গঠিত এই নূতন ধর্ম সম্প্রদায় বিবেকানন্দ মিশন আপনাকে কর্ণধাররূপে বরণ করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিতেছে। সুস্বাগতম্! সুস্বাগতম্! সুস্বাগতম্! মহাত্মন্! আপনি তাঁহাদের সমবেত শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ইতি—

মহালয়া
৫ই আশ্বিন
১৩৩৭ সাল

বিবেকানন্দ মিশনের শ্রদ্ধাবনত
সদস্যগণ

২।১নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা

এই তিন অভিনন্দন পত্রের উত্তরে স্বামী নির্মলানন্দ যে বক্তৃতা দেন তাহার সারাংশ কলিকাতার ইংরাজী দৈনিক 'এ্যাড্‌ভান্স' পত্রিকায় ১০ই অক্টোবর প্রকাশিত হয়। ইহার বঙ্গানুবাদ এখানে প্রদত্ত হইল—

"আপনাদের সম্মুখে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এক অতি নম্র ও নগণ্য সেবক দণ্ডায়মান। তাহার বয়স এখন কিঞ্চিদধিক আটষট্টি বৎসর। বহু বৎসরব্যাপী

কঠোর শ্রমসাধ্য কর্মে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে; এবং সে একজন ভাল বক্তাও নহে। সুতরাং আপনারা তাহার নিকট হইতে সুদীর্ঘ ভাষণ আশা করেন না। যদিও আমার হৃদয় ভাবপূর্ণ হওয়ায় আমি আমার ভাব সম্যক প্রকাশ করিতে অক্ষম তথাপি আপনারা স্বতঃই অনুভব করিতেছেন, আমার হৃদয়ে কি ভাবাবেগ চলিতেছে। আপনাদের হৃদয়গুলি আমার হৃদয়ের সহিত প্রীতিসূত্রে গ্রথিত থাকায় সেই ভাব আপনাদের অন্তরেও তরঙ্গ তুলিতেছে।

কেবল কয়েক মাস পূর্বে যখন আমি বাঙ্গালোরে ছিলাম তখন আমি জানিয়া সুখী হইয়াছিলাম যে, এই স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা অনুসারে সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কীয় কিছু কাজ নূতনভাবে আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ ধীরে ধীরে যাঁহারা প্রগতির পথে সেবাধর্ম অনুষ্ঠানে তৎপর, তাঁহাদের মনে এই চিন্তা জাগিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসী মণ্ডলীর মধ্যে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ ও কেন্দ্রীকরণ-শক্তির বিরুদ্ধে বৃথা শক্তিক্ষয় না করিয়া ঠাকুর-স্বামীজির নির্দেশ অনুসারে সংঘবদ্ধ হইয়া নূতন পথে কাজ করাই শ্রেয়। এই ধারণা তখনই রূপ পরিগ্রহ করিল যখন এখানে একটি ক্ষুদ্র সংঘ এখনও পর্যন্ত অঙ্কুরাকারে অবস্থিত; অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাব-প্রেরণায় সম্যক্ উদ্বুদ্ধ ও অধিষ্ঠিত। আমি আপনাদিকে পূর্বেই বলিয়াছি যে বিবেকানন্দ মিশন স্থাপনের সংবাদ পাইয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম এবং অনুরুদ্ধ হইয়া আপনাদের সহযোগিতা করিতে আন্তরিক সম্মতি দিয়াছিলাম। আজ আমি দেখিয়া সুখী হইলাম যে, অঙ্কুরিত ক্ষুদ্র সংঘ সতেজ-সজীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে, কালে ইহা সেই আলোক বিকিরণে সমর্থ হইবে যাহা যুগাচার্য বিবেকানন্দ সমগ্র পৃথিবীতে বিকিরণ করিতে আসিয়াছিলেন। বৈচিত্র্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ অবতীর্ণ। আমাদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের আলোক এবং শান্তি সমন্বয়ের বার্তা বহন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্রতম বিরোধ-বীজও বপন করিতে কুত্রাপি চেষ্টা করিবেন না। এই নব সংঘ বিবেকানন্দ মিশন প্রতিযোগী বা প্রতিবাদমূলক প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন নহে। যে সকল সংঘ ও মঠ একই আদর্শে ও উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য করিতেছে তাহাদের সহিত আমাদের কোনও বিরোধ বা বিবাদ
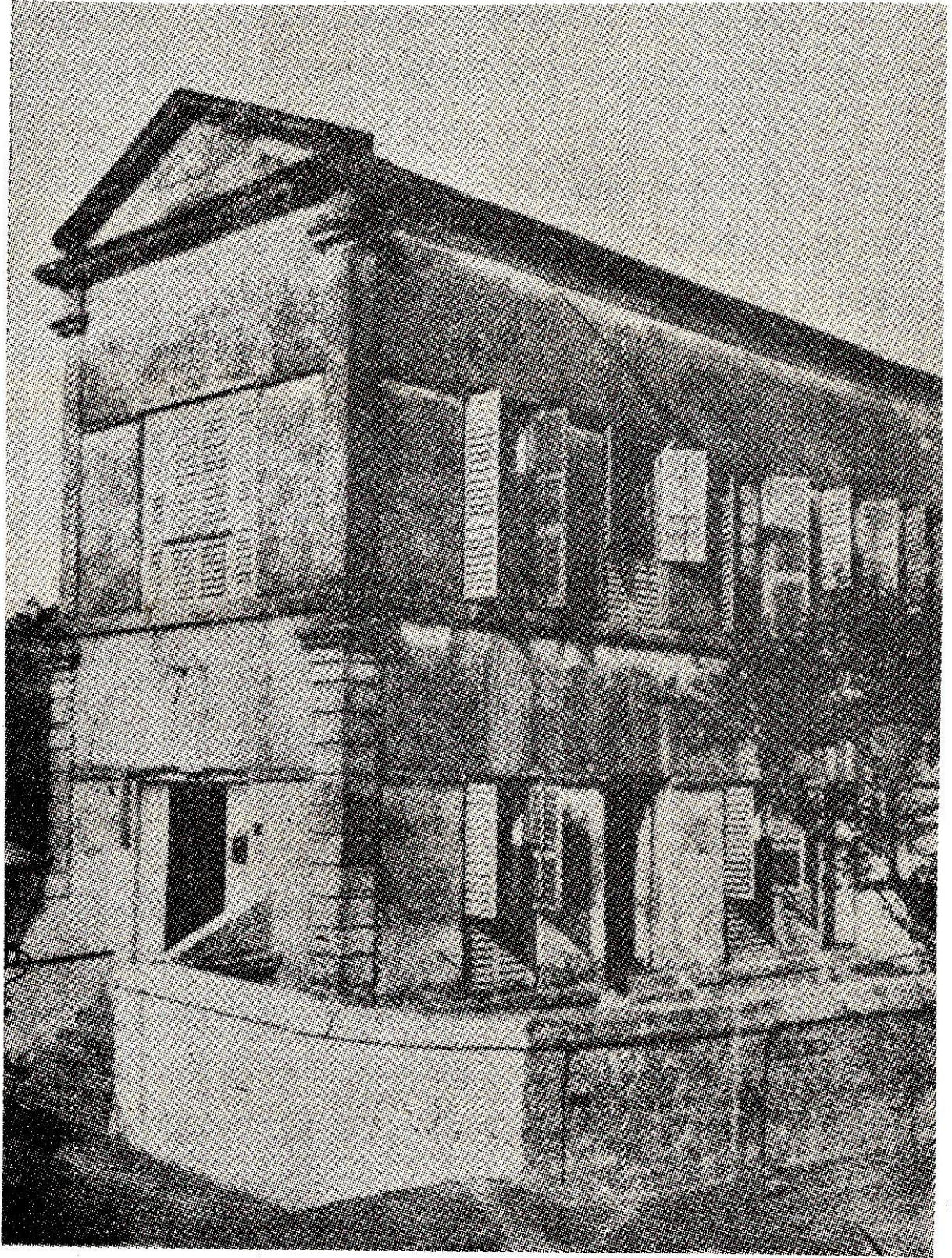
বিবেকানন্দ মিশন

বাগবাজার, কলিকাতা।

নাই। এই জগৎ এবং উহার কর্মক্ষেত্র এত বিশাল যে, একাধিক ধর্মসংঘ পাশাপাশি অথবা সহযোগী হইয়া কাজ করিতে পারে। ইহা সহজেই বোঝা যায়, এবং এই বিষয়ে আমি অধিক বলিতে চাই না।

"সে যাহা হউক, আমি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের চরণে আবেগভরে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহাদের করুণাময় জ্ঞানালোক আমাদের কর্মপথ আলোকিত করুক। আমাদের কর্মপথে বহু বাধা-বিঘ্ন আসিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের কৃপার বলে তৎসমুদয় অনায়াসে অতিক্রান্ত হইবে। যদি আমাদের আন্তরিক ও ষোলআনা ভক্তি-বিশ্বাস থাকে তবে আমরা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিয়া দেখিব, বিবেকানন্দ মিশন সুবিশাল ধর্ম সংঘে পরিণত হইয়া ভারতবর্ষের সর্বত্র বিস্তার লাভ করিতেছে। নিশ্চয়ই ইহা শাখা-প্রশাখায় ও পত্র-পুষ্পে শোভিত হইবে এবং আমরা একদিন দেখিব যে, পুরাতন ঋষিবংশের পুত্র-কন্যাগণ দিব্য প্রেরণার এই নব উৎসে পীযূষধারা পান করিতেছে। দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে যে দিব্য অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল উহার রশ্মিজাল বর্তমান শতকের মধ্যেই এই দেশের সর্বপ্রকার কর্মক্ষেত্রকে প্রভাবিত করিবে।

"ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, জগতে যখন কোনও মহাপুরুষ আবির্ভূত হ'ন, তখন জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামাজিক, নাগরিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি সূচিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে নিঃসংশয়ে ইহাই প্রমাণিত হয়। তিনি শান্তি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছিলেন। প্রত্যেক মানব ঈশ্বরের অংশীভূত প্রতিমূর্তি এবং সকল মানুষ সর্বশক্তিমান ভগবানের পুত্র-কন্যা —ইহা যতদিন মানবজাতি শিক্ষা না করিবে ততদিন তথাকথিত রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনসমূহ শান্তি স্থাপনে অক্ষম থাকিবে। যখন এই উদার ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হইবে, তখন সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিবে। এই সামান্য সন্ন্যাসী সম্বন্ধে আপনারা যে সদয় ও সপ্রেম বাক্যাবলী উচ্চারণ করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। বস্তুতঃ আমি শ্রীরামকৃষ্ণের পদরজঃ স্পর্শ করিতে যোগ্য নহি। আমার প্রতি আপনাদের প্রীতি ও বিশ্বাসের জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। যদি আমার বাক্যের কোনও শক্তি থাকে, আমি প্রার্থনা করি—এই নবজাত ধর্ম সংঘ চিরস্থায়ী হউক।"

উক্ত সভায় কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং শত শত নরনারী উপস্থিত

ছিলেন। এই উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত সঙ্গীত এবং তিনখানি অভিনন্দন পত্রের মুদ্রিত কপি শ্রোতাদের মধ্যে বিতরিত হয়। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর হলে ২৬শে অক্টোবর স্বামী নির্মলানন্দ প্রশ্নোত্তর-সভায় অনেক জটিল সমস্যার আলোচনা চিত্তাকর্ষকভাবে করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি গীতার ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধেও মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার মধুর বাণী শুনিবার জন্য উক্ত হলে বহু শ্রোতা সমবেত হইয়াছিলেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বামী নির্মলানন্দ স্বামী ত্রিপুরানন্দকে সঙ্গে লইয়া নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ও মৈমনসিং প্রভৃতি স্থানের ভক্ত-মণ্ডলী কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। এই ভ্রমণে স্বামী নির্মলানন্দ তিনটি বিরাট ধর্মসভায় তিনটি ভাষণ দেন। কলিকাতার দুই ইংরাজী দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'এ্যাড্‌ভান্স'এ ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাহির হয়। 'বাগবাজার দরিদ্র ভ্রাতৃমঙ্গল সমিতি'ও স্বামী নির্মলানন্দকে একটি অভিনন্দন পত্র দেন। ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তরে তিনি অধুনা বাঙ্গালী তরুণদের কর্তব্য ও আদর্শ সম্বন্ধে একটি সরল বক্তৃতা দেন। কলিকাতা বিবেকানন্দ মিশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠ অভিন্নভাবে অবস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা, ভোগারতি, জন্মোৎসব, ৺কালীপূজা ও ৺দুর্গাপূজা প্রভৃতি নিষ্ঠাপূর্বক সম্পন্ন হয়। 'প্রত্যেক একাদশী-সন্ধ্যায়' রামনাম সংকীর্তন এবং প্রত্যেক শনিবার ও রবিবার সন্ধ্যায় ধর্মসভা ও ধর্মসংগীত হইয়া থাকে। অমর কথামৃতকার শ্রীম এবং পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীও এই মঠে পদার্পণ করিয়াছেন। এই মঠে, ওট্টাপালম্ আশ্রমে এবং মালাবারের আশ্রমসমূহে নির্মলানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি প্রতিবর্ষে সম্পন্ন হয়।

স্বামী নির্মলানন্দ বিবেকানন্দ মিশনের অধ্যক্ষরূপে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গে যে বিস্তৃত ভ্রমণ করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কলিকাতার দুই প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক 'এ্যাড্‌ভান্স' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার 'এ্যাড্‌ভান্স্' দৈনিকে মৈমনসিং ও নেত্রকোণায় ভ্রমণের সংবাদ এবং ১৭ই ডিসেম্বর বুধবার 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' ঢাকায় প্রচারের বিবরণ প্রকাশিত হয়।

"শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং বিবেকানন্দ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী নির্মলানন্দজীর শুভাগমনে মৈমনসিং সহরে নব জীবনতরঙ্গ অনুভূত হইতেছে।

তাঁহার পুণ্য দর্শনলাভ এবং উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য মফঃস্বল হইতে প্রত্যহ হাজার হাজার নরনারী আসিতেছেন।

স্বামীজীর দিব্য উপস্থিতি ও প্রেরণাপ্রদ উপদেশ সহরে জীবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে এবং শ্রোতাদের হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়াছে। হিন্দু ধর্মসভার উদ্যোগে স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে তিনি ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন গঠনে ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে এক হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা দেন। সহরের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।"

"নেত্রকোণা বার এ্যাসোসিয়েসন হলে স্বামীজী যে বক্তৃতা দেন তাহার বিষয় ছিল 'ধর্মের সৃজনী শক্তি'। হাজার হাজার নরনারী তাঁহার প্রাঞ্জল ও প্রেরণাপ্রদ ভাষণ শুনিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করেন। পূর্বে তাঁহার ঈশ্বরকোটী গুরুভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দের ভ্রমণের মতই তাঁহার এই ভ্রমণে এক অভূতপূর্ব ধর্ম-জাগরণ আসিয়াছিল। স্বামীজীর বাণী ও স্মৃতি শ্রোতাদের অন্তরে চিরকাল জাগ্রত থাকিবে।

"৮ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার স্বামী নির্মলানন্দ ঢাকা বাউলি ইনষ্টিটিউট হলে 'দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের স্থান' সম্বন্ধে একটি শিক্ষাপ্রদ ও সারগর্ভ ভাষণ দেন। শ্রোতাদের আগমনে সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং সকলে মনোযোগ সহকারে এই সাধুর বক্তৃতা শ্রবণ করেন। স্বামীজী বলিলেন—"জনসাধারণের আচার-অনুষ্ঠানে প্রকৃত ধর্ম বিরাজ করে না, কারণ আচার ও অনুষ্ঠান স্থান ও কালের ব্যবধানে বিভিন্ন হয়। ব্রহ্মচর্য পালন, হৃদয়ের সাধুতা, নিঃস্বার্থ প্রেম ও সেবা এবং উদ্দেশ্যের সততা, প্রভৃতি সদ্‌গুণ খাঁটি ধর্মের বাহ্য রূপ। স্বামী বিবেকানন্দ এই নব ধর্মের প্রচারক ছিলেন, আমরাও তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী।"

তেত্রিশ

ওট্টাপালমে দিব্যদর্শন

বাঙ্গালোর আশ্রম ত্যাগের প্রায় তিন বৎসর পরে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ৩১শে মে স্বামী নির্মলানন্দ মহাপ্রস্থান করিলেন। এই স্থানে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট তিনি বৎসর অতিবাহিত হয়। কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি

তথায় অতীত জীবনের স্মৃতি-স্রোতে ভাসিতে-ডুবিতে লাগিলেন। সপ্তদশক-ব্যাপী জীবনযুদ্ধ সমাপ্তপ্রায়। জগতের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ. হার-জিত, শত্রু-মিত্র প্রভৃতি দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে তাঁহার মন ব্রহ্মরাজ্যে প্রবেশোন্মুখ দিব্য দর্শনের উন্মাদনায় দিশাহারা।

ওট্টাপালমে তাঁহার প্রথম লক্ষণীয় কার্য হইল কুমারী পূজা। বিশটি কুমারীকে তিনি ষোড়শ উপচারে বিধিপূর্বক পূজা করিলেন এবং পূজান্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্বক দক্ষিণা দিলেন। ইহার পর তন্মধ্যে যে নয়টি ভাগ্যবতী কুমারী ধর্ম-জীবন গ্রহণ করিয়াছিলন তাঁহাদের নাম—ভুবনেশ্বরী, সারদা, সুশীলা, সরোজিনী, পার্বতী, সাবিত্রী, মীনাক্ষি, পদ্মিনী ও দাক্ষায়ণী। আতুর গ্রামের রুক্মিণী এবং সারদাও ঘন ঘন আসিয়া তাঁহার কাছে থাকিত। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন তাহাদের মাতা, পিতা, গুরু, বন্ধু ও চালক। সাধক রামপ্রসাদের নিকট যেমন জগদম্বা কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তেমনই সরলা কুমারীগণ এই বৃদ্ধ সাধুর নিকট দেবীরূপে আসিয়াছিলেন। এই জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রহ্মবাদী কন্যাকুমারী মন্দিরে এই দিব্য দর্শন বহুবার লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গুরুদেবও দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে সারদাদেবীকে ষোড়শী পূজা করিয়া তাঁহার সাধন-যজ্ঞ সমাপ্ত করেন। শিবত্বপ্রাপ্তির পর যোগী অন্তরে ও বাহিরে শক্তিলীলা উপভোগ করেন। মায়ামুক্ত কুমারী-স্নেহ শক্তিদর্শনের চাক্ষুষ প্রকাশ।

স্বামী নির্মলানন্দ উল্লিখিত নয়টি কুমারীকে সুশিক্ষা ও অন্যান্য বিদ্যাদানে আগ্রহশীল ছিলেন। চারিদিকে তাকাইয়া তিনি দেখিলেন—পার্শ্বস্থ গ্রাম পালপরমে অগণিত বালক-বালিকা নিরক্ষর অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের পিতামাতা বা অভিভাবকগণ অতি দরিদ্র ও অশিক্ষিত বলিয়া তাহাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে অসমর্থ। এই জন্য তিনি আশ্রম প্রাঙ্গণে দুইটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তন্মধ্যে যেটি বালিকাদের জন্য উহার নাম দিলেন "সারদা বিদ্যালয়" এবং অন্যটি বালকদের জন্য, উহার নাম রাখিলেন "নিরঞ্জন বিদ্যালয়"। দুই বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত হইলেন। উচ্চতম নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নতম পারিয়া পর্যন্ত সর্ব বর্ণের ও সর্বশ্রেণীর বালক-বালিকাগণ দলে দলে আসিয়া উভয় বিদ্যালয়ে যোগ দিল। তন্মধ্যে অনেকেই বই বা শ্লেট কিনিতে অক্ষম ও বস্ত্রাভাবে নগ্নপ্রায়। স্বামীজীর কোমল হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি বোম্বাইতে অনুরক্ত ভক্তদের নিকট চলিলেন এবং প্রায়

হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি ভিক্ষা করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারার্থ আনিলেন —পাঠ্যপুস্তক, শ্লেট, কাগজ-পেন্সিল, নোটবুক, ছবির বই ও বিবিধ প্রকার জামা কাপড় এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে সেইগুলি তিনি তাহাদের মধ্যে সানন্দে বিতরণ করিলেন। যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর অন্ন সংস্থান ছিলনা তাহারা আশ্রমেই আহার করিত। অধিকাংশ দিবসে আশ্রমে কোন না কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হইত, এবং সমস্ত বালক-বালিকা বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে উপাসনা-গৃহে একত্র উপবিষ্ট হইয়া সমভাবে প্রসাদ পাইত। তাহাদের মাতা-পিতারাও এই সকল উৎসবে যোগ দিতেন। উভয় বিদ্যালয়ে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বামীজী স্বয়ং ব্যায়ামাগারে যাইয়া শিশুগণকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। তাহাদিগকে কীর্তন, ভজন, জপ, ধ্যানও শিক্ষা দেওয়া হইত। যে সকল ছাত্রের গৃহ আশ্রমের নিকটবর্তী ছিল তাহারা অধিকাংশ সময় আশ্রমেই কাটাইত। এইরূপে তাহারা সর্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা এবং গুরুকুলবাসের প্রায় সকল সুযোগ লাভে ধন্য হইল। বিদ্যালয়ের অনুমোদন বা আর্থিক সাহায্যের জন্য তিনি সরকারী শিক্ষাবিভাগে দরখাস্ত করিতে অসম্মত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারার্থ এবং এমন কি, নিরক্ষর পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য তিনি সেই সবকে কালক্ষেপ বা কথা প্রসঙ্গের বিষয়ীভূত করার আয়োজন করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঠাকুরের জীবনের কিয়দংশ মালয়ালম ভাষায় অনুবাদ করাইয়া দুইবার আশ্রমে অভিনীত করাইলেন।

শুধু জনসাধারণের উন্নয়ন ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার দিব্যপ্রেম ব্যক্তিগত জীবনসমূহকে পূর্ণতর ও মহত্তর করিবার জন্য বিদ্যুদ্বেগে প্রবাহিত হইল। সেই দরিদ্রগ্রামে নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণগণ, বিশেষতঃ তাঁহাদের নারীকুল সর্বাপেক্ষা অধিক দুর্দশাগ্রস্ত ছিলেন। উক্ত সম্প্রদায় মুক্তিহীন হৃদয়হীন সামাজিক নির্যাতনে পড়িয়া যেন গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিল। অদ্যাপি প্রচলিত প্রাচীন প্রথা অনুসারে তাঁহাদের নারীগণ গৃহরুদ্ধা থাকিয়া অজ্ঞতায় পঙ্গু হইয়াছিল। তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় এই সকল অভাগিনীদের জন্য কাঁদিয়া আকুল হইল। তাহাদের উদ্ধার বা উন্নতির দ্বার দীর্ঘকাল রুদ্ধ ছিল এবং এই স্বার্থপর পৃথিবীর কেহই তাহাদের জন্য ভাবে নাই। তাহাদের সম্বন্ধে একটি কথাও না বলিয়া অথবা তাহাদের দুরবস্থার কথা একবারও উল্লেখ না

করিয়া স্বামী নির্মলানন্দ তাহাদের জন্য ধীরে ধীরে দৃঢ়ভাবে কার্য করিলেন। ক্রমশঃ তিনি তাহাদের পুঞ্জীভূত প্রাচীন প্রশ্ন ও কুসংস্কারের স্তূপে আগুন লাগাইলেন, এবং তাহাদের অন্ধকার অন্তঃকরণে দিব্য আলোক সম্পাত করিলেন। তিনি তাহাদের জন্য স্কুল করিয়া আহার ও মনের খোরাক উভয়ই যোগাইলেন এবং স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্মাণ করাইলেন। ইহার ফলে তাহাদের সকল দিকে উন্নতি হওয়ায় তাহারা শান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহারা শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানরূপে সমাজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল এবং যোগ্য নরনারী হইল। উন্মীলিত নয়নে ও প্রসারিত হৃদয়ে তাহারা বিশাল বিশ্ব ও পুণ্য তীর্থসমূহের কথা ভাবিতে শিখিল। জীবনে অন্ততঃ একবার ক্ষুদ্র গৃহ বা গণ্ডগ্রামের চতুঃসীমার বাহিরে যাইয়া এক বা একাধিক তীর্থ দর্শনের জন্য তাহারা ব্যাকুল হইল। স্বামীজী তাহাদিগকে উৎসাহ ও অর্থ দিলেন এবং রামেশ্বর ও কন্যাকুমারী তীর্থে পাঠাইলেন। মহাসমাধির কয়েক মাস পূর্বে তিনি নিজেই তাহাদের অনেকগুলিকে কন্যাকুমারী তীর্থে লইয়া যান। দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসার জন্য কতকগুলিকে ত্রিবান্দ্রামে প্রেরণ করেন। এই সকল ব্যাপারে তিনি স্বকীয় প্রযত্ন ও মনীষা প্রয়োগ করিতেন এবং তাহাদের যাত্রার সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার দিকে যথেষ্ট নজর রাখিতেন। মন্দমতি দূরদৃষ্টিহীন ব্যক্তিও বুঝিত যে, কুমারী পূজার দিন হইতে তিনি বিরাট ব্রহ্মের নিরন্তর উপাসনায় প্রমত্ত ছিলেন। তিনি তখন হইতে শুধু বাহ্য জীবন যাপন করেন নাই, তাঁহার সমগ্র সত্তা পরমাত্মাতে— জগন্মাতাতে বিলীন হইয়াছিল। তিনি দেখিতেন—সর্বভূতে সর্ব প্রাণীতে বিশেষতঃ সর্ব কুমারীতে জীবন্ত জাগ্রত জগন্মাতা; একদা যখন আশ্রম প্রাঙ্গণে তাঁহার সম্মুখেই অদূরে বালক-বালিকাগণ বিভিন্ন ক্রীড়ায় প্রমত্ত ছিল— দৌড়ানো, লাফ দেওয়া ও কুস্তি করা প্রভৃতি খেলা করিতেছিল তখন তিনি তাহাদের কাছে যাইয়া তন্মধ্য হইতে একটি বালিকাকে তুলিয়া উচ্চ স্থানে বসাইলেন, এবং অন্যান্য শিশুবৃন্দকে বলিলেন, উহার মধ্যে জগন্মাতাকে দেখিতে ও উহাকে পূজা করিতে। যে সকল বয়স্ক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন তিনি তাঁহাদিগকেও তদ্রূপ করিতে নির্দেশ দিলেন। কেহ কেহ ভাবিল যে, উহা স্বামীজীর অন্যতম কৌতুক। ইহা ভাবিয়া তাঁহারা অজ্ঞতাবশে হাসিতে লাগিলেন। অথচ স্বামীজী স্বয়ং সর্ব্বক্ষণ সুগম্ভীর

ছিলেন এবং অচিরে উক্ত কুমারীকে পূজা ও ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। তৎক্ষণেই অন্য সকলে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। যাহা অন্যের নিকট কল্পনা মাত্র তাহা তাঁহার নিকট ধ্রুব সত্য ছিল।

ওট্টাপালম আশ্রমে যে সকল শ্রমিক কাজ করিতে আসিত তন্মধ্যে স্বামীজী একদিন একটি বালিকাকে দেখিলেন। তৎক্ষণেই তিনি বলিলেন— "এই মেয়েটি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা" এবং তাহাকে আশ্রমের স্থায়ী পরিচারিকা নিয়োগ করিবার নির্দেশ দিলেন। অযাচিত ভাবে তাহাকে মন্ত্র দীক্ষা দিলেন। কন্যাকুমারীতে তিনি যাহাদিগকে স্বীয় ব্যয়ে লইয়া যান, সে তাহাদের অন্যতমা। তিনি উচ্চ-নীচ বা শিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রেণীভেদ করিতেন না। গীতার এই শ্লোকাংশটি তাঁহার মুখে প্রায়ই শোনা যাইত—'পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।' ইহার অর্থ, পণ্ডিতগণ—প্রাজ্ঞগণ সমদর্শী। পণ্ডা শব্দের অর্থ, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি বা সমাধিজা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। এই পণ্ডা বা প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইলে বিদ্বান্ বিনয়ী ব্রাহ্মণে, গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে ও চণ্ডালে—সর্বজীবে ব্রহ্ম দর্শন করেন। উক্ত শ্লোকের মর্মার্থ তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেন এবং এই দিব্য অনুভূতি তাঁহার সর্ব কর্মে স্বতঃই প্রকটিত হইত। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বেদান্ত সাধনায় সিদ্ধ হইয়া নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিবার পরও সর্বভূতে ইষ্টদেবী ৺কালীমাতাকে দেখিতেন, তদ্রূপ তৎশিষ্য স্বামী নির্মলানন্দ ব্রহ্মজ্ঞান লাভান্তে সর্বভূতে বিশেষতঃ অনাঘ্রাত কুসুমবৎ বিশুদ্ধচিত্তা কুমারীগণের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ীকে দেখিতেন। সিদ্ধ গুরুর শক্তিও সিদ্ধি শিষ্যে সঞ্চারিত হয়।

চৌত্রিশ

শিষ্যদের জীবন গঠন।

মৃদুল শিশিরবিন্দু সকলের অগোচরে পতিত হইয়া সুন্দরতম গোলাপকে প্রস্ফুটিত করে। তদ্রূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল স্বামী নির্মলানন্দের প্রভাব ও শিক্ষা। তাঁহার উপদেশ ছিল অতি অল্প, তাঁহার জীবন ছিল সকলের নিকট উজ্জ্বল উদাহরণ। যে সকল নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্বক সংসার

ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষাদান অলক্ষিত শিশির বিন্দুবৎ উহা মধুর হইত না কিন্ত ভূকম্পনকারী বজ্র নির্ঘোষবৎ কখনো কখনো ভয়ঙ্কর হইত। কোনোও শিষ্যের সামান্য ত্রুটিও তিনি নির্দেশ করিতে ভুলিতেন না। ইহাতে কেহ ভীত হইলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। কোমল হৃদয় সার্জন অস্ত্রোপচারে সমর্থ হয় না, তাহাকে ক্ষণকালের জন্য কঠোর ও নির্দয় হইতে হয়। অস্ত্রোপচার সুষ্ঠুভাবে না হইলে রোগীর দেহ রোগমুক্ত হইবে না। সেই জন্য স্বামীজী নির্মম হৃদয়ে শিষ্য-শিষ্যাদিগের ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করিয়া তাহাদের জীবনকে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রবৎ সুন্দর করিতে চাহিতেন। তিনি শিষ্য-শিষ্যাগণকে সাহসী ও নির্ভীক হইতে নির্দেশ দিতেন। নাম, যশ, শুভেচ্ছা বা সহযোগিতা লাভের জন্য তিনি আদৌ ব্যস্ত ছিলেন না। হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত তিনি সন্ন্যাস-আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে তিনি এত সম্যকরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন যে, বহু বহু পূর্বে তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা লুপ্ত হইয়াছিল। 'বহুজন-সুখায় বহুজন হিতায়' শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের জড় যন্ত্রতুল্য তিনি ছিলেন। ইহার ফলে তিনি একজন অভিজ্ঞ অধ্যাত্ম চিকিৎসকরূপে পরিণত হয়েন।

পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি শুধু সুচিকিৎসক ছিলেন না, তিনি অভিজ্ঞ সার্জনও ছিলেন এবং প্রয়োজনকালে ছুরিকা ব্যবহার করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হইতেন না। কিন্ত এইরূপ উপলক্ষ অত্যল্প হইত। এই যোগসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম-বেত্তার উপদেশ ছিল—"দেখো ও শেখো ; পর্যবেক্ষণ করো ও ধর্ম অবগত হও ; যথোচিত ও স্বাস্থ্যকর উপায়ে তোমার দেহ-মনের ব্যবহার করো।" তিনি তাহাদিগকে আশিষ্ট, বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ মানুষ করিতে চাহিতেন। তিনি জানিতেন যে, বাহির হইতে জ্ঞানদান বা ধর্মশিক্ষা নিরর্থক। সকলের হৃদয়েই জ্ঞানাগ্নি বিদ্যমান। তবে ইহা পর্দাবৃত—এই পর্দা তুলিয়া দেওয়াই গুরুর কার্য। তপস্যারূপে উপাসনারূপে নিষ্কাম ভাবে কঠোর কর্ম করিলে এই আবরণ সহজে অপসৃত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী বা অন্য কোনও উপাধি তাঁহার শিষ্যদের জন্য ধর্মজীবনের পক্ষে তিনি প্রয়োজন তিনি বোধ করিতেন না। তাহাদের সচ্চরিত্র শুদ্ধচিত্ত এবং অনমনীয় দৃঢ়সংকল্প থাকিলেই যথেষ্ট মনে করিতেন। এমন কি এখানেও তিনি এত সদয় ও প্রশ্রয়দাতা ছিলেন যে,

অসীম অসাধুতা ও উন্মার্গগামিতা সহ্য করিতেন এই আশায় যে, কালে অনুকূল পরিবেশে পড়িলে মানুষ সংশোধিত হইবে। সদুদ্দেশ্যে পরার্থে কঠোর দৈহিক পরিশ্রমকে তিনি প্রকৃত তপস্যা রূপে বিবেচনা করিতেন। ভক্তদের সম্মুখে তিনি এই উদার লক্ষ্য স্থাপিত করিতেন—সর্বপ্রকারে বুদ্ধিবৃত্তির যুগপৎ সমৃদ্ধি এবং মৃত্তিকা খনন, ভূমি কর্ষণ হইতে সমাধিসাধন পর্যন্ত সর্বকর্মে দক্ষতা অর্জন। গ্রন্থকীট নর-নারীকে তিনি শুধু করুণার চোখে দেখিতেন। তাঁহার সঙ্গে বাস করা, তাঁহাকে কাজ করিতে দেখা, এমন কি, তাঁহার বিচ্ছিন্ন মন্তব্য ও কৌতুক শোনা দ্বারা সুশিক্ষা হইত। একদা ত্রিবান্দ্রামে আশ্রমপ্রাঙ্গণে তিনি একটি বড় গাছ উৎপাটিত করিতে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ গাছের শিকড়গুলি খুব দৃঢ়, গভীর ও বহুমুখী ছিলো। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে 'অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা' ইহার অর্থ—দৃঢ়মূল সংসার বৃক্ষকে সুদৃঢ় অনাসক্তিরূপ শাণিতশস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করিতে হইবে। বৃক্ষমূল উৎপাটনকালে তিনি পার্শ্ববর্তী শিষ্যবৃন্দকে বলিলেন—"প্রাচীন সংস্কারসমূহ সমুৎপাটন কি কঠিন ব্যাপার! তমোগুণ-রজোগুণকে তীব্র কর্মদ্বারা নিঃশেষিত করিতে হইবে।" প্রতি ক্ষুদ্র কর্মে তিনি গভীর মনোযোগ প্রয়োগ করিতে বলিতেন।

একদিন বাঙ্গালোরে তিনি কোনও শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পদ্মফুল কাটিয়া ঠাকুর ঘরে রাখো নাই কেন?" শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন ফুল স্বামিজী?" গুরু—"ফটকের কাছে রাস্তার ধারে তুমি কি পদ্মফুলের গাছ দেখ নাই?" শিষ্য—"আজ্ঞে হাঁ, সেখানে কতকগুলি গাছ আছে।" গুরু—আজ কি তুমি ঐ পথে যাও নাই? শিষ্য—"আজ্ঞে হাঁ, বহুবার।" গুরু—তথাপি তুমি কোনও গাছে একটিও ফুল দেখ নাই?" শিষ্য—"কোনও কারণে অন্যমনস্ক থাকায় লক্ষ্য করি নাই।" গুরু—"তোমার খোলাচোখের সম্মুখে যে সকল জিনিষগুলি থাকে সেগুলি তুমি দেখ না! আমি তথায় শুধু একবার গিয়া তা লক্ষ্য করিয়াছি। তুমি কি এত অন্যমনস্ক এবং অপর্যবেক্ষক থাক, যখন বেড়াও! যদি তুমি তোমার চক্ষুর সম্মুখস্থ বস্তুগুলি লক্ষ্য করিতে অক্ষম হও তুমি ধ্যান করিবে কিরূপে? তীক্ষ্ণতম বোধশক্তি এবং অত্যন্ত সজাগ মানস ব্যতীত ভাল ধ্যান হয় না। হয়তো তুমি ধ্যানার্থ বসিয়া তোমার মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে অলস অবস্থায় নিদ্রালু ভাবে ফেলিয়া রাখো এবং কিছুক্ষণ পরে তৃপ্তচিত্তে উঠিয়া ভাবো যে, তোমার গভীর ধ্যান হইল। এই ভাবে অভ্যাস করিলে গম্ভীর

ধ্যান করিতে কখনও সমর্থ হইবে না। উহা সম্যক স্বতন্ত্র কার্য। ধ্যানের জন্য বহির্মুখ ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করিয়া সর্বশক্তি অন্তর্মুখী করিতে হইবে। মন সর্বদা অত্যন্ত সক্রিয়, সচেতন থাকিবে, সূক্ষ্মতম বিষয় লক্ষ করিবে, ইহা অত্যন্ত একাগ্র হইবে; যদি তোমার স্নায়ুপুঞ্জ স্থূল হইয়া পড়ে তুমি সূক্ষ্ম বস্তু অনুভব করিবে কিরূপে? গভীর পর্যবেক্ষণ ও অনুভবের বৃত্তিসমূহ স্ফুরণ করো নচেৎ তুমি ধ্যায় বস্তুর মানস প্রতিমা গঠনে সমর্থ হইবে না। হয়তো তদ্রূপ চিত্রের প্রয়োজন নাই, নয়তো তোমার মনে তদ্রূপ চিত্রাঙ্কনের সামর্থ্য নাই। তাহা না হইলে কিরূপে তুমি সেই ফুলটি লক্ষ্য করো নাই? শীঘ্র দেখ—ঐ ফুলটি আছে কিনা; এইরূপ তুচ্ছ বিষয় পরমহংসের লক্ষণীয় নয়, হয়তো তোমরা এইরূপ ভাবিবে"। শিষ্য অবিলম্বে যাইয়া পদ্মফুল আনিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যবৃন্দ প্রত্যেকেই পরমহংসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্য একদিন ছাদে কতকগুলি কাপড় শুকাইতে দেওয়া হয়, হঠাৎ টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল শিষ্য অন্য কোনও কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাই তিনি কাপড়ের কথা একেবারে ভুলিয়া যান। স্বামিজী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কি করিতেছ, তুমি কি দেখিতেছ না যে, বৃষ্টি পড়িতেছে ও কাপড়গুলি ভিজিয়া যাইবে?" "হ্যাঁ স্বামিজী, আমি এক্ষণেই কাপড়গুলি নামাইয়া আনিতেছি, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" এই বলিয়া শিষ্য কাপড়গুলি তুলিয়া আনিলেন। তখন স্বামিজী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"যদি তুমি এত অন্যমনস্ক ও অযত্নশীল হও তাহা হইলে কিরূপে ঠাকুরের কাজ করিবে?" শিষ্য—"স্বামিজী, আমি সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" গুরু—"আমি বলিতেছি না যে, তুমি সত্য বলো নাই, আমি বলিতেছি যে, তুমি অতিশয় অন্যমনস্ক এবং ষোলো আনা মন দিয়া ঠাকুরের কাজ করো না, তোমাদের প্রত্যেকের চেয়ে মহত্তর পরমহংসকে দেখা ও সেবা করার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বর চিন্তায় এত মগ্ন থাকিতেন যে, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র বাতাসে উড়িয়া গেলেও তিনি টের পাইতেন না। তথাপি প্রত্যেক কার্য নিখুঁত ভাবে সর্বান্তঃকরণে সম্পন্ন করিবার জন্য তৎপর থাকিতেন। কাজকর্ম যতোই ছোটো হউক না উহাতে অমনোযোগ বা যত্নাভাব দেখাইলে তিনি তিরস্কার করিতেন। আর তোমরা অযত্নে অর্দ্ধমনে সব কাজ করে যাচ্ছো। সন্ন্যাসাদর্শ সম্বন্ধে ইহাই তোমার ধারণা! যখন কোনো কাজ করিবে তখন সর্বযত্ন ও ষোলোআনা মনোযোগ সহকারে উহা

সম্পন্ন করিবে। অনাসক্তির অর্থ, কর্মে ঔদাসীন্য, অন্যমনস্কতা বা অবহেলা নহে। একাগ্রচিত্তে সর্বচিন্তা বর্জনপূর্বক কর্ম করো, ইহাতেই চিত্তশুদ্ধি হইবে।"

আশ্রমের বাগানে ব্যবহার্য কোনো যন্ত্র কোনও বন্ধুকে ধার দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি উহা যথাসময়ে ফেরৎ দেন নাই। কিছুদিন পরে স্বামিজী উক্ত যন্ত্র চাহিয়া বসিলেন—বাগানে কাজ করিবার জন্য। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলা হইল যে, অমুক ভক্ত উহা কিছুদিন পূর্বে লইয়া গিয়াছেন। স্বামিজী বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি উহা যথাসময়ে ফেরৎ আনো নাই কেন? সন্ন্যাসীর আদর্শ সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা তাহা হইলে এইরূপ? উক্ত দ্রব্য আমি নিজের জন্য বা নিজস্ব সম্পত্তিরূপে চাহি না। আমি তোমার দোষ-ত্রুটিগুলি সযত্নে দেখাইয়া দিতেছি যাহাতে তুমি মানুষ হইতে পারো। আর তুমি জান, আমার বহু বন্ধু আছেন যাঁহাদের কাছে আমি বিনা ঝঞ্ঝাটে বিনা দুশ্চিন্তায় পরম সুখে ও স্বাচ্ছন্দে থাকিতে পারি, তথাপি দেখ আমি তোমাদের মধ্যে সাদাসিধা ভাবে থাকি এবং কুলীর মত কাজ করি। আমি কি তোমাদের কাছে চাই বা তোমাদের সেবার অপেক্ষা করি? এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি কমণ্ডলু হাতে করিয়া হিমালয়ে চলিয়া যাইতে পারি, যেমন যৌবনে করিতাম। আমি কোনও সেবকের উপর নির্ভর করি না, আমি আরামপ্রদ স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনও ভালবাসি না। ইহাই আমার শক্তি এবং এই জন্যই আমি নিরপেক্ষ ও নির্ভীক। তোমাদিগকে আদর্শ মানুষ করিবার জন্যই আমি এত দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতেছি, আর তোমাদের দোষগুলি দেখাইয়া দিলে তোমরা রুষ্ট হও—আহত হও। পাশ্চাত্য দেশসমূহে দেখিয়াছি যে, কেহ সযত্নে সস্নেহে দোষ দেখাইলে সে কৃতজ্ঞ হয় ও ধন্যবাদ দেয়, কিন্তু এই দেশের ব্যাপার অন্যরূপ। কাহাকেও তিরস্কার করিলে সে তৎক্ষণাৎ সাপের মত ফণা তোলে। যাহারা নম্রতা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে উপদেশ গ্রহণ করে তাহারাই উপকৃত হয়। আর যাহারা দুর্বুদ্ধিবশে বিরক্ত হয় তাহারা আদৌ লাভবান হয় না।"

সর্বোপরি স্বামিজী তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিতেন। যখন তিনি আশ্রমের ভবিষ্যৎ কর্মধারা সম্বন্ধে বলিতেছিলেন, তখন কোনও শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্বামিজী আপনার ন্যায় বিরাট ব্যক্তিত্ব কাহার আছে? এরূপ ব্যক্তিত্ব আমাদের

পশ্চাতে না থাকিলে আমরা কিরূপে কাজ করিতে পারি?" জিজ্ঞাসা সমাপ্ত হইতে না হইতেই স্বামিজীর চক্ষুদ্বয় জ্বলজ্বল্ করিয়া উঠিল এবং বজ্রনাদে উত্তর আসিল—"ব্যক্তিত্ব! বস্তুতঃ তোমরা ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করো, শ্রীগুরু মহারাজের পাদপদ্মে কি তোমাদের বিশ্বাস আছে? যদি তাহাতে বিশ্বাস থাকে তবে তোমরা তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া হাতের কাছে যে কাজ আসে তাহা একমনে করিয়া যাও। ব্যক্তিত্ব, প্রভৃতি সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু স্বতঃই তোমাতে আসিবে, তাঁহার চরণে তোমাদের গভীর বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি নাই। তপস্যা বা বিশ্বাস ব্যতীত ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না। তোমরা কি বিভিন্ন ধর্মসংঘকে একই উদ্দেশ্যে অদ্ভুত কর্ম করিতে দেখ নাই? তাহাদের পশ্চাতে অবস্থিত ভগবান যীশুখৃষ্ট বা ভাগবত মহাশক্তি। কাজ তাঁহারই। তাঁহাতে বিশ্বাস অটল থাকায় তাহারা অদ্ভুত সাফল্য সহকারে কার্য করিতেছেন। তোমাদের পশ্চাতে যে মহাশক্তি বিরাজমান যদি তাহাতে বিশ্বাস রাখো এবং তৎপদে আত্মসমর্পণ করো তাহা হইলে, সাহসভরে কাজ করিয়া যাও, সাফল্য প্রভৃতি সব ছায়ার মত তোমাদের পশ্চাৎগামী হইবে।"

এই বিমুক্ত সন্ন্যাসীর গভীর বিশ্বাস ও অসীম ভক্তি কে পরিমাপ করিতে পারে? আত্মগোপনে চিরাভ্যস্ত থাকায় কদাচিৎ তিনি ঠাকুরের কথা বলিতেন। আর যখন বলিতেন, তখন অত্যন্ত সংযতভাবে বলিতেন ও মন্তব্য করিতেন, তাঁহার অপার মহত্ব আদৌ বুঝিতে পারি নাই। তিনি নিজেকে শ্রীরামকৃষ্ণের কুকুররূপে বর্ণনা করিতেন। এই সকল বৎসরে কেবল একবার বা দুইবার দেখা গিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের নামোল্লেখ মাত্রই তিনি ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। এই সম্বন্ধে একটি মর্মস্পর্শী গোপনীয় ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল। স্বামিজী অনুভব করিলেন যে, প্রাতঃকালীন ভোগ উপলক্ষানুসারে সন্তোষজনক হয় নাই। পূজা ও ভোগের ভারপ্রাপ্ত শিষ্য স্বামী বিশদানন্দকে তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুরকে সকালে কি কি ভোগ দেওয়া হইয়াছে?" স্বামী বিশদানন্দই ওট্টাপালমস্থ রামকৃষ্ণ আশ্রম ও নির্মলানন্দ স্মৃতি মন্দিরের বর্তমান অধ্যক্ষ। তিনি স্বামিজীকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, "ফল মিষ্টি এবং অন্যান্য দ্রব্য ঠাকুরকে ঊষাকালে নিবেদন করা হইয়াছে।" স্বামিজী দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন—"ভক্তের এই পর্বদিনে ঠাকুরের পূজার জন্য প্রচুর দান

করিয়াছেন কিন্তু তোমরা এই উপলক্ষে যথোচিত আয়োজন না করিয়া ঠাকুরকে সামান্য নৈবেদ্য দিয়াছ।" শিষ্য কৈফিয়ৎ দিলেন, "প্রাতঃকালীন পূজায় শত শত ভক্ত উপস্থিত হইবেন তাঁহাদের সকলকে প্রসাদ দিতে হইবে। সন্ধ্যাবেলাও অনুরূপ ভক্ত সমাগম আশা করা যায়। উভয় কালের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া স্বামিজী উত্তর দিলেন—"ভক্তবৃন্দ এবং প্রসাদ বিতরণ সম্বন্ধে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। ঠাকুরের নৈবেদ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। ঠাকুরকে আজ আরো কিছু ভালো নৈবেদ্য দেওয়া যাইত না কি? বাজারে নানারকম ফল দেখ নাই?" শিষ্য—হ্যাঁ দেখিয়াছি।" গুরু—"এই বিশেষ দিনে আরও কয়েক আনার ফল ভালো দেখিয়া কিনিয়া ঠাকুরকে দিলেনা কেন? এই অভাব-বোধ না করাতে বোঝা যায়—ঠাকুরের চরণে তোমার ভক্তি কম।" শিষ্য—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ভক্তি সত্যই অল্প।"

ইতিমধ্যে স্বামিজীর মুখমণ্ডল ভাবাধিক্যে আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অনর্গল প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি উহা গোপন করিতে পারিলেন না। ব্যথিতভাবে তিনি বলিলেন—"আজ ভাল করিয়া ঠাকুরকে খাইতে দেওয়া হইল না, তাই আমিও খাইবো না।" তাঁহার ভাবাবেগ বাড়িতে লাগিল। শিষ্য তাঁহার এইভাব পূর্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি বজ্রাহত কর্ত্তব্যবিমূঢ় ও বেদনার্দিত হইলেন। "আমি এখনই ঠাকুরের ভোগের ভালো আয়োজন করিতেছি" এই বলিয়া অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিলেন। মধ্যাহ্ন পূজাকালে স্বামিজীর ইচ্ছানুসারে নৈবেদ্য দেওয়া হইলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

সাক্ষাৎ শিষ্যবৃন্দের কাছে ঠাকুর নিত্য বিরাজ করিতেন। তাঁহারা ঠাকুর ঘরে ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেখিতেন, তাই তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ আচরণ শোভনীয়। পূজা পদ্ধতির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী নির্মলানন্দ বলিয়াছিলেন, "দুই প্রকার পূজা আছে—প্রথম প্রকার পূজা প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে প্রচলিত ও নিয়মিত এবং দ্বিতীয় প্রকার পূজাকে ভক্তের ইষ্টপুজা বলা যায়। এই দুই পূজাকে যথাক্রমে বৈধী পূজা ও ভাবের পূজা বলা চলে। সুপ্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে বিহিত পূজা আমাদের মঠ ও আশ্রমে চলে। জড় যন্ত্রবৎ তাহা অনুসরণ করা অনুচিত। ঠাকুর যদি বাঁচিয়া থাকিতেন এবং তোমরা তাঁহার সেবা করিতে তখন তোমরা কি করিতে? এখনো তদ্রূপ করো। তাঁহার

সাক্ষাৎ উপস্থিতি অনুভব করো এবং তাঁহাকে জীবিত ব্যক্তিরূপে সেবা করো। সে রূপ বিশ্বাস করো এবং সে রূপ সেবার দ্বারা তিনি প্রীত হইবেন ও এখানে বিরাজ করিবেন। বিশ্বাস, পবিত্রতা ও ভক্তি সহকারে তাহার পূজা করো। ভক্তিভরে ঠাকুর-পূজা করিলে তপস্যার ফল পাওয়া যায়। আমরা তীর্থযাত্রা ও কঠোর তপস্যা করিয়া যে ফল পাইয়াছি—ভক্তিভাবে নিরন্তর সেবাপূজার দ্বারা শশী মহারাজ তদ্রূপ বা তদধিক ফল পাইয়াছেন।" এই কথা স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহার শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন। তীর্থযাত্রা বা পরিব্রাজক জীবন যাপনে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বা নির্ভরতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার কিন্তু সঙ্গে টাকা রাখিলে সে নির্ভরতা আসে না। একদা স্বামী বিশদানন্দ সুদূর তীর্থ হৃষিকেশে যাইয়া কিছুকাল তপস্যা করেন; কয়েকটি ভক্ত তাঁহার পাথেয় প্রদান করিয়াছিলেন। যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন স্বামিজী বলিলেন—"পকেটে প্রচুর টাকা থাকিলে মহীশূরের মহারাজ ও হিমালয়ে বাস করিতে পারেন। কিন্তু তাহাকে তপস্যা বলা চলে না। ভক্তদের উপর নির্ভর করিলে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ আসে না। যৌবনে আমি হাজার হাজার মাইল রিক্ত হস্তে পায়ে হাঁটিয়া এবং কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা না করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি। যদি আমরা তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করি তিনি নিশ্চয় আমাদের যত্ন লইবেন। আর যদি আমরা নিজেদের উপর নির্ভর করি অথবা বন্ধুদের উপর আস্থা রাখি ভগবানে আত্মসমর্পণ আসিবে না। মূঢ় চিত্তে আমরা ভাবি—আমরা নিজদিগকে সাহায্য করিতে পারি এবং সেইজন্য স্বীয় সামর্থ্যে আস্থা রাখি। আমাদের সকল শক্তি-সামর্থ্য প্রভুই দেন—এই বিশ্বাস রাখো, আত্মসমর্পণ করো এবং তপস্যা করো।

"তদ্রূপ আত্মসমর্পণ মানুষকে মহাবীর নির্ভীক ও মহাকর্মী করিয়া তোলে। খাদ ফেলিয়া সোনা গ্রহণ তুল্য এই কার্য্য কঠিন। ক্ষুদ্র 'আমি' ত্যাগ না করিলে, বিরাট 'আমি' কিরূপে উদিত হইবে? ইহাই যোগ। 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'—এই গীতোক্ত বাণী মনে রাখো। কর্মে সুদক্ষ হও—সে কর্ম যতোই তুচ্ছ হউক না কেন।" স্বামিজী এই কথা বলিতে কখনও ক্লান্ত হইতেন না। তিনি বলিতেন—"কর্ম করো" "কর্ম করো" এবং সর্বপ্রকার শুভ কর্ম উত্তম, সরল ও দ্রুত ভাবে সম্পন্ন করো। এই বিষয়ে তিনি নিজেই ছিলেন উহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কঠোর অসুস্থতা ব্যতীত অন্য সকল দিনেই তিনি গভীর

রাত্রে দুইটায় উঠিয়া ভোর পাঁচটা পর্যন্ত জপধ্যান করিতেন। তখন হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত সর্বপ্রকার শ্রমসাধ্য কর্মে তিনি ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি বাগানের কাজ করিতেন—মাটী খোঁড়া, গাছ পোঁতা, কোন কোন গাছকে স্থানান্তরে পোঁতা, ঘাস কাটা, আগাছা উপড়ানো প্রভৃতি। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যে দেখা যাইত তাঁহার অদ্ভুত নিপুণতা। তিনি শিখাইতেন—সঙ্গীত, কাঠের কাজ, দেওয়াল গাঁথার কাজ, উনান তৈরী, রান্না করা ইত্যাদি। আশ্রমের অধিকাংশ পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন কার্য তিনি ব্যবসায়ী শ্রমিকদের সাহায্য ব্যতীত শিষ্যদের সহায়তায় করিতেন। স্বাবলম্বনের পরাকাষ্ঠা সন্ন্যাসে প্রকটিত হয়। একদা ওট্টাপালমে তিনি সম্মুখস্থ শিব মন্দির ও তৎসংলগ্ন নাট মন্দির এবং আশ্রমের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ রান্নাঘর মেরামত করিতে নিযুক্ত হন। স্বামী মুরহরানন্দ কাঠের কাজ করিতেছিলেন। স্বামী রামানন্দ রান্নাঘরের দেওয়াল গাঁথিতেছিলেন এবং স্বামিজী স্বয়ং সুচালক ও সহায়করূপে কর্মতৎপর ছিলেন। তখন ভক্ত চেঙ্গাপা স্বামিজীর অতিথিরূপে আশ্রমবাস করিতেছিলেন। তিনি স্বামিজীর সমীপে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবিলেন, কেন স্বামিজী সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ দ্বারা এই সকল হীন কাজ করাইতেছেন? উক্ত ভক্ত বলেন—"এই চিন্তা আমার মন হইতে যাইতে না যাইতেই তিনি উঠিয়া কিছু না বলিয়া আমার কাছে আসিলেন এবং মন্তব্য করিলেন, "মঠে প্রত্যেক শিল্প পূর্ণতা লাভ করিবে। রোমে মদ্য প্রস্তুত প্রণালী পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; শ্রেষ্ঠ মদ্য রক্ষীর মঠে প্রস্তুত হইত। সেই মদ্য এখনও বিক্রয় হয়। তবে উহার দাম খুব বেশী। মঠে প্রত্যেক ফলিত বিজ্ঞানের পূর্ণ চর্চা হওয়া দরকার। সেইজন্য আমি এই সকল তরুণ সাধুকে ছুতারের কাজ, মিস্ত্রীর কাজ, ছবি আঁকা ও অন্যান্য কাজ শিখাইতেছি।" আমার অ-জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের চমকপ্রদ চিত্তাকর্ষক জবাব পাইয়া আমি একেবারে অবাক হইলাম। কুর্গের কয়েকটি ভক্তকে আমি জানি যাহাদের জীবনে এরূও অদ্ভুত ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। স্বামিজীর এক চারিত্রিক বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি সর্ব কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। কাজ যতই তুচ্ছ বা ক্ষুদ্র হউক না কেন তাহা সম্পাদনকালে সৌন্দর্য, লালিত্য রমনীয়তা ও স্থায়িত্য তিনি দাবী করিতেন। সর্ব কার্য শিল্পসম্মত উপায়ে সম্পন্ন করিবার প্রতিভা লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একখানি

ছোট বাঁশ বা একটি গাছের ডাল কাটিয়া তিনি একটি সুন্দর বেড়ানো লাঠি তৈয়ারী করিতেন এবং উহার মাথাটি কোন পশুর মাথার মত কুঁদিয়া দিতেন। একটি সাধারণ মৃৎপাত্রকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়া চীনা ফুলদানির মত গড়িতেন। গ্রানাইট শিবলিঙ্গ তৎ কর্তৃক সুদর্শন ধ্যানমগ্ন জটাধারী পঞ্চমুখ নীলকণ্ঠ মহাদেব মূর্ত্তিতে পরিণত হয়। তাঁহার আশ্রমে বিভিন্ন টুল ও যন্ত্র রক্ষিত হইত। নানাপ্রকার হুঁকা, নল ও ধূমপানের উপাদান তিনি রাখিতেন। কিন্তু তাঁহার হাতের ছাপ লাগিয়া এই সকল সাধারণ দ্রব্য সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে থাকিত।

নারীজীবনেও কার্যের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করিতেন এবং সংঘমাতা সারদাদেবীকে সর্ব শ্রেণীর নারীর আদর্শরূপে গণ্য করিতেন। তিনি বলিতেন —"শ্রীমা ঠাকুরের বালক-শিষ্যদিগের জামা কাপড় তাহাদিগকে না জানাইয়া সাফ্ ও শুষ্ক করিয়া যথাস্থানে রাখিতেন। নারী জাতির উন্নয়ন ও আরাধনায় তিনি মাতৃভূমির মুক্তিলাভের সম্ভাবনা দেখিতেন। ইহাতেও তিনি কুমারী পূজা করিয়া নিজেই আদর্শ দেখাইলেন। অন্তিম জীবনে সেই নারী পূজা করিতে তিনি আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাহাদিগকে শিক্ষাদান, ধর্মদান ও অন্নদান তাঁহার মুখ্যব্রত হইল। ব্যায়াম, নৃত্য ও নানাপ্রকার অভিনয় প্রভৃতি দ্বারা তিনি তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য গঠনে মনোযোগী হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে স্নানাহার করাইতেন, চিরুনী দিয়া তাঁহাদের মাথা আঁচড়াইয়া দিতেন, তাঁহাদের কপালে চন্দন তৈলের প্রলেপ লাগাইতেন এবং ভালভাবে আম কাটা প্রভৃতি ছোট ছোট কাজও শিখাইতেন ; গ্রাম্য গীতিকা, স্তব-স্তোত্রও মুখস্থ করাইতেন। এই সকল কুমারীর বয়স সাত আট বৎসরের অধিক ছিল না। তাহাদিগকে তিনি মন্ত্র দীক্ষা দিয়া ধ্যান শিক্ষা দিতেন এবং সকালে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত সাধনা অভ্যাস করাইতেন। সান্ধ্য আরতির পরে প্রত্যহ ভজন গাহিতে গাহিতে তিনি তাহাদের সহিত মন্দির পরিক্রমা করিতেন। তাঁহাদিগকে তিনি স্ব স্ব ইষ্টদেব পূজা করিতে উৎসাহ দিতেন এবং তাহাদের সহিত এই কার্যে যোগ দিতেন। একদা তিনি বলিয়াছিলেন—তোমরা দেখবে, কালে আমার ভাব ইহাদের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। দরিদ্রদের প্রতি তাঁহার সমবেদনা এবং নিম্ন শ্রেণীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা অতুলনীয় ছিল। দরিদ্র নারায়ণ ভোজন তাঁহার নিকট লৌকিকতা মাত্র ছিল না; ইহা আন্তরিক

আগ্রহের পরাকাষ্ঠা ছিল। তাহাদের ভোজন শেষ না হইলে তিনি কিছু খাইতেন না। তৎপরে তিনি যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভুক্ হইতেন। তাঁহার কথায় এইরূপ বলিতে হয়। একদা কোনও জন্মোৎসবে হঠাৎ আশাতীত জনতা উপস্থিত হইল। সমস্ত প্রস্তুত আহার্য্য নিঃশেষিত হইল। অসংখ্য ক্ষুধিত নারায়ণগণ অভুক্ত রহিল। ভাণ্ডারে চাউলও সমাপ্ত হইয়াছিল। কর্ম্মীবৃন্দ মত প্রকাশ করিলেন যে, কিছুই অবশিষ্ট নাই এবং তাহারা গৃহে ফিরিবার জন্য উন্মুখ। স্বামী নির্মলানন্দ নীরবে ইহা শুনিলেন; অনন্তর তিনি অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিলেন; গর্জনকারী ক্রোধ ও ক্রন্দনকারী করুণা বাক্যে ও কর্মে তাঁহর শরীর হইতে নিঃসৃত হইল। তখন তাঁহাকে ভয়ঙ্কর ও মহিমাব্যঞ্জক দেখাইল। কেহই তাহার কাছে যাইতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁহার বন্ধুবৃন্দও নয়। সেদিনের মত ভীতিপ্রদ রুদ্রমূর্তি অন্য সময় তিনি কখনও প্রকটিত করেন নাই। ক্ষিপ্রবেগে তিনি একতাড়া সরকারী প্রমিশারী নোট বাহির করিয়া তাঁহাদের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন এবং কঠোর আদেশ দিলেন—"যাও, চাল কিনিয়া আনো ও তাহাদিগকে খাওয়াও।" নানা গৃহ হইতে তৎক্ষণেই চাউল প্রভৃতি দ্রব্য কিনিয়া আনিয়া রাঁধিয়া সকলকে খায়ানো হইল। সমবেত ভক্তবৃন্দ ও কর্মিগণের নিকট তাহা অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ হইল।

এক শুভ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মদিবসের পূর্বাহ্নে অসংখ্য ভক্ত শিষ্য আশ্রমে সমাগত। স্বামিজী বিস্তৃতভাবে ভারতের পুনর্জাগরণের সম্বন্ধে এক মনোহর বক্তৃতা দিলেন। কারখানা ও শিল্পবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপনের কথাও আলোচনা করিলেন। অনন্তর তিনি সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মধ্যাহ্ন ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। প্রতিবেশী শিশুবৃন্দও প্রসাদ খাইতে আসিয়াছে। সকলে উদর ভরিয়া অন্নপ্রসাদ খাইলেন। "শ্রীগুরু মহারাজজী কী জয়" ধ্বনিতে আশ্রমের আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হইল। স্বামিজী রন্ধনশালায় যাইয়া দেখিলেন, অবশেষে কর্মীবৃন্দ প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে। এক দরিদ্রা বালিকা অভুক্ত অবস্থায় বাহিরে দণ্ডায়মানা। তিনি সেই অভুক্তা বালিকাকে ভিতরে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহাকে অবহেলা করার জন্য সাধুবৃন্দকে তিরস্কার করিলেন। তিনি উত্তেজিতভাবে বলিলেন; সে অনাথা বালিকা, কেন তোমরা বাহিরে যাইয়া দেখ নাই—কে কে অভুক্ত আছে? কতকগুলি

উপবিষ্ট বালককে দেখাইয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে আর এই দরিদ্রা বালিকাকে ডাকিলেনা না কেন? তোমরা কি হৃদয়হীন! আমি যতোই তোমাদের দোষগুলি দেখাইয়া সংশোধন করিতে বলি না কেন, তোমরা সেগুলি শিখিয়া আত্মোন্নতি করিবেনা। তোমাদের অন্তর নরম হয় না।" উক্ত ঘটনা তিনি সেইদিন বহুবার উল্লেখ করিলেন। একটি অবহেলিতা অনাথা বালিকা দর্শনে তাঁহার হৃদয় এতই বিচলিত হইয়াছিল! নারীমূর্তিতে জগদম্বার প্রকাশ দেখিয়া তিনি এইরূপ করিতেন। উক্ত রূপে ও অন্যান্য বহুরূপে উদাহরণ, উপদেশ ও তিরস্কারের দ্বারা তিনি তাঁহার গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দের, পুরুষ, মহিলা ও শিশু সকলের চরিত্র গঠনে প্রয়াস পাইতেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বামিজী ওট্টাপালমে এক এক বারে কয়েক দিনের অধিক থাকেন নাই। ইংরাজী জানা দর্শকগণ ও ভক্তবৃন্দ এই সকল উপলক্ষের সদ্‌ব্যবহার করিতেন। এইবার বহুক্ষণ অল্পদূরে অনুরাগী শ্রোতাদের এক বড় দল অপেক্ষা করিতেছিল। ভাষাগত অসুবিধার জন্য তাহারা স্বামিজীর সমীপে সাক্ষাৎভাবে আসিতে পারিতেছিল না। এই সময় জীবন নাটকের শেষ দৃশ্যে তিনি ধর্ম শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রণালী ও হৃদয়ের ভাষাকে প্রচলিত ব্যবহারে আনিলেন। পাঁচ-ছয় বৎসরের শিশুগণ এবং নিরক্ষর নরনারীও তাঁহার কথা বুঝিতে ও ভাব লইতে সমর্থ হইলেন। অনায়াসে তাহারা সকলে তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসরণ করিতে পারিল। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বভাবের উপযোগী শিক্ষা পাইল। প্রত্যেকের স্ব স্ব ভুলভ্রান্তি ও দোষত্রুটি প্রদর্শিত হইল এবং প্রত্যেকেই স্বামিজীর মনোযোগ ও আশীর্বাদের পূর্ণ ভাগ পাইল। সম্ভবতঃ অন্তিম জীবনে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কর্ম।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মহানগরী কলিকাতায় কঠিন ব্যধিতে ভুগিবার পর আর তিনি বোম্বাইয়ে যান নাই। অনেক অনুরাগী ভক্ত তাঁহার পুণ্যদর্শনলাভার্থ ব্যাকুল হইলেন। তিনি তথায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে গমন করিলেন, এবং কেরলে কয়েক দিবস থাকিয়া সালেম শহরে যাত্রা ভঙ্গ করিয়া ওট্টাপালমে ফিরিলেন। তখন তাঁহার বয়স চুয়াত্তর বৎসর হইয়াছিল। যদিও কঠোর কর্ম, কঠিন ব্যাধি ও সুদীর্ঘ ভ্রমণে তাঁহার দেহ জীর্ণ ও স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল তথাপি ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সংবাদদাতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লিখিয়াছিলেন—'প্রশান্ত গম্ভীরমূর্তি সুদীর্ঘ সুদর্শন সবল পুরুষ, অতিশয় বিচক্ষণ

বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ প্রায়শ মহাচেতা দার্শনিক এ্যারিষ্টটলের শারীরিক ও মানসিক গুণাবলীতে অলঙ্কৃত সন্ন্যাসী। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পুনরায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম শতবার্ষিকী মহোৎসব উপলক্ষে সালেমে গমন করেন। সালেমের নাগরিকগণ তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র দানপূর্বক সম্বর্দ্ধনা করেন। ইহা ব্যারিষ্টার রাও বাহাদুর সি, এস, ভাস্কর কর্তৃক স্থানীয় আশ্রমে আহূত শতবার্ষিকী মহাসভায় পঠিত হয়। স্বামিজী ইহার উত্তরে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক শতবার্ষিকী ভাষণ দেন। উক্ত সভায় সালেমের বহু শিক্ষিত অধিবাসী উপস্থিত ছিলেন। উল্লিখিত অভিনন্দন পত্র ও স্বামিজীর ভাষণ ১৬ই মার্চ 'মাদ্রাজ মেল' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইংরাজী অভিনন্দন পত্রের আক্ষরিক অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

ওঁ

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজ সমীপে—

শ্রদ্ধেয় স্বামিজী!

আমরা সালেমের অধিবাসীবৃন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ শতবার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে এখানে আমাদের মধ্যে আপনাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে ইচ্ছা করি। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদমূলে প্রত্যক্ষভাবে বসিবার সৌভাগ্য আপনি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং আপনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সুযোগ্য বার্তাবহ; জগতের পথভ্রান্ত লক্ষলক্ষ নরনারীর নিকট আপনার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী বিবেকানন্দের মতই ধর্মপ্রচারার্থ আপনার অদম্য উৎসাহ প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে আপনার সেবাকার্য্য চিরস্থায়ী ও স্মরণীয়। তামিলনাদ-কেরল প্রদেশদ্বয়ে আপনার প্রেরণায় ও নির্দেশে আঠারোটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতেছে। দেশের এই অঞ্চলে ধর্মজাগরণার্থ আপনার আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। শালেম শহর শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনের এক কর্ম্মকেন্দ্র হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে আপনার আগমন এবং এই সকল উপলক্ষে আপনার প্রেরণাপ্রদ ধর্মসঙ্গ রামকৃষ্ণ আন্দোলনকে সতেজ করিয়াছে।

কেরলে অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নার্থ বিংশ বর্ষাধিক আপনার পরিশ্রমের ফলে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মহারাজাও সর্বশ্রেণীর হিন্দুদের জন্য সরকারী মন্দিরসমূহের দ্বার উন্মুক্ত রাখিবার জন্য ঐতিহাসিক ঘোষণা করিয়াছেন। এই শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাদের মধ্যে আপনাকে পাইয়া আমরা আর একবার আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

ইতি—

আপনার স্নেহধন্য ভক্তবৃন্দ

সালেমের নাগরিক বৃন্দ।

সালেম

১৫।৩।১৯৩৭ সাল

স্বামিজীর ভাষণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নবধর্ম্ম-সম্প্রদায় গড়িতে আসেন নাই; তিনি বিদ্যমান সম্প্রদায় সমূহকে সঞ্জীবিত সুসংহত করিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কখনও অবতার বলি নাই। তিনি একজন প্রেমিক মানুষ। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে পঞ্চবটীতলে তিনি যে দিব্য-অগ্নি প্রজ্বলিত করেন তাহার প্রভাব সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করিয়াছে। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব বিশিষ্ট জীবনাদর্শ আছে, যাহা সেইজাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপে দেখা যায়। আর ভারতের প্রকৃত ভিত্তি ধর্ম্মবাদ ভারতে অন্যান্য আদর্শ উক্ত বাদের উপর উপস্থাপিত অতিরিক্ত অলঙ্কার ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ভারতে জাতীয় বৃক্ষের মূলই ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি নহেন, তিনি অসংখ্য ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক নব সংঘ স্থাপনে প্রয়াসী হন নাই। শ্রীমদ্ ভাগবদ্ গীতায় একটি শ্লোক এখন আমার মনে পড়িতেছে। ইহার ভাবার্থ এই—'যাহারা আমাকে ভক্তিভরে আরাধনা করে আমি তাহাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত হই এবং তাহারা আমাতে অবস্থান করে।' এই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীও উক্তরূপ এবং আমাদের পুণ্যভুমির অন্যান্য মহাপুরুষও একই বাণী দিয়াছেন। সেই সকল বাণী সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থ উচ্চারিত, কোনও এক দেশ বা সংঘের জন্য নহে। তাঁহার বাণী শুধু ভারতীয় নহে, উহা সর্ব দেশীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের সারমর্ম সর্বধর্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করা। এতদ্ব্যতীত বিশ্ব-

ধর্মের সারমর্ম উপলব্ধ হয় না। সর্বধর্ম ও আধ্যাত্মিকভাবের তিনি ছিলেন জীবন্ত বিগ্রহ। যিনি মূল তত্ত্ব অবলম্বনে সিদ্ধ হন তিনি কিরূপে নূতন সম্প্রদায় গড়িবেন ? সর্ব ধর্মের অনুষ্ঠান ও সম্প্রদায় ও সংঘের পশ্চাতে যে মূল তত্ত্ব বিদ্যমান তাহা অবগত না হইলে চরম অনুভূতি প্রত্যক্ষ হয় না। সর্ব ধর্মের মূলে যে সার তত্ত্ব বিদ্যমান তাহার উপলব্ধিই অধ্যাত্মজীবনের চরম লক্ষ্য। আমরা তাহাকে পাইয়া গর্ব অনুভব করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে একচেটিয়া সম্পত্তি রূপে নিজস্ব করিতে পারি না। যুগে যুগে দেশে দেশে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী কিন্তু সতর্ক হইতে হইবে যে, আকৃতি পরিবর্তিত হইলেও যেন প্রকৃতি অপরিবর্তিত থাকে। যদি আমরা কাল-স্রোতের অনুগামী না হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকি তবে আমরা সঙ্কীর্ণ হইব। তিনি বলিতেন—আকবরের আমলের মুদ্রা বৃটিশ আমলে চলে না। বৈদিক যুগে অবতারের আবির্ভাব হয় নাই বলিয়া তখন আমরা কেবল অগ্নির উপাসক ছিলাম। এখন আমরা বাহু দেবতার পূজা করি। উহা অবশ্যই উত্তম কিন্তু পুরাণ দ্রব্যগুলি ফেলিয়া দিলে চলিবে না। তাহাদের বিনিময়ে নূতন দ্রব্য আনিতে হইবে। পরিবর্তনের উদ্দেশ্য বিনিময়। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সর্বধর্মের ও সর্ব শ্রেণীর নাস্তিক ও আস্তিক ব্যক্তিকে প্রেরণা দেয়। যতদিন সৃষ্টি থাকিবে ততদিন বৈচিত্র বিরাজ করিবে। তিনি সম্প্রদায় বৈচিত্র সংরক্ষণ ও সঞ্জীবনের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। নূতন কিছু করার উদ্দেশ্যে তিনি অবতীর্ণ হন নাই। পুরাতন অনুষ্ঠানের আবর্জনা বর্জনপূর্বক সেগুলিকে যুগোপযোগী ভাবোদ্দীপক অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে তিনি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সাধনাই সঞ্জীবনের অমোঘ উপায়।"

স্বামী নির্মলানন্দ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে দুইবার কালিকটে গমন করেন। তাঁহার শুভাশীষলাভে ধন্য হইয়া তত্রস্থ বেদান্ত সমিতি ক্রমোন্নতি করিতেছিল এবং উহার হিতকর প্রভাব উক্ত শহরে অনুভূতি হইতেছিল। কুইল্যাণ্ডী আশ্রমের অধ্যক্ষ তৎশিষ্য স্বামী শেখরানন্দ প্রস্তাব করিলেন যে, বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে কালিকটে এক সেবাশ্রম স্থাপিত হউক। শ্রদ্ধেয় স্বামিজীর অনুমতি পাওয়া গেল এবং অচিরে সেবাশ্রম খোলা হইল। ইহাতে শিশু চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হইল। ইহাই তখন কালিকট সহরের দারুণ অভাব ছিল। দানশীল ব্যবসায়ী শেঠ নাগজী পুরুষোত্তম সেবাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন।

উহার বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ সমূহ হইতে জানা যায় —সর্ব বর্ণের ও সর্ব ধর্মের শিশুগণ হাজারে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসিত হইতেছে। স্বামী শেখরানন্দ সেবাশ্রমে ঠাকুরের পূজা আরতি আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্র পাঠ এবং নিয়মিত শাস্ত্র ব্যাখ্যাও আরম্ভ হইল। অনেক ধর্ম পিপাসুর নিকট ইহা অতীব রুচিকর প্রতিপন্ন হইল। স্বামী শেখরানন্দ বেদান্ত সমিতির কার্যভারও গ্রহণ করিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ দেখিয়া সুখী হইলেন যে, সেবাশ্রম জনহিতকর কর্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত জেলার কেন্দ্রীয় শহরে উহাই একমাত্র হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠান।

ভেষজ চিকিৎসার জন্য সেবাশ্রম ব্যতীত অন্য কিছু করিতে স্বামিজী চাহিলেন। তথায় নানা প্রকার কার্যের সুযোগ ছিল। যে সকল প্রভাবশালী ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন তাঁহারাও উক্ত বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইলেন। তিনি ক্ষেত্র প্রস্তুত ফিরিলেন। কালিকটে এই যাত্রায় তিনি ওট্টাপালমের বালিকা শিষ্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহারা সকলে স্বামিজীর অনুরাগী ভক্ত শিষ্য শ্রী টি, ভি, কৃষ্ণ নায়ারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নায়ার তখন কালিকটে সাব অর্ডিনেট্ জজ ছিলেন। অনাথা বালিকাগণ তাহাদের জীবনে এই প্রথম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কালিকট শহর, বিশাল সমুদ্র ও বৃহত্তর জগৎ দেখিবার অপূর্ব সুযোগ পাইল! এই সকল বালিকা ও অন্যান্য স্ত্রী ভক্তদের সম্বন্ধে তাঁহার এক শেষ ইচ্ছা ছিল—তাহাদিগকে জগন্মাতার পাদপদ্মে সমর্পণ। ইহার বাহ্য নিদর্শনস্বরূপ তিনি তাহাদিগকে কন্যা কুমারীতে লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে এই সকল বালিকা ও স্ত্রী ভক্তসহ এক বড় দল লইয়া তিনি ওট্টাপালম ত্যাগ করিলেন। তীর্থযাত্রা-পথিমধ্যে বিশ্রামের জন্য ত্রিবান্দ্রাম আশ্রমে ও কুমারিকা অন্তরীপে অবস্থানের উত্তম ব্যবস্থা পূর্বেই করা হইল। কিরূপে তিনি স্বীয় দলভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির অভাব ও স্বাচ্ছন্দ্যের সংবাদ রাখিতেন তাহা স্মরণ-যোগ্য। কোনও গর্ভধারিণী তাঁহার সন্তান-সন্ততিদিগকে এত স্নেহযত্ন করেন কি না সন্দেহ। তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষুদ্র অভাব, এমন কি গরম জলে স্নানাদির ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই যৎপরোনাস্তি সুখী বোধ করিলেন। তিনি বাজারে যাইয়া শিশুদের জন্য হার, লকেট্ প্রভৃতি অনেক সুন্দর ছোট ছোট উপহার মনোনীত ও ক্রয় করিলেন। বিজয়া দশমী উপলক্ষে

তিনি সকলকে একখণ্ড করিয়া বস্ত্র দিলেন এবং উত্তর ভারতে তাঁহার ভক্তবৃন্দকে বিজয়ার প্রীতি উপহার পাঠাইলেন। আশ্রম ভৃত্যদের শিশুদের জন্যও তিনি নূতন সুন্দর ফ্রক্ তৈয়ার করাইলেন। তিনি যখন গাঞ্চামা পরিচারিকার তিন বৎসর বয়স্ক কন্যাকে সস্নেহে ডাকিয়া আঙুর, মিছরি এবং অন্যান্য ফল মিষ্টি খাইতে দিতেন তাহা সত্যই দর্শন যোগ্য হইত। শিশুদিগের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য তিনি ঐ সব ফল-মিষ্টি ক্রয় করিয়া রাখিতেন। তিনি স্বীয় ভক্ত শিষ্যদের জন্য জামা প্রভৃতি সেলাই করার নিমিত্ত আশ্রমে একটি দক্ষ দর্জী নিযুক্ত করিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত টুপি, কোট, শার্ট প্রভৃতি নানারকমের জামা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সেলাই করার পরামর্শ তিনি দর্জীকে দিতেন। তিনি পরিচিত কাপড়ের দোকান হইতে একটি টুপি কিনিয়া আনিলেন ও শিশুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি টুপি? তাহারা বলিল—উহা গান্ধী টুপি; কিন্তু তাহা সত্য নহে। তখন তিনি নির্দেশ করিলেন-উহার সহিত গান্ধী টুপির পার্থক্য কোথায় বিদ্যমান। এইরূপে তিনি বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদের মধ্যে তিনি বিবিধ গল্প বলিতেন এবং হাস্যজনক কৌতুক ও মন্তব্য করিতেন। আবার প্রায়ই সুদূর জগতে তাহাদিগকে লইয়া যাইতেন—কখনো জগদাতীত মনোভাব এবং শূন্য দৃষ্টি দ্বারা এইরূপে উল্লিখিত স্বর্গরাজ্যে তিনি তাহাদিগকে মাসের পর মাস রাখিয়াছিলেন।

ত্রিবান্দ্রাম হইতে অনেক স্থানীয় ভক্ত পরিবার কুমারিকা তীর্থযাত্রার জন্য উক্ত দলের সহিত যোগ দিলেন। ইহাতে একটি বড় গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল এবং উহার নায়ক হইলেন স্বামিজী স্বয়ং। বোধ হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গীদল ব্যতীত এতবড় দল সম্প্রতি জগন্মাতার সমক্ষে নীত হয় নাই। ইহা অবর্ণনীয় বিমল আনন্দ। পূর্ণিমা দিবসে গর্জ্জনকারী তরঙ্গায়িত সমুদ্রে স্বামিজী শিশুদের ক্রীড়াসঙ্গী ও সংরক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে হাসিমুখে জলক্রীড়া করিতেন। বীচিবিক্ষুব্ধ ও নিনাদকারী সমুদ্রে তিনি তাহাদিগকে কখনো হাতে তুলিয়া, কখনও কাঁধে করিয়া স্নান করিতে অগ্রসর হইতেন। তরঙ্গশ্রেণীর উপরে তাঁহার অনুরক্ত শিশুবৃন্দসহ উঠিয়া প্রকৃত পক্ষে তিনি মায়িক সংসার সমুদ্রের সহিত খেলা করিতেছিলেন। তখন ত্রিবান্দ্রামে ও কুমারীকাতে যাহারা তাঁহার সঙ্গলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন, তাহাদের কাছে উহা অবিস্মরণীয় পুণ্যস্মৃতি হইয়া থাকিবে। অস্ত গমনোন্মুখ দিবাকরের মৃদু রশ্মি সত্যই আনন্দকর হয়।

উহার বাৎসরিক কার্য্য বিবরণ সমূহ হইতে জানা যায়—সর্ব বর্ণের ও সর্ব ধর্মের শিশুগণ হাজারে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসিত হইতেছে। স্বামী শেখরানন্দ সেবাশ্রমে ঠাকুরের পূজা আরতি আরম্ভ করিলেন। শাস্ত্র পাঠ এবং নিয়মিত শাস্ত্র ব্যাখ্যাও আরম্ভ হইল। অনেক ধর্ম পিপাসুর নিকট ইহা অতীব রুচিকর প্রতিপন্ন হইল। স্বামী শেখরানন্দ বেদান্ত সমিতির কার্যভারও গ্রহণ করিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ দেখিয়া সুখী হইলেন যে, সেবাশ্রম জনহিতকর কর্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত জেলার কেন্দ্রীয় শহরে উহাই একমাত্র হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠান।

ভেষজ চিকিৎসার জন্য সেবাশ্রম ব্যতীত অন্য কিছু করিতে স্বামিজী চাহিলেন। তথায় নানা প্রকার কার্যের সুযোগ ছিল। যে সকল প্রভাবশালী ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন তাঁহারাও উক্ত বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইলেন। তিনি ক্ষেত্র প্রস্তুত ফিরিলেন। কালিকটে এই যাত্রায় তিনি ওট্টাপালমের বালিকা শিষ্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহারা সকলে স্বামিজীর অনুরাগী ভক্ত শিষ্য শ্রী টি, ভি, কৃষ্ণ নায়ারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নায়ার তখন কালিকটে সাব অর্ডিনেট্ জজ ছিলেন। অনাথা বালিকাগণ তাহাদের জীবনে এই প্রথম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কালিকট শহর, বিশাল সমুদ্র ও বৃহত্তর জগৎ দেখিবার অপূর্ব সুযোগ পাইল! এই সকল বালিকা ও অন্যান্য স্ত্রী ভক্তদের সম্বন্ধে তাঁহার এক শেষ ইচ্ছা ছিল—তাহাদিগকে জগন্মাতার পাদপদ্মে সমর্পণ। ইহার বাহ্য নিদর্শনস্বরূপ তিনি তাহাদিগকে কন্যা কুমারীতে লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে এই সকল বালিকা ও স্ত্রী ভক্তসহ এক বড় দল লইয়া তিনি ওট্টাপালম ত্যাগ করিলেন। তীর্থযাত্রা-পথিমধ্যে বিশ্রামের জন্য ত্রিবান্দ্রাম আশ্রমে ও কুমারিকা অন্তরীপে অবস্থানের উত্তম ব্যবস্থা পূর্বেই করা হইল। কিরূপে তিনি স্বীয় দলভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির অভাব ও স্বাচ্ছন্দ্যের সংবাদ রাখিতেন তাহা স্মরণ-যোগ্য। কোনও গর্ভধারিণী তাঁহার সন্তান-সন্ততিদিগকে এত স্নেহযত্ন করেন কি না সন্দেহ। তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষুদ্র অভাব, এমন কি গরম জলে স্নানাদির ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই যৎপরোনাস্তি সুখী বোধ করিলেন। তিনি বাজারে যাইয়া শিশুদের জন্য হার, লকেট্ প্রভৃতি অনেক সুন্দর ছোট ছোট উপহার মনোনীত ও ক্রয় করিলেন। বিজয়া দশমী উপলক্ষে

তিনি সকলকে একখণ্ড করিয়া বস্ত্র দিলেন এবং উত্তর ভারতে তাঁহার ভক্তবৃন্দকে বিজয়ার প্রীতি উপহার পাঠাইলেন। আশ্রম ভৃত্যদের শিশুদের জন্যও তিনি নূতন সুন্দর ফ্রক্ তৈয়ার করাইলেন। তিনি যখন গাঞ্চামা পরিচারিকার তিন বৎসর বয়স্ক কন্যাকে সস্নেহে ডাকিয়া আঙুর, মিছরি এবং অন্যান্য ফল মিষ্টি খাইতে দিতেন তাহা সত্যই দর্শন যোগ্য হইত। শিশুদিগের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য তিনি ঐ সব ফল-মিষ্টি ক্রয় করিয়া রাখিতেন। তিনি স্বীয় ভক্ত শিষ্যদের জন্য জামা প্রভৃতি সেলাই করার নিমিত্ত আশ্রমে একটি দক্ষ দর্জী নিযুক্ত করিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত টুপি, কোট, শার্ট প্রভৃতি নানারকমের জামা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সেলাই করার পরামর্শ তিনি দর্জীকে দিতেন। তিনি পরিচিত কাপড়ের দোকান হইতে একটি টুপি কিনিয়া আনিলেন ও শিশুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি টুপি? তাহারা বলিল—উহা গান্ধী টুপি; কিন্তু তাহা সত্য নহে। তখন তিনি নির্দ্দেশ করিলেন-উহার সহিত গান্ধী টুপির পার্থক্য কোথায় বিদ্যমান। এইরূপে তিনি বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদের মধ্যে তিনি বিবিধ গল্প বলিতেন এবং হাস্যজনক কৌতুক ও মন্তব্য করিতেন। আবার প্রায়ই সুদূর জগতে তাহাদিগকে লইয়া যাইতেন—কখনো জগদাতীত মনোভাব এবং শূন্য দৃষ্টি দ্বারা এইরূপে উল্লিখিত স্বর্গরাজ্যে তিনি তাহাদিগকে মাসের পর মাস রাখিয়াছিলেন।

ত্রিবান্দ্রাম হইতে অনেক স্থানীয় ভক্ত পরিবার কুমারিকা তীর্থযাত্রার জন্য উক্ত দলের সহিত যোগ দিলেন। ইহাতে একটি বড় গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল এবং উহার নায়ক হইলেন স্বামিজী স্বয়ং। বোধ হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গীদল ব্যতীত এতবড় দল সম্প্রতি জগন্মাতার সমক্ষে নীত হয় নাই। ইহা অবর্ণনীয় বিমল আনন্দ। পূর্ণিমা দিবসে গর্জ্জনকারী তরঙ্গায়িত সমুদ্রে স্বামিজী শিশুদের ক্রীড়াসঙ্গী ও সংরক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে হাসিমুখে জলক্রীড়া করিতেন। বীচিবিক্ষুব্ধ ও নিনাদকারী সমুদ্রে তিনি তাহাদিগকে কখনো হাতে তুলিয়া, কখনও কাঁধে করিয়া স্নান করিতে অগ্রসর হইতেন। তরঙ্গশ্রেণীর উপরে তাঁহার অনুরক্ত শিশুবৃন্দসহ উঠিয়া প্রকৃত পক্ষে তিনি মায়িক সংসার সমুদ্রের সহিত খেলা করিতেছিলেন। তখন ত্রিবান্দ্রামে ও কুমারীকাতে যাহারা তাঁহার সঙ্গলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন, তাহাদের কাছে উহা অবিস্মরণীয় পুণ্যস্মৃতি হইয়া থাকিবে। অস্ত গমনোন্মুখ দিবাকরের মৃদু রশ্মি সত্যই আনন্দকর হয়।

গণের সহিত রাজর্ষিগণের সাক্ষাৎ। স্বামিজী ও জামোরিণ উভয়েই অতীব প্রীত হইলেন। প্রত্যক্ষ দর্শীর মনে হইল জামোরিণ স্বামিজী অপেক্ষা অধিকতর প্রীতিলাভ করিলেন। কারণ ঐদিন তদ্বংশে এক রাজকুমারের জন্মলাভের শুভসংবাদ তিনি পাইয়াছিলেন, এবং উক্তদিনটি ছিল তাঁহার মস্‌নদ্‌ প্রাপ্তির অব্যবহিত পরবর্ত্তী দিবস।

স্বামী নির্মলানন্দ কালিকটে যে শুভকর্ম অনুষ্ঠানে সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা সম্পাদনার্থ একটি অতি প্রভাবশালী কমিটি গড়িলেন ; প্রায় সর্ব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় বক্তিগণ উহার সভ্য হইলেন। জামোরিণ অনুগ্রহপূর্বক উহার পৃষ্ঠপোষক হইতে সম্মতি দিলেন এবং কমিটি রেজিষ্টার্ড হইল। স্বামিজী ত্রিবাঙ্কুরে ফিরিলেন এবং তাঁহার কার্যের জন্য আবশ্যকীয় নির্দ্দেশ দিয়া ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা চিরতরে ত্যাগ করিয়া ওট্টাপালমে আসিলেন। শিশুগণ ও ভক্তবৃন্দ স্বামিজীকে তাঁহাদের মধ্যে পাইয়া অপরিমেয় আনন্দলাভ করিলেন।

পঁয়ত্রিশ

মহাসমাধি

শেষবার কলিকাতায় কঠিন অসুখে ভুগিবার পর স্বামী নির্মলানন্দ আর পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। ইহার পর হইতে তিনি ক্রমশঃ দুর্বল ও অক্ষম হইয়া পড়িতেছিলেন, কিন্তু দৈহিক দুর্বলতা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি মনের জোরে পূর্ববৎ সর্ব কর্ম করিতেছিলেন। যখন তিনি ওট্টাপালমে আসিলেন তখন তাঁহাকে অত্যন্ত অবসন্ন ও জীর্ণ-শীর্ণ দেখাইতেছিল। তথাপি তাঁহার স্বর, তাঁহার বাক্য ও তাঁহার কার্য, সমস্তই পূর্ব শক্তি ও সামর্থ্য প্রকাশ করিতেছিল। আর একবার তিনি কালিকটে গেলেন তত্রস্থ সমিতির কার্যারম্ভের ব্যবস্থা করিতে। কিন্তু মন্দ ঋতু ও অসুস্থতা নিমিত্ত অধিক দিন তথায় থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁর প্রিয় ওট্টাপালম আশ্রমে ও ভারত নদীতীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

যেভাবেই হউক, এখন তিনি অন্তরে বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রধান কর্ম সমাপ্তপ্রায়। তাঁহার পরবর্তী উক্তি সমূহ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিল যে, তাঁহার মহাসমাধি আসন্ন। তাঁহার বয়স্ক সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দকে প্রায়ই বলিতেন—"আমি শীঘ্রই চলে যাবো, তোমরা তখন স্বাধীন হবে।" একদিন তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি কোন বন্ধুকে বলিলেন "আমি চলে গেলে আমার এই সন্তানগুলিকে কে দেখ্‌বে?" জীবনসন্ধ্যায় তিনি আশ্রিত বাৎসল্যের জীবন্ত প্রতিমা হইয়াছিলেন। একদিন সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মহাযাত্রার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি; এখন বলো, এই সকল আশ্রম সম্বন্ধে আমার কি করা উচিৎ! তোমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বক্তব্য প্রকাশ করো। কেহ কাহারো সঙ্গে পরামর্শ করিও না। তখন প্রত্যেকেই তাহাদের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করিলেন। তন্মধ্যে একজনকে স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে কি তোমরা আমাকে অবসর লইতে দিবে না?" শিষ্য শ্রদ্ধাভরে উত্তর দিলেন, "না"। স্বামিজী মন্তব্য করিলেন, "তুমি আমার আসন্ন প্রয়াণ সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতেছ না।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কিরূপে জীবন কাটাইবে?"

শিষ্য উত্তর দিলেন—"সর্বতোভাবে আপনার আদেশ শিরোধার্য করিয়া।"

গুরু—"তাহা বর্তমানে, কিন্তু ভবিষ্যতে?"

তিনি শিষ্যদিগকেও জানাইলেন তাঁহার মহাপ্রয়াণের আসন্নতা এবং নানা প্রশ্ন করিলেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, "আমি চলিয়া গেলে কে তোমাদিগকে 'শম্ভু' মার্কা চাটনী খাইতে দিবে?"

তাঁহার মহাসমাধির আসন্নতা নির্দেশ করিয়া তিনি অনেক ইঙ্গিত করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ দেহরক্ষার সময় বহু পূর্ব হইতেই বিদিত হয়েন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব অন্তকাল পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মবিদ্ ত্রিকালজ্ঞ হয়েন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে স্বীয় মৃত্যুকাল অবগত হওয়া আদৌ আশ্চর্য নহে।

মহাসমাধির পাঁচ সপ্তাহ পূর্বে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তিনি অনেকগুলি ভক্তের সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন। 'বিবেকবাণী'র সম্পাদক তখন উপস্থিত ছিলেন। কথা শেষে স্বামিজী স্বগতঃ মন্তব্য করিলেন, "শীঘ্রই আমি দেহত্যাগ করিতে পারি; যে কোনও সময়ে, কে জানে?" 'বিবেকবাণী' পত্রিকার

দ্বিতীয় বর্ষে (৭০৯ পৃষ্ঠায়) তাঁহার প্রকাশিত কথোপকথনের মধ্যে উক্ত মন্তব্য পাওয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও তিনি তখন এত কঠোর নীতিবাদী বা কঠোর কর্মীচালক হইলেন যে, পূর্বে তাঁহাকে কখনও ঐরূপ দেখা যায় নাই। কোনও শিষ্যের অত্যল্প অসাবধানতা, অবহেলা বা বিস্মরণ ভীষণ অন্যায়রূপে গৃহীত হইত। এমন দিন যাইত না, যেদিন গুরুর কোনও শিক্ষা তাঁহাদের মনে ছাপ ফেলিত না। তিনি যেন তাঁহার শিষ্যবৃন্দের জীবনকটাহকে তপস্যানলে উত্তপ্ত করিয়া নিজস্ব মার্কা (ছাপ) দিতেছিলেন। এই দিব্য ছাপ কোনও উপায়ে উঠিয়া যাইবে না অথচ তাহা তাহাদিগকে মোক্ষধামে প্রবেশে সমর্থ করিবে। 'রামকৃষ্ণ' মার্কা সন্ন্যাসী গড়নে স্বামী নির্মলানন্দ শেষ জীবনে প্রাণপণ করিলেন। গুরু-শিষ্যদের জীবনগুলিকে স্বকীয় জীবন অপেক্ষা শতগুণে সমুজ্জ্বল করিতে ব্যগ্র হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, "তোমরা আমার চেয়ে বড় হও।" এই কল্যাণকামনার আতিশয্যে গুরুকে কখনো বজ্রাদপি কঠোর আবার কখনো কুসুমাদপি মৃদু হইতে হয়।

তৎকালে স্বামী নির্মলানন্দ অনুরক্ত অন্তেবাসীগণকে যত বেশী কাজ দিলেন তত বেশী তাহাদের উপর কৃপা বর্ষণ করিলেন এবং তত বেশী নিজেকে গুটাইয়া লইলেন। একদিন কোনও আশ্রমভৃত্যের অপমৃত্যু ঘটে। ইহাতে স্বামীজি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, এবং তাহার প্রেতাত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি উহার শোকসন্তপ্তা গর্ভধারিণীকে কয়েকশত টাকা দিলেন এবং উহা কি ভাবে মূলধনরূপে রাখিয়া উহার সুদে জীবন চালাইতে হইবে তাহাও তাহাকে বলিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই স্বামীজি অত্যন্ত অসুস্থ ও শয্যাগত হইলেন। এই দুর্ঘটনার যথার্থ বিবরণ এইরূপ—

আশ্রমের একটি পুরাতন ইঁদারার মেরামত করান হইতেছিল। স্বামী অমলানন্দ ও স্বামী মুরহরানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ উপস্থিত থাকিয়া এই মেরামতের কার্য ৩/৪ জন মজুরের দ্বারা করাইতেছিলেন। হঠাৎ উহার একপাশ ধ্বসিয়া পড়িল এবং ৩।৪ জন মজুর উহাতে চাপা পড়িল। শক্তিশালী মুরহরানন্দজী তিনজনকে টানিয়া তুলিলেন; কিন্তু যে মজুর সর্ব নিম্নে ছিল সে আর উঠিতে পারিল না, চাপা পড়িয়া মরিল! এই দুঃসংবাদ শুনিয়া স্বামী নির্মলানন্দ ইঁদারার কাছে ছুটিয়া আসিলেন এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হা ঠাকুর! যাদের জল খাবার জন্য এই ইঁদারা মেরামত করাচ্ছি তাদের একটিই মারা গেল!

স্বামী বিবেকানন্দ একদা তৎ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার প্রতি অত্যন্ত কঠোর হন তাঁহাকে বেদান্তদর্শনে ও ভারতীয় ধর্মাদর্শে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য। বিদেশিনী নিবেদিত ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া গুরুত্যাগ ও অন্যত্র গমনের সঙ্কল্প করিলেন। শিষ্যা যখন বিষণ্ণ বদনে গুরুর কাছে বিদায় লইতে আসিলেন তখন গুরু হাসিয়া শিষ্যাকে বলিলেন—"হাসিমুখে বিদায় লও না কেন? আমি কি তোমাকে এতদিন ধরিয়া বোঝাই নাই যে, বেদান্তমতে ঐহিক জীবন স্বপ্নবৎ-মায়িক?" বুদ্ধিমতী শিষ্যা সিদ্ধগুরুর মনোভাব বুঝিলেন, এবং ভারত ত্যাগের সঙ্কল্প বিসর্জন দিলেন। মধ্যযুগের সিদ্ধ সাধু সন্ত দা'দু শিষ্যদের প্রতি বজ্রবৎ কঠোর আচরণ করিতেন। শিষ্যবৃন্দ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবার মনস্থ করিলে তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন—

সোনে সেতী বৈর ক্যা মারৈ ঘনকে ঘাই।
দাদু কাঠি কলংক সব রাখে কণ্ঠ লগাই ।।
পানী মাহেঁ রাখিয়ে কনক কলংক ন জাহি।
দাদু গুরুকে জ্ঞান সোঁ তাহি অগিনি মে বাহি ।।
মাহৈ মীঠা হেত করি উপরি কড়ুয়া রাখি।
সৎ গুরু শিখ কোঁ শীখ্ দে সব সাধু কী সাখি ।।

অনুবাদ—সোনার সঙ্গে স্যাকরার কি বৈরিতা আছে যে, তাহাকে প্রকাণ্ড হাতুড়ির আঘাত মারিতে হয়? সোনার সব কলঙ্ক কাটিয়া তাহাকে কণ্ঠহার করিবার জন্য উহা প্রয়োজন। জলের মধ্যে রাখিলে সোনার কলঙ্ক কাটিবে না; তাই গুরুর জ্ঞানাগ্নিতে শিষ্যকে উত্তপ্ত ও বিশুদ্ধ করিতে হয়। সদ্গুরু ভিতরে সুমধুর স্নেহভাব ও বাহিরে অসহ্য কঠোরভাব রাখেন। এইরূপ শিষ্যদের শিক্ষা বিষয়ে সব গুরুই একমত পোষণ করেন।

সুস্থ বোধ না করিয়া ২০শে এপ্রিল বুধবার প্রাতে তিনি জোলাপ (রেচক ঔষধ) লইলেন, কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার হইল না। ঐদিন বৈকাল চারটায় ডাক্তার ডাকা হইল। ডাক্তার স্বামিজীকে পরীক্ষা করিয়া ড্রস্ দিলেন এবং ভাবিলেন—কুইনাইন ইন্জেক্সন্ দিলে জ্বর কমিয়া যাইবে। কিন্তু সেই ইন্জেক্সন্ পেশীগত করা হইবে বলিয়া তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন—সেই ব্যথা এই বৃদ্ধ রোগীকে দিবেন কিনা এবং রোগীও তৎকালীন দৈহিক অবস্থায় ইহা সহ্য করিতে পারিবেন কিনা? তাঁহার মনোভাব বুঝিতে

পারিয়া নির্ভীক স্বামিজী বলিলেন—"ডাক্তার! আপনি ভীত হইবেন না। আপনি এই দেহকে যথেচ্ছ চিকিৎসা করিতে পারেন। ইহা আমার নহে, তাঁর।" রোগীকে ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া হইল।

পরদিন ২১শে এপ্রিল গুরুবার তাঁহার জ্বর ১০০·৩ ডিগ্রী হইতে ৯৯·৫ পয়েন্ট ডিগ্রীতে নামিয়া আসিল, কিন্তু বাহুর ঊর্দ্ধাংশ যথায় ইন্‌জেক্‌সন্ দেওয়া হইয়াছিল তাহা একটু ফুলিয়া উঠিল। তথায় বেশ ব্যথা হইল, অনন্তর এক এম-বি, বি-এস ডাক্তারকে ডাকা হইল। তিনি স্বামিজীকে জানিতেন। বাহ্য প্রয়োগের জন্য, তিনি কয়েকটি ঔষধের ব্যবস্থা দিলেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া স্বামিজী বলিলেন—"ডাক্তার! আমার কাছে কতকগুলি দামী প্রলেপ ও ঔষধ আছে, আপনি সেইগুলি লইয়া যান ও দরিদ্র রোগীদিগকে ব্যবহার করিতে দিন, যাহারা ঔষধ কিনিতে সমর্থ তাহাদের দিবেন না।" সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া যথাযথভাবে বাঁধিয়া আলাদা রাখা হইল ডাক্তারকে দিবার জন্য। চিকিৎসা চলিল, কিন্তু ব্যথা বা ফোলা কমিল না। সে যাহা হউক স্বামিজী অতিথি নিবাসের নির্মাণ এবং অন্যান্য আশ্রম কার্য সম্বন্ধে নির্দেশদানে নিরস্ত হইলেন না। ২২শে তারিখে শুক্রবার পালেই আশ্রম হইতে একপত্র আসিল। যখন ইহা স্বামিজীর নিকট প্রদর্শিত হইল তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা তাঁহার নামে কিনা। শিষ্য বলিলেন—'না'। স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কেন উহা আমার কাছে আনিয়াছ?"

শিষ্য উত্তর দিলেন—"পালেই আশ্রম সম্পর্কীয় ব্যাপারগুলি আপনাকে জানাইবার জন্য অধ্যক্ষ লিখিয়াছেন।" স্বামিজী বলিলেন—"আ! আশ্রম সমূহ এবং ইহাদের ব্যাপারগুলিতে আমি আর সংশ্লিষ্ট থাকিতে চাই না। উহাদের সহিত আর আমার কোনো সম্পর্ক নাই। প্রত্যেক আশ্রম উহার অধিবাসিগণ কর্তৃক পরিচালিত হউক। আমি শান্তিধামে চলিয়া যাইতেছি।"

তিনি পত্রোক্ত বিষয় শুনিতে চাহিলেন না।

২৩ তারিখে শনিবার স্বামিজীর পায়ে একটু ফোলা দেখা দিল। পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক গৃহী শিষ্যকে লক্ষ করিয়া সেই ফোলা সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিলেন—"দেখ, ছেলেরা আমার ফোলা পায়ের দিকে একমনে তাকিয়ে দেখিতেছে। এই ফোলা হাতের ফোলার মত নয় ইহা স্বতন্ত্র প্রকৃতির ফোলা।" যে ছোট ছোট বালিকাগণ সর্বদা তাঁহার কাছে থাকিত, তখনও তিনি

তাহাদিগকে নূতন নূতন গান শিখাইতে লাগিলেন এবং মধুর কণ্ঠে তাহাদের সঙ্গে গান গাহিতে লাগিলেন, তিনি তাহাদের সহিত খেলা করিতেন, হাসিতেন এবং কৌতুকসহকারে শিখাইতেন কিরূপে কাঁদিতে হয়। তিনি সেইদিন তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি চলিয়া গেলে পাকা আমগুলি ভাল করে কেটে কে তোদের খেতে দেবে?" হতভাগ্য শিষ্যবৃন্দ এই বাক্যের মর্মার্থ বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিল না। যে সকল সন্ন্যাসী শিষ্য তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন তাহাদিগকে তিনি বলিলেন—"আমাকে আর ঔষধ দিও না।" কিছুক্ষণ পরে আবার তিনি বলিলেন—"কাল থেকে আমি কিছু চাই না" অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি স্বগতঃ মন্তব্য করিলেন—"আমাকে শান্তিতে চলে যেতে দাও।" এইসকল অর্থসূচক উক্তি শুনিয়াও শিষ্যবৃন্দ গুরুভক্তির আতিশয্যে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে, মহাসমাধি সমাসন্ন। ২৪ তারিখে রবিবার তাঁহার অবস্থা একটুও ভাল হইল না। চিন্তিত হইয়া শিষ্যগণ ত্রিবান্দ্রামের ডাক্তার তাম্পিকে সেইদিন বৈকালে আসিবার জন্য জরুরী তার করিলেন। সেইদিন একাধিকবার স্বামিজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার নামে ডাকে কোনও বাংলা বই আসিয়াছে কি?" নববর্ষের বাংলা পঞ্জিকার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন (তখন বৈশাখ মাসের প্রারম্ভ।) ইহা না পাইয়া তিনি পুরাতন বাংলা পঞ্জিকা এবং নূতন মালয়াম পঞ্জিকা আনাইলেন। সেইদিন রাত্রে তাঁহাকে বলিতে শোনা গেল, "কাল আর এক গুরু ভাই স্ব-ধামে ফিরিয়া যাইবেন।" পরদিন বেলুড়মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহাসমাধিযোগে এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মঠে দেহরক্ষা করিলেন। এই দুঃসংবাদ তারযোগে তিনি পাইলেন। স্বামী নির্মলানন্দের মুখে নিরবচ্ছিন্ন মধুর নিনাদ উচ্চারিত হইতে ছিল—'মা' 'মা' 'ওমা'! তিনি আপন মনে বলিলেন—"হ্যাঁ, ত্রিবান্দ্রাম আশ্রমের কাজ শেষ হইয়াছে।" এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, স্বামী নির্মলানন্দ মনে করিতেন—ত্রিবান্দ্রাম আশ্রমের কার্য সমাপ্তির ভার স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। যখন স্বামী ব্রহ্মানন্দের মহাসমাধির সংবাদ টেলিগ্রামে তখন পাইলেন তিনি ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আমার বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা আর নাই।" তিনি তখনই কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে চাহিয়া ছিলেন কিন্তু তিনি বলিলেন—"মহারাজের ইচ্ছা ছিল, আমিই ত্রিবান্দ্রামের কার্য শেষ করি। সুতরাং আমাকেই ইহা সম্পন্ন করিতে হইবে। তাঁহার

সামান্য ইচ্ছাও আমার কাছে ঠাকুরের আজ্ঞা তুল্য।" ত্রিবান্দ্রামে তৎপর যত তিনি কার্য করিয়াছেন তৎসমুদয়ের মূল উৎস ছিল মহারাজের শুভেচ্ছা।

রবিবার রাত্রি কাটিয়া গেল। সোমবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তিনি পূর্ববৎ রহিলেন—বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ সদা জাগ্রত, কর্মরত এবং শিষ্যগণকে সুশিক্ষা ও নির্দ্দেশদানে ব্যাপৃত এখন হইতে তিনি শেষ পর্য্যন্ত শান্তিময় বিগ্রহরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায়ই নির্বাক থাকিতেন। পূর্বোক্ত ঘোষণা অনুসারে তিনি কোনও ঔষধ বা পথ্য গ্রহণ করিলেন না। শুশ্রূষারত শিষ্যবৃন্দ প্রেমভরে কমলালেবুর রস বা শোডা ওয়াটার কয়েক বিন্দু জোর করিয়া তাঁহার মুখে দিতেন। একবার কয়েক ফোঁটা প্যানো পেপটন্ সোডা ওয়াটারের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাঁহার মুখে দেওয়ায় তিনি বিরক্ত হইয়া সেবক শিষ্যকে তিরস্কার করিলেন। দৈহিক দুর্বলতার আধিক্যে নিস্তেজ হইয়া তিনি বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। সর্বদাই অন্তর্মুখী ও ধ্যানমগ্ন। সোমবার রাত্রি দশটায় ডাক্তার তাম্পি সস্ত্রীক ত্রিবান্দ্রাম হইতে আসিলেন এবং স্বামিজীকে পরীক্ষা করিলেন। তখন কিছু করণীয় না থাকায় ডাক্তার বলিলেন, 'কাল সকালে আবার পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা দিবো। স্বামিজীও উহা অনুমোদন করিলেন।

শান্তভাবে নিরাপদে সোমবার রাত্রি কাটিল। মঙ্গলবার ভোর চারটায় সেবারত এক শিষ্য তাঁহার কাছে যাইয়া বলিলেন, "স্বামিজী ঘুমাইয়া আছেন?" স্বামিজী বেশ স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন কয়টা বাজিয়াছে?" শিষ্য উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা! চারটা।" পুনরায় স্বামিজী নীরব হইলেন। সেইদিন একাদশী বলিয়া হরিবাসর আরম্ভ হইল। প্রভাতে শিশুগণ স্নানান্তে পূর্ববৎ তাঁহার পার্শে সমবেত হইয়া ভজন ও কীর্ত্তন গাহিলেন। ডাক্তার তাম্পি আসিয়া স্বামিজীকে পরীক্ষা করিলেন এবং আরোগ্যের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন। তিনি পরীক্ষান্তে বিষণ্ণ বদনে সেবকবৃন্দের আশঙ্কা সমর্থন করিলেন। প্রায় সাতটার সময় স্বামিজী উঠিয়া বসিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক শিষ্য ধীরে ধীরে তাঁহাকে তুলিয়া স্বীয় বুকে ধরিয়া বসিলেন। তখন অস্ফুট স্বরে স্বামিজী বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ সব ঠিক হইয়াছে।" যে মুখ হইতে দিব্যবাণী বজ্রনাদে অর্দ্ধশতক ধরিয়া দেশে-বিদেশে উচ্চারিত হইয়াছে সেই মুখের ইহাই শেষ বাক্য। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার শয্যায় শায়িত হইলেন।

গভীর নীরবতা, স্বর্গীয় শান্তি ও দিব্যজ্যোতিঃ তাঁহার মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল। ভক্তিভরে ভজন চলিতে লাগিল। গঙ্গাজল ও স্নানজল তাঁহার মুখে দেওয়া হইল। শিশুগণ চিৎকার করিয়া গাহিল—

নির্মলং হৃদয়ং যস্য গুরোরাজ্ঞানুবর্তিনে।
নির্মলানন্দ পাদায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল মঙ্গলবার প্রাতে স্বামী নির্মলানন্দ মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন। শত শত গৃহী ভক্ত ও সন্ন্যাসী শিষ্য সমবেত হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত আর্তনাদ করিলেন—'জয় শ্রীগুরু মহারাজ কি জয়, জয় শ্রীস্বামিজী মহারাজ কি জয়'। গুরু-গম্ভীর জয়ধ্বনিতে স্বর্গ-মর্ত প্রতিধ্বনিত হইল।

সত্বর মহাসমাধির দুঃসংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং ভক্তগণ নানা স্থান হইতে দলে দলে আসিতে লাগিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে শোকার্ত্ত ভক্তবৃন্দের সমাগমে আশ্রম-প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইল। ডাক্তার তাম্পি ও অপরাপর চিকিৎসকগণ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—প্রাণবায়ু চিরতরে বহির্গত। মৃতদেহ সৎকারের আয়োজন আরম্ভ হইল। একাদশী সমাপ্ত হওয়ায় বৈকাল প্রায় তিনটায় স্নাতদেহ সিল্ক-কাপড়ে আবৃত ও বহু পুষ্পমাল্যে শোভিত হইল। আরতি সমাপনান্তে শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ—পুরুষ, নারী ও শিশু সকলে পূজা দিলেন ও প্রণাম করিলেন। ইতিমধ্যে ভারতনদীর তীরে চন্দনকাষ্ঠ এবং অন্যান্য যথাযোগ্য উপাদানে চিতা রচিত হইল। তথায় সুসজ্জিত শবদেহকে ডাক্তার তাম্পি প্রমুখ ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ শোভাযাত্রা সহকারে বহন করিয়া লইলেন। শোভাযাত্রার সম্মুখে স্বামিজীর স্নেহাস্পদ শিশুগণ সহযোগে একদল কীর্তনিয়া কীর্তন করিয়া যাইতেছিল। সেই দেবদেহ চন্দনচিতায় স্থাপিত হইল। দাউ দাউ করিয়া চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ও পূত দেহকে ভস্মীভূত করিল।

যে দিব্যজ্যোতিঃ এই দেহ আশ্রয়পূর্বক এতকাল দেশে বিদেশে অজ্ঞান অন্ধকার অপসারণে ব্রতী ছিল উহার মতই নির্মল চিতাগ্নি জ্বলিতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্বেই ইহা নির্বাপিত হইল এবং গুরুহারা ভক্তগণকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিল।

মহাসমাধির সপ্তম দিবসে ২রা মে তারিখে পূত ভস্মাস্থি পাত্র সংগৃহীত এবং আশ্রমে যথারীতি প্রোথিত হইল। ত্রয়োদশ দিবসে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভাণ্ডারা হইল। উক্তদিন প্রায় দুই হাজার দরিদ্রনারায়ণ পরিতোষসহকারে

ভোজন করিল। স্বামী নির্মলানন্দের মহাসমাধির অব্যবহিত পরেই তাঁহার শিষ্যবৃন্দ তাঁহার পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থ একটি কমিটি গঠন করিলেন। ইহার সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে নির্বাচিত হইলেন তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যদ্বয় স্বামী সুখানন্দ ও স্বামী বিশদানন্দ। কোচিন রাজ্যের রাজকুমার শ্রীরাম বর্মা তাম্পুরাণ, বোম্বাই নগরের শেঠ পুরুষোত্তম দাস, ঈশ্বর দাস এবং ত্রিবান্দ্রমের বিখ্যাত ডাক্তার রায় বাহাদুর শ্রীরমণ তাম্পি প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি উহার সহকারী সভাপতি ও অন্যান্য পদ গ্রহণ করিলেন। ওট্টাপালমে স্মৃতিমন্দির নির্মাণ, তথায় পূত ভস্মাস্থি স্থাপন ও নিত্য পূজার ব্যবস্থা করাই উক্ত কমিটির উদ্দেশ্য ছিল। মহোৎসাহে অর্থ সংগ্রহ ও মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অসীম কৃপায় মহাসমাধির প্রায় দেড় বৎসরের মধ্যেই মন্দির নির্মাণ শেষ হইল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর (বড়দিন) স্মৃতি মন্দিরে ভস্মাদি স্থাপিত ও মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। তখন হইতে অদ্যাবধি প্রায় সতের বৎসর যাবৎ মন্দিরে নিত্যপূজা ও ভোগারতি চলিতেছে। ওট্টাপালমে নির্মলানন্দ স্মৃতিমন্দির অতি বৃহৎ বা অতিক্ষুদ্র নহে। উহা দ্বিতল, অষ্টকোণ ও বারান্দা বেষ্টিত। দোতালায় অষ্টকোণের ঠিক উপরেই শোভাবর্দ্ধক অষ্ট গম্বুজ এবং চূড়ায় এক ক্ষুদ্র গম্বুজ। বাহিরের সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিতে হয়। সন্ধ্যারতি বা পূজাপাঠের সময় নরনারীগণ বারান্দায় স্বচ্ছন্দে উপবেশন করেন। এই স্মৃতিমন্দির হিন্দু বাঙ্গালীর পুণ্যতীর্থ ও ধর্মক্ষেত্র। অমর সন্ন্যাসীর স্মৃতিমন্দির দেখিয়া বাঙ্গালী ধন্য হউক।

উল্লিখিত নির্মলানন্দ স্মৃতিরক্ষা সমিতি স্বধামগত স্বামিজীর বিস্তৃত ইংরাজী জীবনী রচনা ও প্রকাশের সিদ্ধান্ত করেন। অবিলম্বে উপাদান সংগৃহীত ও ইংরাজী জীবনী লিখিত হইল। তখন বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিতেছিল। তখন উপাদান সংগ্রহ ও পুস্তক প্রকাশের অসংখ্য অসুবিধা সত্ত্বেও সাড়ে পাঁচ শত পৃষ্ঠা ব্যাপী জীবনী মহাসমাধির পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মে মাসে প্রকাশিত হইল।

অমর পুরুষ নির্মলানন্দজীর দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তবৃন্দ এইজন্য আমাদের অশেষ ধন্যবাদার্হ!

দক্ষিণেশ্বরে যে যুগসূর্য উদিত হইয়াছিলেন এবং যাহার প্রদীপ্ত প্রভাবে বর্ত্তমান ধর্ম জগৎ আলোকিত স্বামী নির্ম্মলানন্দ ছিলেন উহা হইতে বিনিঃসৃত
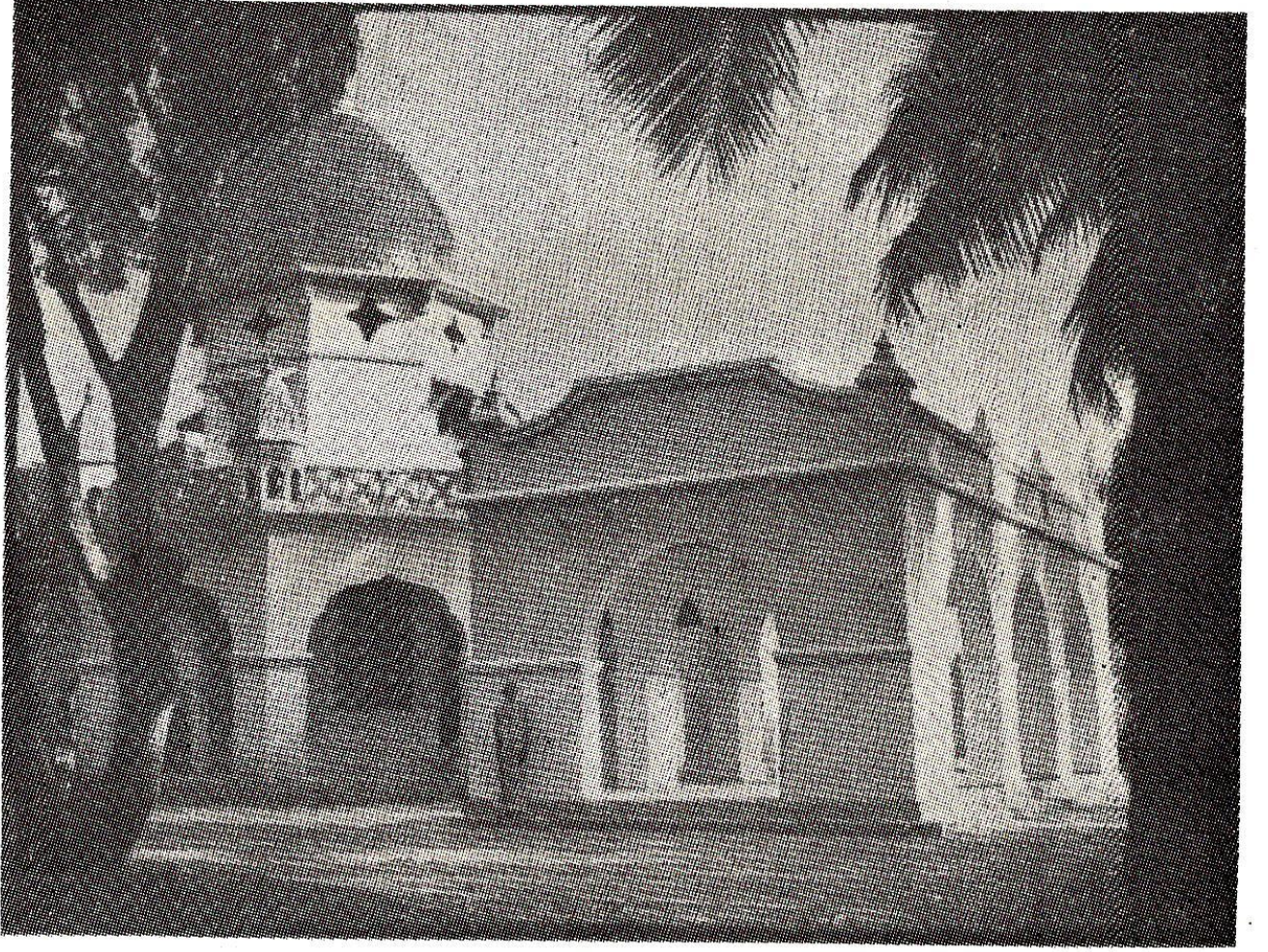
সমাধি মন্দির — স্বামী নির্ম্মলানন্দ
ওট্টাপালম

জ্যোতিরশ্মি। যে সমুজ্জ্বল রশ্মিজাল প্রভাতে বিচ্ছুরিত হয় তাহাই সন্ধ্যায় সূর্যেই প্রত্যাগত হয়। নির্মল রশ্মি পঞ্চাশ বর্ষাধিক কিরণ দানান্তে যুগসূর্যে ফিরিয়া গেলেন। জগৎ এক এক রশ্মি দেখিয়াই স্তম্ভিত! সমগ্র সূর্য দেখিলে ঝলসিয়া যাইত। তাই যুগ-লীলা লোকচক্ষুর অন্তরালে অভিনীত। তাই লীলাসহচরদের শ্রবণ-মঙ্গল জীবনচরিত গুপ্তই রহিল, অধিক প্রচার হইল না। এই পুণ্য কাহিনী যিনি শ্রদ্ধাভরে পড়িবেন তিনিই যুগাবতারের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন।

ছত্রিশ

উপসংহার

পঁচাত্তর বর্ষব্যাপী কর্মময়, তপঃপূত, সুনির্মল, মহিমান্বিত, ত্যাগোদীপ্ত ও নিবেদিত সন্ন্যাস জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনীর উপসংহার করিতেছি। সিদ্ধ সাধুর বাহ্য জীবন অপেক্ষা আন্তর জীবন উজ্জ্বলতর ও সমৃদ্ধতর; বহির্জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখিলে অন্তর্জীবনের কতটুকু ফুটিয়া উঠে? এই অর্থে মহাপুরুষের জীবন চরিত চিরকাল অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।

মানব জীবন একটি অন্যটি হইতে স্বতন্ত্র হইলেও স্বাভাবিক, সাধারণ ঘটনাময়। আর একদল মানুষ আছেন; তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলেও তাঁহারা অসাধারণ—অলৌকিক। তাঁহাদের তুলনা পাওয়া দুষ্কর। তাঁহারা মানব বিগ্রহ হইলে দিব্যশক্তি ও দিব্যজ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার। তাঁহারা স্বর্গ ও মর্তের দৃশ্যসেতু—যোগসূত্র, ঈশ্বর-মানবের মিলনমন্দির। কর্মচক্রে ঘূর্ণায়মান মানবগণের ন্যায় তাঁহারা সুখ-দুঃখাদিদ্বন্দ্বের বশবর্তী নহেন। তাঁহারা শাশ্বত সুনীতির সচল প্রতিমা। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হয়। স্বামী নির্মলানন্দ এই শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষ।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন তিনি। তাহাকে দেখিলে ও তাঁহার কথা শুনিলে অপরাপর সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের ন্যায়

পরম ভক্তিভরে ঠাকুরের মহিমার কথা চিন্তা করিত। অখণ্ডানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীর ন্যায় তিনিও মহিমাময় পুরুষ ব্যাঘ্র ছিলেন সদা স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। দিব্যশক্তি ও দিব্যজ্ঞানের অফুরন্ত ফোয়ারা মানবরূপে মানবের উচ্চতম সম্ভাবনা তাঁহাতে প্রকটিত। ঈশ্বর-দ্রষ্টা মায়ামুক্ত মহাপুরুষ! খাপখোলা তলোয়ার দগ্ধেন্ধন হুতাশন! আত্মজ্ঞান লাভ শুধু মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি নহে, উহা লোক কল্যাণেরও পরাকাষ্ঠা।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় গুরুভ্রাতাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমার প্রত্যেক গুরুভাইকে বা ঠাকুরের প্রত্যেক শিষ্যকে অসীম অধ্যাত্ম শক্তির আধাররূপে জানিবে। তাঁহারা আমার কাছে সঙ্কুচিত থাকে বলিয়া তাঁহাদিগকে সাধারণ মানুষ মনে করিও না। যখন তাঁহারা বাহিরে যাইবে তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে অপূর্ব আধ্যাত্মিক জাগরণ আনয়নে সম্যক্ সমর্থ হইবে। অনন্ত ধর্মভাবের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের অংশভূত অতিমানবরূপে তাহাদিগকে দেখিবে। সেই দৃষ্টিতে আমি তাঁহাদিগকে দেখি। সারা দুনিয়া খুঁজিলেও, তাহাদের মত ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন সন্ন্যাসী অন্য কোথাও পাইবে কিনা আমাদের সন্দেহ আছে। তাঁহারা প্রত্যেকেই ধর্মশক্তির মহাকেন্দ্র এবং কালে সেই শক্তির বিকাশ হইবে।"

শোনা যায়—দক্ষিণ ভারতে পুনর্ভ্রমনের কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"আমি নিশ্চয়ই পুনরায় দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিব এবং আবার যখন যাইব তখন তথায় খণ্ডিত তুষার পর্বতবৎ পড়িব"। তিনি নিশ্চয়ই দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছিলেন এবং হিমগিরিতুল্য পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার 'দাসানুদাস' প্রিয় তুলসী স্বামী নির্মলানন্দরূপে। যিনি উভয়ের মধ্যে তুলনা করিবেন তিনিই লক্ষ্য করিবেন—তুলসী সম্যক্‌রূপে নরেন্দ্রের প্রতিচ্ছবি : তীক্ষ্ণ মেধা, বিশাল হৃদয়, গণতান্ত্রিক মনোভাব, অসাধারণ সাহসিকতা, অলৌকিক শক্তি এবং সর্বোপরি পতিত-পদদলিত নরনারীর প্রতি অসীম সমবেদনা উভয়ের মধ্যে সমভাবে প্রকটিত। দক্ষিণ ভারতে ইহা সর্বজন স্বীকৃত হইয়াছে যে, সর্ববিষয়-বোধে ক্ষিপ্রতা, প্রশ্নোত্তর দানে প্রত্যুতপন্নমতিত্ব, কথোপকথনে ঔজ্জ্বল্য এবং একাধারে চতুর্যোগের সমন্বয় প্রভৃতি গুন-বৈভবে নির্মলানন্দ বিবেকানন্দের পরবর্তী। স্বামী নির্মলানন্দের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈত ব্যক্তিত্বের দুই ভিন্ন মূর্তি। তিনি

আরও বলিতেন, স্বামী বিবেকানন্দকে না বুঝিলে শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝা যায় না; কারণ, স্বামিজী ছিলেন ঠাকুরের ভাষ্য ও টীকা।

সেই তেজস্বিতা, বুদ্ধিমত্তা, নির্ভীকতা ও আধ্যাত্মিকতা স্বামী নির্মলানন্দের স্বভাবগত ছিল। প্রকট শক্তির পরিমাণ দেশকালভেদে এবং ব্যক্তি সামর্থ্য অনুসারে বিভিন্ন হইত। আর স্থূল শক্তির ভূমিতে তাঁহার মত কঠোর পরিশ্রম করিতে, সুখেদুঃখে সর্বাবস্থায় অবিচলিত থাকিয়া এত বেশী কাজ করিতে আর কেহ পারিবে না। ভারতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্য কোনো শিষ্য তাঁহার মত অধিক ও ব্যাপক ভ্রমণ করেন নাই—কোন শিষ্যই উত্তরে হিমালয় চূড়া হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত, পশ্চিমে কাশ্মীর হইতে পূর্বে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত এই মহাদেশে এত বেশী স্থান ও এত বেশী বার ভ্রমণ করিয়া কেহ ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবরাশি প্রচার করেন নাই। কেরল তাঁহার প্রিয় প্রদেশ ছিল। তথায় অস্পৃশ্যতা ও অদৃশ্যতা প্রথাদ্বয়, পুরোহিত কুলের অত্যাচার ও জাতিভেদ মানুষকে পশু ও পঙ্গু করিয়াছিল। পঁচিশ বৎসরব্যাপী সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ফলে সুফল প্রসূত হইয়াছে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের লোক গণনা সম্বন্ধে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সরকারী রিপোর্টে (ত্রিবাঙ্কুর ১ম ভাগ, ৩৫৬—৩৫৭ পৃষ্ঠা) উক্ত লিখিত হইয়াছে, "১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্বামী নির্মলানন্দ কেরল প্রদেশে যে আন্দোলন প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাতে পরোক্ষ সমাজ-সংস্কার হইতেছে। যদিও ঐ আন্দোলন সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক তথাপি ইহা সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধ প্রথা নিবারণে সমর্থ।"

সন্ন্যাসীবৃন্দ বর্ণাতীত বলিয়া স্বামী নির্ম্মলানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশ্রম সমূহে জাতিভেদ স্বীকৃত হয় না। মালাবারস্থ বিভিন্ন বর্ণের সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্ত ঐ সকল আশ্রমে এক সুখী পরিবারভুক্ত মনে করেন। নিম্নতম পুলায়া, পারেয়া প্রভৃতি বর্ণ হইতে উচ্চতম নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণে পর্যন্ত সর্ববর্ণের নরনারী আশ্রমোৎসবে একত্র বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। পুরীধামে জগন্নাথ-মন্দিরে মহাপ্রসাদ গ্রহণকালে যেমন বর্ণভেদ অস্বীকৃত হয় তেমনি স্বামী নির্ম্মলানন্দের আশ্রম সমূহে বর্ণভেদ স্থান পায় নাই। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন, 'ভক্তের জাত নাই'। তদনুযায়ী স্বামী নির্ম্মলানন্দ সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তকে এক বর্ণভুক্ত মনে করিতেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রবল বন্যা হয় তাহাতে গৃহহীন ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে দুর্গম পল্লীগ্রামে তৎকর্তৃক চৌদ্দহাজারের অধিক টাকা বিতরিত হয়।

স্বামী নির্ম্মলানন্দের ধর্ম্মান্দোলন সমাজে যে বিপ্লব আনিল তাহা সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া বা বক্তৃতা করিয়া সম্পন্ন হইতনা। নিঃস্বার্থ প্রেম ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ব্যতীত এইরূপ বিপ্লব প্রবর্তন অসম্ভব। এই সামাজিক প্রভাব সুদূর প্রসারী হইল। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মহারাজা ঐতিহাসিক ঘোষণা দ্বারা সর্ব শ্রেণীর হিন্দুদের জন্য সরকারী মন্দির সমূহের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, তিনি এই সকল সমাজ সংস্কারে কোন সরকারী সাহায্য প্রার্থনা বা গ্রহণ করেন নাই। সর্বশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে মৈত্রীস্থাপন দ্বারা তিনি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট ছিলেন। আশ্রমগুলি ধর্মকেন্দ্র—ধর্মসাধনা, ধর্মোৎসব ও ধর্মচর্চ্চার পাদপীঠ। সমাজে ধর্মভাব সতেজ, সবল ও সক্রিয় হইলে দুর্নীতি, দুরাচার, তামসিকতা, কুসংস্কার প্রভৃতি আবর্জনা স্বতঃই দুরীভূত হয়। অবশ্য, ঠাকুর-স্বামিজীর ভাবপ্রচারই ছিল স্বামী নির্মলানন্দের প্রধান উদ্দেশ্য, অন্যান্য সংস্কার উহার অবান্তর ফল। তাঁহার কৃপায় সহস্র সহস্র নরনারী যুগাবতারের পাদপদ্মে আশ্রয় পাইয়াছে। তিনি পঁয়ত্রিশ জন যুবককে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়াছেন। তন্মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন শিল্পকার্য্যে বিশেষজ্ঞ। ওট্টাপালম নিরঞ্জন আশ্রমে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থ যে সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক নিষ্পন্ন। তাঁহার মহাসমাধির পরে এত অল্পকালের মধ্যে এমন মন্দির নির্মাণ দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়—কেরলে তিনি কি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। উক্ত মন্দির তাঁহার মহত্ত্ব, সেবা, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি সদগুণের অক্ষয় স্তম্ভ। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর বন্যা পীড়িতদের সেবাকার্য্যে তাঁহার শিষ্যবৃন্দ যে মহোৎসাহ, আত্মত্যাগ, কর্মপটুতা, নিরলস সেবাপরায়ণতা দেখাইয়াছেন তাহা ত্রিবাঙ্কুর সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর সরকার ম্যালেরিয়া দুরীকরণার্থ যে অভিযান আরম্ভ করেন তাহাতে উল্লেখিত সন্ন্যাসীবৃন্দের সহযোগিতা সরকার কর্তৃক প্রার্থিত হয়। দক্ষিণভারতের শতশত সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাঁহার বাণী শুনিয়াছে। তাহাদের সকলের জীবনে স্বামিজী যে নিগূঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহা কখনও মুছিয়া যাইবেনা।

বেলুড় মঠের বৃদ্ধ ভক্ত ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীকুমুদবন্ধু সেন স্বামী নির্মলানন্দকে বহুবার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার

পূত সঙ্গলাভ করিয়াছেন। কুমুদবাবু বলেন,—"১৮৯৪ অথবা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আলমবাজার মঠে স্বামী নির্মলানন্দজীকে আমি অন্যতম মঠবাসী সন্ন্যাসীরূপে প্রথম দেখি ; তখন তিনি ভাল করিয়া দাড়িকামান নাই এবং তাঁহার গোঁফ ও দাড়ি বড় হইয়াছিল, তিনি তখন বই পড়িতেছিলেন। আমরা যাইবার পর তিনি আমাদের সঙ্গে ধর্ম, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলাপ করিলেন। তিনি মঠের কার্য্য সম্পাদনে শশী মহারাজকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। তিনি আমাদিগকে খুব স্নেহ করিতেন এবং আমরাও শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাক্ষাৎ শিষ্যকে শ্রদ্ধা করিতাম। যদিও তখন তন্মধ্যে কোন অসাধারণত্ব দেখি নাই তথাপি তাঁহাকে ধীসম্পন্নও ক্ষিপ্রকর্মী মনে হইত। যখন স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় ফিরিলেন তখন স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন এবং তন্ময় হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেন এবং ভক্তবৃন্দ ও অতিথিবর্গকে সেবা করিতেন। স্বামিজী তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন এবং অন্যান্য গুরুভাইদের মত ব্যবহার করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় যান এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তথা হইতে ভারতে প্রত্যাগত হন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহাকে আমি পুনরায় বেলুড় মঠে এবং শ্রীমার বাড়ীতে দেখি। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে কলিকাতা টাউন হলে যে ভারতীয় সর্বধর্ম সম্মেলন হয় তাহাতে তিনি স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক লিখিত হিন্দু ধর্মসম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ শ্রোতৃমণ্ডলী কর্তৃক প্রশংসিত হয়। আমরা বেলুড় মঠে, বিবেকানন্দ সোসাইটিতে এবং ভক্তগৃহে যাইয়া তাঁহার চিত্তাকর্ষক আলোচনা শুনিতাম। লোকে তাঁহাকে হিন্দু-ধর্ম এবং প্রচলিত ধর্মসমস্যার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি তৎসমূহের পরিষ্কার সাবলীল সমাধান দিতেন এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী ও উপদেশ উল্লেখ করিতেন। যাঁহারা তাঁহার কথোপকথন শুনিয়াছেন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, তাঁহার কথোপকথনে অপূর্ব মৌলিকতা বিদ্যমান এবং তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পরেই প্রশ্নোত্তর দানে সুপটু সন্ন্যাসী ছিলেন। তৎপরে তিনি মাদ্রাজে ও বাঙ্গালোরে গমন করেন। যখন তিনি আবার বেলুড়ে ফিরিলেন ভক্তগণ তাঁহার দর্শন লাভ ও উপদেশ শ্রবণ উদ্দেশ্যে

হইত, এমন কি, রামকৃষ্ণমিশনের সভাসমূহে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনার নিমিত্ত তাঁহার উপস্থিতি সর্বোপরি উপভোগ্য হইত। কখনও যদি তিনি কলিকাতা সহরে কোন ভদ্রলোক বা ভক্তজনের গৃহে আমন্ত্রিত হইতেন শ্রীরামকৃষ্ণের কতিপয় ভক্ত তাঁহার পুণ্য সঙ্গ ও কথাপ্রসঙ্গ উপভোগার্থ তথায় যাইতেন। স্বর্গগত ইঞ্জিনিয়ার মনমোহন গাঙ্গুলী বি.সি. ই. যিনি উড়িষ্যার স্থাপত্য সম্বন্ধে একখানি প্রসিদ্ধ বই লিখিয়াছিলেন এবং যাঁহার নাম তখন এই দেশে বহুদূর পর্য্যন্ত সুবিদিত ছিল—তিনি বাঙ্গালোর ভ্রমণে যাইয়া তত্রস্থ আশ্রমে অবস্থান করেন এবং স্বামী নির্মলানন্দের পুণ্য সঙ্গলাভে ধন্য হন। মাসিক পত্রিকাসমূহে তিনি উক্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিবার সময় স্বামী নির্মলানন্দের নাম উল্লেখ এবং তাঁহার চরিত্র ও জীবনের বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি স্বামিজীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সম্পন্ন হন। উক্ত ইঞ্জিনিয়ার আমার বন্ধু ছিলেন এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে বাঙ্গালোরে স্বামিজীর প্রীতিকর ও পবিত্র সঙ্গের কথা বলিয়াছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মলানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে বাঙ্গালোরে লইয়া যাইতে বেলুড় মঠে আসেন। সেই যাত্রায় আমিও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম ; মাঝে মাঝে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একত্রে আলোচনা করিতাম। তখন তিনি একা থাকিলে গিরিশ ঘোষ রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক একটি বৈষ্ণব সঙ্গীত গাহিতেন। শ্রদ্ধেয় গিরিশবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ও সুবিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ উক্ত সঙ্গীত এত ভক্তিভরে গাহিতেন যে, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িত। যদিও তিনি অত্যন্ত সংযমশীল সন্ন্যাসী ছিলেন তথাপি তিনি ভাব—ভক্তির আবেগ চাপিতে না পারিয়া প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে আমরা মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে যাইয়া প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থান করি। তখন স্বামী সর্বানন্দ ছিলেন মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ। আমরা যখন বাঙ্গালোর আশ্রমে উপস্থিত হইলাম তখন দেখিলাম, অনেক গণ্যমান্য সরকারী-বেসরকারী ভদ্রলোক রেলওয়ে প্লাটফরমে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বাঙ্গালোর আশ্রম দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হন এবং বেলুড় মঠে স্বামী প্রেমানন্দজাকে পত্রে আশ্রম ও উহার কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে

আদেশ করেন। অস্পৃশ্য জাতির জন্য স্বামী নির্মলানন্দের সেবাকার্য্য অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার খুব প্রশংসা করিতেন। অসাধারণ যোগ্যতা লইয়া স্বামী নির্মলানন্দ আশ্রমবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে অতিশয় মনযোগী হইতেন। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণের যথাযোগ্য প্রতিনিধিরূপে মান্য করিতেন। তিনি আমাদিগকে বলিতেন যে, মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র, তিনি সংসারী লোকের পোষ্য পুত্রতুল্য নহেন; কিন্তু ঠাকুরের আধ্যাত্মিকতার সুযোগ্য অধিকারী, তিনি অধ্যাত্ম বিরাট পুরুষ। তিনি নিজে সকালে ও সন্ধ্যায় মহারাজকে ভূমিষ্ট প্রণাম করিতেন এবং তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেন ও প্রায়ই তাঁহার সন্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইতেন। একাধিকবার তিনি আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন যে, মহারাজকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন সময়ে মহারাজ ও ঠাকুরের মধ্যে কোনো প্রভেদ না করি। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—মহারাজের স্থূলদেহে সাক্ষাৎ ঠাকুর বিরাজমান। আমরা দেখিয়াছি—বাঙ্গালোর মধ্যে যে সকল অস্পৃশ্য নরনারী আসিত স্বামী নির্মলানন্দ তাহাদের প্রতি কত সদয় ও সস্নেহ আচরণ করিতেন। মঠের পাচক ভৃত্যরাও তাঁহাকে খুব পছন্দ করিত।

"একটি ঘটনা ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত এবং পুণ্যস্মৃতি স্বরূপ আমি উল্লেখ করিতেছি, যখন আমি বাঙ্গালোর মঠে গিয়াছিলাম তখন আমার হাতে একশত ত্রিশ টাকা ছিল। পাছে এই টাকা হারাইয়া যায় এজন্য আমি তাঁহার নিকট উহা জমা রাখিয়াছিলাম। তাহার নিকট টাকা চাহিয়া আমি মাঝে মাঝে কাপড়, জুতা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়াছিলাম। আমি যখন চাহিতাম তখন তিনি আমাকে টাকা দিতেন। দুই মাস পরে মহারাজ আমাকে দক্ষিণ ভারতের তীর্থ সমূহ দর্শন করিতে একাকী যাইতে আদেশ করেন। যখন আমি স্বামী নির্মলানন্দের নিকট আমার অবশিষ্ঠ টাকা চাহিলাম। আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলাম, তিনি আমাকে পুরা একশত ত্রিশ টাকাই দিলেন। আমি চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে পুরা একশত ত্রিশ টাকা দিলেন কেন? মনে হয় আমি প্রায় ত্রিশ চল্লিশ টাকা খরচ করিয়াছিলাম এবং আপনি আমাকে সেই টাকা দিয়াছিলেন, আপনি ইহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন দেখিতেছি,"। স্বামী নির্মলানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ঠাকুরের টাকাই নিয়েছ, আমার টাকা নয়, তোমার সব টাকা জমা আছে,"

তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "কিরূপে আমি ঠাকুরের টাকা লইতে পারি ?" তিনি বলিলেন, আরে! তুমি এই আশ্রমে এসেছিলে, ঠাকুরই এইসব খরচ চালিয়ে দিয়েছেন। আমি তাতে হস্তক্ষেপ করবো না এবং আমি টাকা নিতে পারি না। তখন আমি তাহাকে অনুরোধ জানাইলাম—ঠাকুর সেবার জন্য পঞ্চাশ টাকা গ্রহণ করিতে। তিনি উহা করজোড়ে ফেরৎ দিলেন এবং প্রীতিমধুর ও সুকোমল কণ্ঠস্বরে বলিলেন, আমরা সকলে তাঁর সন্তান। তুমি অন্য কিছু ভেবোনা। মহারাজের নির্দেশ অনুসারে তোমাকে তীর্থ ভ্রমণে যেতে হবে। তুমি একাকী বিদেশ ভ্রমণ করবে। সেজন্য এখানে এই টাকা থেকে এক পয়সাও দিওনা। যদি তুমি মহারাজের উপদেশ যথাযথ পালন কর তাহলে ঠাকুর প্রীত হবেন। ঠাকুরকে টাকা বা অন্য কিছু দেওয়া অপেক্ষা তাঁর সন্তানদের আদেশ পালনে অধিকতর কল্যাণ হয়। তুমি এইজন্য আর মাথা ঘামিও না। যদি কোনো মুস্কিলে পড় আমাকে নিঃসঙ্কোচে লিখিবে এবং আমি সানন্দে তোমার জন্য কিছু করতে চেষ্টা করবো, তিনি নিজ আশ্রম ও ভক্তদের কল্যাণার্থ অনেক কিছু গোপনে করিতেন। তিনি নাম-যশ অবজ্ঞা করিতেন। তিনি ভিতরে ও বাহিরে সাধুই ছিলেন। তিনি এত সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন যে, লোকে কল্পনা করিতেই পারিতনা, তাঁহার মত পদস্থ প্রবীণ সন্ন্যাসী এইরূপভাবে থাকিতে পারেন! নাম, যশ বা অর্থের জন্য তাঁহার কোনোই আকাঙ্খা ছিলনা। ফল-ফুলের বাগানের কাজ করিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। বাগানের কাজে অনেক সময় কাটাইয়া আশ্রমস্থ সাধুভক্তদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া এবং বহু সত্যান্বেষীকে উচ্চ সত্যের সন্ধান দিয়া সত্যই তিনি সহজ জীবন যাপন ও উচ্চ তত্ত্বচিন্তনে অভ্যস্ত সন্ন্যাসী ছিলেন।"

সাঁইত্রিশ

পত্রমালা

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন
হাটখোলা, উয়ারি, পোষ্ট
ঢাকা

পরম কল্যাণীয়া অন্নপূর্ণা

মা, তোমার পত্র এখানে আসিয়া পাইলাম। তোমরা সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় শারীরিক ও মানসিক ভাল আছ জানিয়া পরম সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করুন ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে তোমাদের অচল অটল বিশ্বাস ও ভক্তি হউক—ইহাই তাঁহার শ্রীচরণকমলে প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও তোমার ইষ্টমূর্ত্তি উভয়ই এক ; কেবল মূর্ত্তির প্রভেদ। একের ধ্যান করিলেই উভয়েরই ধ্যান করা হয়। একজনকে পাইলে উভয়কেই পাওয়া যায়। ঠাকুরকে ধ্যান করিতে পারলেই ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যান করা হয়। কারণ তাঁহার ভিতরেই ইষ্টমূর্ত্তি বিরাজমান। অতএব ঠাকুরকে ধ্যান করলেই সব করা হবে। জপ যেভাবে করিতেছ সেইভাবে করিলেই হবে।

তোমার সেজো মেয়ে স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়াছে জানিয় বড়ই সুখী হইলাম। তাহাকে সেই মন্ত্রই জপ করতে বলিবে। সে যেন ঐ মন্ত্র কাহারও নিকট না বলে। তাঁহাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিবে।

রাত্রে জাগ্রত অবস্থায় যাহা শুনিয়াছ, তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা। তিনি যথাসময়ে দর্শন দিবেন। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করিওনা। তাঁহার শ্রীচরণকমলে সর্বদা প্রার্থনা করিবে, যাহাতে তোমার হৃদয়ে তিনি খুব ভক্তি বিশ্বাস দেন, আর কিছুই প্রার্থনা করিতে হইবে না। ভক্তি-বিশ্বাস হইলেই তাঁর দেখা পাওয়া যায় ও তিনি যথাসময়ে দর্শন দিবেন। তোমাদের ওখানে শীঘ্রই যাইব, এইরূপ আশা আছে। আমার স্নেহাশীর্বাদ তুমি জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্খী—
নির্মলানন্দ

(১)

রামকৃষ্ণ মিশন
পোষ্ট উয়ারী, ঢাকা
২৭শে মাঘ

কল্যাণীয়াসু

শ্রীমতী মা অন্নপূর্ণা, স্নেহলতা, শিবু ও দুর্গা—তোমাদের পত্র পাইয়াছি ও তোমরা সকলে ভাল আছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। শ্রীমান বিটুনের উপনয়ন শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় মঙ্গলমত সম্পন্ন হইয়া যাইবে। আমি ঐ সময় উপস্থিত থাকিতে পারিব না বলিয়া দুঃখিত হইওনা। তুমি শুধু তোমার ইষ্ট দেবের পূজা-ধ্যান ইত্যাদি করিবে। অন্যান্য পূজাদির প্রয়োজন হবে না। গাছের মূলে জলসেচন করিলে উহার অন্যান্য অংশ জল পায় ও বেঁচে থাকে। সমস্ত অংশে জলসেচনের আবশ্যক হয় না।

অন্যলোকের কথায় বিচলিত হইওনা; আমি যাহা বলিতেছি সেইমত কাজ করিয়া যাও, সকামভাবে কোন পূজা অর্চনাদি করিবে না। সমস্ত কাজই নিষ্কামভাবে করিবে ও উহার ফলাফল ভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করিবে; তাতেই তোমাদের সকলের মঙ্গল হইবে। আমি মার্চ মাসে তোমাদের ওখানে পৌছিব। সরস্বতী পূজা পর্য্যন্ত আমি এখানে আছি। আমার শরীর তত ভাল নয়। আমার সময়ও খুব কম, কাজেই সকলের কাছে ভিন্ন ভিন্ন পত্র লিখিতে পারিলাম না। তোমরা সকলে আমার স্নেহ ও আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

চির শুভানুধ্যায়ী—
নির্মলানন্দ

(৩)

রামকৃষ্ণ মিশন
পোষ্ট উয়ারী, ঢাকা

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী

মা অন্নপূর্ণা, তোমার পত্র যথা সময়ে পাইয়াছি। তোমরা কুশলে আছ জানিয়া বড় সুখী হইলাম। তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ তাহা মিথ্যা নয়। চণ্ডীতে আছে, প্রত্যেক স্ত্রীমূর্ত্তি মা জগদম্বার রূপ ও তাঁর অংশ। আমাদের ঠাকুরও সকল স্ত্রীতেই জগদম্বার অংশ ও রূপ দেখিতে পাইতেন। উহা তাঁহার জীবনীতে পড়িয়া থাকিবে; আবার পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালী হইয়াছেন ও শ্রীমতী রাধা তার চরণে ফুলচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন। ঐরূপ স্বপ্ন দেখিলে কোন ভয় পাইও না। তিনি তোমাকে দেখাইতেছেন যে, সর্বভূতে তিনিই ব্যাপ্ত ও তিনিই সর্বদেবীরূপ ধারণ করিয়াছেন। ঐরূপ দেখাইয়া শিক্ষা দিতেছেন।

পুনশ্চ, আমি ৺কামাখ্যাদেবী দর্শনে যাইব মনে করিয়া ছিলাম। এবার ঘটিয়া উঠিল না। আমি ২০শে নাগাদ কলিকাতা পৌঁছিব। আমার ঠিকানা স্নেহের—পত্রে দিয়াছি। ঐ ঠিকানায় পত্র দিলে আমার নিকট পৌঁছিবে। আমার আশীর্বাদ বাটীর সকলকে জানাবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী—
নির্মলানন্দ

(৪)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

ব্যাঙ্গালোর

৩০।৮।৩৩

স্নেহের—

তোমার চিঠি আজ কয়েকদিন হলো পেয়েছি। তোমার শরীর ভাল নয় জেনে বড়ই দুঃখিত ও চিন্তিত। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে শীঘ্র ভাল করে দিন এই প্রার্থনা করি। ডাক্তার দুর্গাপদবাবুকে দেখাইবে ও ভাল একটা ঔষধ খাবার বন্দবস্ত করিবে, যাতে অসুখ শীঘ্র ভাল হয়ে যায়। রোগ পুষে রেখে শরীরকে অবহেলা করা ভাল নয়। তোমরা জন্মাষ্টীর উৎসব মঠে, গৌরীদের বাড়ীতে ও কাঁকুড়গাছিতে দেখতে গিয়েছিলে ও দেখে শুনে বেশ আনন্দ পেয়েছ জানিয়া বড়ই আনন্দিত হয়েছি।

এই সংসারে দুঃখকষ্ট নেই, এমন কোন লোকই নেই ; তবে কারুর বেশী, কারুর কম ; আর এক এক জনের এক এক রকমের, এই কেবল তফাৎ। যারা দুঃখ ও কষ্টকে ভয় করে তারা বাড়ার ভাগ একটু বেশী যন্ত্রণা পায়। আর যারা তাতে ভয় পায় না ও ভগবানকে প্রাণমণে স্মরণ করে, তারাই শান্তি পায়—তারাই জিতে যায় ও তারাই দুঃখ-কষ্টের ভেতর থাকলেও বাহিরে বেশ হাসি মুখে থাকে। মা, তুমি সর্বদা ঠাকুরকে চিন্তা করবে—দুঃখই হোক, আর সুখই হোক। তাহলেই মনে শান্তি পাবে ও নির্ভয়ে থাকতে পারবে। তোমার ভয় কি? ঠাকুর তোমাকে রক্ষা করছেন। তাঁর কৃপায় বেশ শান্তিতে থাকবে।

এখানে একপ্রকার সব ভাল। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জনিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী—

নির্মলানন্দ

(৫)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

ব্যাঙ্গালোর
৪।৭।৩৩

স্নেহের—

তোমার চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছি। কিন্তু জবাব দিতে কেন দেরী হয় তা তুমি বেশ জান, তাই আর লিখলুম না। মা, তোমার চিঠি পড়ে খুব খুসী হয়েছি। তুমি সব আমাকে খুলেই লিখেছ। সে খুব ভালই করেছ। কোনে সঙ্কোচ করবে না। তুমি যা কিছু করেছ তা অন্যায় হয়নি। সব যুক্তিযুক্তই হয়েছে। কোন লোকের কথায় কান দিতে নেই। তারা হিংসা-দ্বেষ ও ঈর্ষ্যাতে ভরা। তারা যে যা বলে বলুক তাতে তুমি দুঃখিত হয়ো না। তারা নিজের দুষ্কর্মের ফল নিজেই ভোগ করবে।

তোমার ভয় কি? ঠাকুর তোমার সহায় রয়েছেন। তিনি তোমাকে সর্বদা দেখছেন ও রক্ষা করছেন। তাঁর উপর খুব বিশ্বাস করে গাঁট হয়ে বসে থাক। যখন পরের কথায় দুঃখ ও মন খারাপ হবে তখন মনে মনে খুব তাঁকে ডাকবে ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। তাহতেই মনে খুব জোর পাবে, মনে খুব শান্তি পাবে। তাঁর দয়া—অনুগ্রহ তোমার উপরে খুব আছে—আমি জানি, তাই আমি বলছি। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর। তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি নির্ভয়ে থাক।

আজ এক সপ্তাহের উপর হলো আমি এখানে এসেছি। শরীর একরকম মন্দ নয়। এখানে এখন বেশ ঠাণ্ডা ও স্বাস্থ্য ভাল। মনে হয় ২।৩ মাস বিশ্রাম করলেই শরীরটা ভাল হতে পারে। কমল, ইন্দিরা ভাল আছে ও আমার কথা বলে শুনে ভারী সুখী হয়েছি। তাদের আমার স্নেহ-আদর জানাবে। তুমি আমার স্নেহ ও শুভাশীষ জানবে ও সকলকে জানাবে। এখানে একপ্রকার সব মঙ্গল। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী—
নির্মলানন্দ

(৬)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বুলটেম্পল রোড
বশুভাগগুড়ী, ব্যাঙ্গালোর সিটি
১০ই আগষ্ট, ১৯১২

স্নেহের সতীন্দ্র,

তোমার পত্রসহ বেলুড় মঠের পুরাতন Group [গ্রুপ] ফটো পাইয়া সুখী। আরও বেশী সুখী হইলাম, তোমার শরীর পূর্বাপেক্ষা ক্রমশঃ ভালর দিকে যাইতেছে জানিয়া। ঠাকুর শীঘ্র তোমাকে পূর্ববৎ সুস্থ ও সবল করুন, এই প্রার্থনা করি। এখানে এখন বেশ শীত পড়িয়াছে। দিনের বেলায় গরম জামা ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু এখন স্বাস্থ্য এবৎসর তত ভাল নয়। চারিদিকেই সর্দিজ্বর অর্থাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা মত কতকটা হচ্ছে। নলিনীর শরীরটাও একটু ম্যাজ ম্যাজ করছে। সে আজ জোলাপ নিয়েছে। আমার শরীর একপ্রকার ভালই আছে ও অপরাপর সকলে ভালই আছে।

তোমাকে আমাদের কলিকাতার নূতন মঠে আমাদের সকলের (সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের) বাহিরের সহিত (সাবিত্রী সম্মেলনী বিদ্যালয় ইত্যাদি) কিরূপ ভাবে সংশ্রব রাখা উচিত সেই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিতেছি। বিশেষ করিয়া চিন্তা ও অনুধাবন করিয়া দেখিবে। প্রথমতঃ ঐগুলির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বিশেষভাবে জানি ও বুঝি ও তাহা কখনও অস্বীকার করি না। আমরা সন্ন্যাসী, আমাদের ঐ সব কাজের সঙ্গে direct (সাক্ষাৎ) কোন সম্বন্ধ রাখা (যেমন উহাদের কমিটির মেম্বর হওয়া বা অপরাপর সময়ে ঐ সংক্রান্ত কাজকর্মের দরুণ বা কাজের অছিলায় ঐ সব স্ত্রীলোকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা কিংবা স্ত্রী মেম্বরের বাড়ী গিয়া পরামর্শ বা আলাপ-পরিচয় করা ইত্যাদি) আমার ক্ষুদ্র মতে উচিত বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের যদি ঐ সকল কাজে সহায়তা করিতে হয়, বা করিবার ঐকান্তিক ও তীব্র ইচ্ছা থাকে তাহা ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে না আসিয়া দূরে থাকিয়া সমস্ত প্রকার সাহায্যই আমরা করিতে পারি। Direct (সাক্ষাৎ) সম্বন্ধে ঐসব কাজের জন্য ডাক্তার দুর্গাপদ, মাখনবাবু, কিরণবাবু, যতীনবাবু প্রভৃতি মিশনের সুযোগ্য গৃহস্থ মেম্বরেরা থাকিলেই শোভনীয় ও নির্দোষ হয়; সাধারণের সমালোচনার গণ্ডীর বাহিরে থাকিয়া কাজটি সুচারুভাবে চলিতে পারে। আমার যতদূর ঠাকুর স্বামিজীর এইরূপ কাজের সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত জানা আছে তাতে তাঁদের বিশেষভাবে

তফাৎ থেকে সহায়তা করার নির্দেশ ও উপদেশ আছে—ঘনিষ্ঠভাবে নয়। আজকালকার হালফ্যাসানের মতন যে কোনই movement (আন্দোলন) হোক না কেন তাতে দু'চারজন স্বামী নামধারী থাকা যেন একটা indispensible factor (অপরিহার্য্য অঙ্গ) তা না থাকলে যেন সেই movement (আন্দোলন) সেই সব নামের অযোগ্য (যেমন শ্রমিকদল, ধর্মঘটদল; স্বরাজ, স্বদেশী, সমাজসংস্কার, বিধবাবিবাহ, শিশুপালন ইত্যাদি)। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত যে সব সন্ন্যাসী তাঁদের আদর্শ হালফ্যাসানের সন্ন্যাসীদের মত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়, আমরা ঐরূপ হলে আমাদের সন্ন্যাসগ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র। নিবেদিতা স্কুল যখন প্রথম আরম্ভ হয় তখন আমি স্বামিজীর নিকট ছিলাম ও তিনি কিরূপ কঠোর নিয়মাবলী ঐ স্কুলে চালান উচিত সেই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন তাহা সব শুনিয়াছিলাম। আমি যাহা লিখিলাম তাহা সেই উপদেশের আংশিক ছায়া মাত্র। আমরা যদি তাঁহার আদিষ্ট উপদেশে চলিতে পারি, বা চেষ্টা করি তাহলে আমাদের সর্বতোভাবে কল্যাণ হবে। আর যদি স্বেচ্ছানুযায়ী কাজ করি তা হলে নিজেদের ঘাড়ে দায়িত্ব নিয়ে তার বিষময় পরিণাম ভোগ করতে হবে। যেটা যে ভাবের কাজ তার ভালমন্দ বিচার করে আমাদের সন্ন্যাসজীবনের সহিত ঐসব কাজের সহিত কোন অংশে কতটুকু খাপ খায় ও আমাদের ঐ কাজ বিশেষের কতটুকু সম্পর্ক ও সংশ্রব রাখলে নির্দোষ হয়, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অন্যথা করিলে পথভ্রষ্ট হওয়ার ও অনিষ্টলাভের আশঙ্কা থাকে। বেশী আর কি লিখিব। খুব সাবধানে থাকিবে। আমার অভিমত যা লিখেছি জীবন্মুক্ত প্রভৃতি সকলকে জানাবে ও তাঁরা যেন আমার কথার যৌক্তিকতা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখেন। আমরা যেন impulsive emotion ও sentiment (প্রবল ভাবুকতা) এর দাসত্ব করে পতিত না হই। আমার আন্তরিক স্নেহ ও শুভাশীষ তুমি জানিবে। মঠস্থ সকলকে ও তথাকার স্ত্রী-পুরুষ ভক্তদিগকে জানাবে। সেওয়ানের অন্নপূর্ণা ভয়ানক ম্যালেরিয়ায় ভুগে তাড়াতাড়ি নারায়ণপুর থেকে চলে গিয়েছে। সেওয়ান থেকে চিঠি পেয়েছি। তারা এখনও ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী—

নির্মলানন্দ

(৭)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বুলটেম্পল রোড, বাসাভাঙ্গুডি

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা ব্যাঙ্গালোর
২৭শে জুন, ১৯৩১

শ্রীযুক্ত হরপার্বতী বাবু,

আপনার ১৬ই জুন তারিখের প্রীতি ও ভালবাসাপূর্ণ পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। ঈশ্বরানুগ্রহে আপনারা সপরিবারে কুশলে আছেন অবগত হইয়া বিশেষ সুখী। শ্রীভগবান আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন ও আপনাদিগকে পরমানন্দে ও পরম শান্তিতে রাখুন—ইহাই প্রার্থনা করি।

কার্য্য-কারণের নিয়মাধীনে জাগতিক যতকিছু ব্যাপার—ইহা একটি নৈসর্গিক মূল সত্য। আসৃষ্টি হইতে ঐ নিয়মের কখনও ব্যতিক্রম হয়নি ও কখনও হইবেনা। সৃষ্টি আবার প্রবাহরূপে অনাদি—অনন্ত। মানুষ কর্মের দ্বারা ঐ কার্য্য-কারণ নিয়মাধীনে নিজের আবরণ-জাল সৃষ্টি করে, আবার তাতেই বদ্ধ। বন্ধন কেহ ভালবাসে না। মুক্তিই সকলে চায়। কিন্তু এই মহামায়ার মোহের এমনি বন্ধন যে, কদাচিৎ লোকের ঐ জাল ছিড়বার ইচ্ছা হয়। ঐরূপ প্রকৃতির লোক বিরল। তাদের ভেতর কোন কোন লোক কখন কখন কোন এক অজ্ঞেয় দৈবী শক্তির প্রভাবে ঐ জাল ছিঁড়ে ফেলতে সক্ষম হয়। তখন তাঁরা নিজের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি করে ও তাই ঐ কথা বলেছে—'ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি' ইত্যাদি। ঐটি সকল শাস্ত্রের সার, আসল ও শেষ কথা। উহা অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ। তাই উহার ভিতর এত উদ্বোধনী শক্তি নিহিত যে, উচ্চারণ করিলেই হৃদয়তন্ত্রী বেজে ওঠে। ঐরূপ অনুভূতি হওয়ার সুযোগ ও সময় সাপেক্ষ!

দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে কর্মের ফল বিভিন্ন সময়ে বিশেষ অবস্থায় লাভ হয়ে থাকে। একভাবে, একসময়ে সকলের হয় না। সেইজন্য ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয়। অধীর হলে কাজ হয় না। তাই বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে চুপ করে বসে থাকলেও চলবে না। লেগে পড়ে থাকতে হবে। নিষ্ঠা ও চেষ্টা রাখতে হবে। ঠাকুর "খান্দানী" চাষীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন, সে চাষ ছাড়া অন্য পেশা

বা speculation (ভাবনা) করেন না, বা জানেনা, তাতেই লেগে পড়ে থাকে ; তা সুবৃষ্টিই হোক আর অনাবৃষ্টিই হোক। যথাসময়ে ফলপ্রসব করবে—এই ভেবে ব্যবস্থিতমনা হয়ে কাজ করে যায়। এই সময়ের জন্য ধীর ভাবে অপেক্ষা করা ভাল।

দোষ-ত্রুটির কথা লিখেছেন। সে তো আমাদের সকলেরই আছে। তা না থাকলে আমাদের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা বা ইচ্ছা হবে কেন? ঠাকুর বলিতেন, "খাদ না হইলে গড়ন হয় না"। আমরা যত কাজ বা যা কিছু করি সবই ভাল-মন্দের সংমিশ্রণ। কোনটিই একেবারে দোষশূন্য নয়। আর ঐ ভাল-মন্দ উভয়কাজেই ব্যর্থ বা নিষ্প্রয়োজন নয়। উভয়ই মানুষের ভিতর কার্য্যকারিতা শক্তি উৎপন্ন করে মানুষকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ এই মানুষের ভেতর যে আসল মানুষ আছে তার সন্ধান বলে দেয়। পুরো সন্ধান পেলেই সেই আসল মনুষ্যত্বের চরমাবস্থায় উপনীত হবার উপায় হয়, "ভবতি ক্রমশো বিস্তুতমো জনঃ।" এসবই সময় সাপেক্ষ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ক্রম বিকাশবাদীদের কেহ কেহ বলেন যে, এই সৃষ্টির একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। সকলেই যথাসময়ে ও যথাক্রমে সেই নির্দিষ্ট অবস্থাতে উপনীত হবে। অতএব তাঁদের মত সৃষ্টি অনাদি—অনন্ত নয়, সাদি ও সান্ত। একদিন সৃষ্টির পূর্ণাবসান হবে, যেদিন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছিবে। আর্য্য ঋষিদের সিদ্ধান্ত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁদের মতে এই সৃষ্টি প্রবাহ-রূপে নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। ইহার কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নাই, ইহা লীলা-ময়ের লীলা, তিনি আপ্তকাম। সুতরাং তাঁহাতে ইচ্ছা বা অভাব নাই ; উভয়েই এক। যে খেলছে ও যে খেলাচ্ছে তারা উভয়েই এক। তবে খেলুড়ে অজ্ঞান অবস্থায় সেটা প্রথমে বোঝেনা, তাই তার কষ্ট, সে যদি খেলা ভালো করে তো সুখী হয়, মন্দ করলে দুঃখী। ভালতে তার ভালবাসা—আসক্তি জন্মায়, মন্দতে বিরাগ ; এই মন্দ-ভালর সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে ধাক্কা খেতে খেতে দৈবাৎ একদিন অনুভূতি কোন দৈবীশক্তি প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে খেলার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। যন্ত্র ও যন্ত্রীর স্বরূপ জ্ঞান তার হয়। তখন লীলাময়ের ওপর তার এক নূতন রকমের ভালবাসা জন্মায়, যার আস্বাদন ইতঃপূর্বে জীবনে কখনো অনুভব হয়নি। তারপর সে বুঝতে পারে, সংসারের তথাকথিত ভালবাসাটাই কেবল ঐ ভালবাসারই ছায়া মাত্র ; আর কিছু নয়। এই সময়

থেকে তার খেলাটা রূপান্তর ধারণ করে, পূর্বের খেলা আর থাকে না। সে খেললেও এখন তার কষ্ট হয় না। সে এখন বুড়ী ছুঁয়ে খেলছে। এই বুড়ি ছোঁয়া ব্যাপারটা সময় সাপেক্ষ। আজ এই পর্য্যন্ত, আবার যদি সময় পাইতো কিছু লেখবার ইচ্ছা রইল। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছাদি জানিবেন। ইতি

শুভানুধ্যায়ী—
নির্মলানন্দ

(৮)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বুল টেম্পল রোড,
বাসাসঙ্গুডি, ব্যাঙ্গালোর

স্নেহের সতীন্দ্র,

তোমার ৪।৯ তারিখের পোষ্টকার্ড ও ৫।৯ তারিখের চিঠি যথা সময়ে পাইয়াছি। তুমি পূর্বাপেক্ষা ভাল বোধ করিতেছ জানিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত ও সুখী। ঠাকুর তোমাকে শীঘ্র ভাল করে দিন—এই প্রার্থনা করি।

তুমি আমার আগেকার চিঠিগুলি পরপর যথাসময়ে আশা করি পাইয়া থাকিবে ও তাহাতে মঠ ও মিশন পরিচালনের জন্য যে সব Suggestion (পরামর্শ) দিয়েছি তাহা ভূমানন্দ, গণেন প্রভৃতিকে জানাইয়া থাকিবে। মঠে সাধুরা থাকিতে হইলে তাহাদিগকে সদাচার সম্পন্ন ও চরিত্রবান হইয়া চলিতে হইবে। যিনি যত বড়ই হউন না কেন, যদি ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হয়েন তাহলে তাঁকে মঠের সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইবে। যদি স্বেচ্ছায় না করেন তাহলে মঠের নিয়মাবলী তাঁহাকে বাহিরে থাকিতে বাধ্য করিবে। মঠেও থাকিব ও যা ইচ্ছা তা করিব, মঠের আদর্শ ও নিয়ম প্রতিপালন করিব না—ইহা একেবারে অসম্ভব। তুমি চিন্তিত হয়ো না; একা হইলেও তুমি সত্যনিষ্ঠ ও সত্যসংকল্প। ঠাকুর তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে তোমাকে

চালাচ্ছেন। তুমি নির্ভিক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে, সঙ্গী জোটে না জোটে একাই কর খেলা। নলিনীকে না পাঠানই ভাল। সে এখানে যে ভাবে আছে সেই ভাবেই থাকা ভাল। বোধ হয়, সে ১২।১৩ তারিখ নাগাদ উটি থেকে ফিরবে। তারও নূতন মঠে যাবার তত ইচ্ছে নেই এবং তাঁর সাহসও নেই। সে ঐসব ঝগড়া-ঝাঁটিতে ভয় পায়। আমাদের মোকদ্দমার তারিখ ১৭ই সেপ্টেম্বর। ঐ তারিখের পর যা হয় মোকদ্দমা সম্বন্ধে একটা ঠিক হবে। আমাদের ইচ্ছা—যদি ঐ তারিখের পর এখানে থাকার বিশেষ প্রয়োজন না থাকে তাহলে সম্ভবতঃ আমি পূজার পূর্বেই কলিকাতা যাইয়া যথাযথ মঠের পরিচালনার জন্য সকলে মিশে পরামর্শ করে একটা বিধি-ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করব। ঠাকুর আমাদের সহায় হউন। আমরা যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী।

ওখানে জন্মাষ্টমীর উৎসব বেশ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে শুনে বড়ই সুখী। ঠাকুরের কৃপায় ধীরে ধীরে সবকাজই সুসম্পন্ন হবে। প্রথম চোটেই খুব বাহ্যাড়ম্বর করা ভাল নয়। কারুর নিকট টাকা চাওয়া হয়নি শুনে বড়ই সুখী হয়েছি। তাঁর কৃপায় খরচের কোন অনটন না হয়ে উল্টে চার টাকা বেঁচেছে—এটা খুব ভাল হয়েছে। "জয় গুরুমহারাজের জয়।"

হরিপদবাবু ও তাঁদের বাড়ীর সকলকে, ভূমানন্দ, গণেন, নেকোদের বাড়ীর, নিত্যানন্দ, শান্তিরাম, মানুদের বাড়ী, পতাদের বাড়ী ও জুলুবাবুদের সকলকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিও। ভুদি, মাখন সেন, গিরিজাশঙ্কর, ডাক্তার ও তাদের বাড়ীর সকলকে আশীর্ব্বাদ জানাবে।

এদেশের ছেলে ওখানে গিয়ে কাজ করতে পারা বড় মুস্কিল। তারা আমাদের চালচলন, ভাষা কিছুই বুঝবে না এবং একা একা ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। তার চেয়ে ঢাকা, মৈমনসিং অঞ্চলের ছেলে ছোক্‌রা হলে ভাল হবে আমার মনে হয়। যদি শীঘ্র এবার কলিকাতা যাওয়া হয় তাহলে সেই সম্বন্ধে একটা যা হয় ঠিক করা যাবে! এখানে একপ্রকার সমস্ত মঙ্গল। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ জানিবে ও গোপাল প্রভৃতিকে জানাইবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী—

নির্মলানন্দ

(৯)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বুলটেম্পল রোড
বাসাভঙ্গুড়ি,
ব্যাঙ্গালোর

কল্যাণীয়া শ্রীমতী সরোজের মা

মা, তোমার কষ্ট ও শোক এত সুগভীর ও এত হৃদয় বিদারক যে, তাহা পুরুষের কথা দূরে থাকুক স্ত্রীলোকও যিনি সন্তানের মা হন নাই কখনও বুঝিতে পারিবেন না। এই বুকফাটা সন্তাপ ও অসহনীয় পুত্রশোক, যাতে তোমার হৃদয়কে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে দিয়েছে, এরূপ অবস্থায় আমি পুরুষ হয়ে তোমাকে কি বলে সান্তনা দিব তাহা আমার বুদ্ধি ও কল্পনার সীমার বাহিরে। এই দুর্বিসহ শোকের অপনোদন হওয়া অনেক সময় সাপেক্ষ; সহজে বা শীঘ্র ইহা যায় না। আমি ঠাকুরের নিকট একান্ত মনে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তোমার হৃদয়ে প্রভূত শান্তি দান করুন যাতে তুমি এই দারুণ শোকে একেবারে অভিভূত হইয়া না পড়। এই বিষম সঙ্কটে তিনিই আমাদের একমাত্র সম্বল, একমাত্র ভরসা। তাঁর নিকট প্রার্থনা কর। তিনি ত্রাণকর্ত্তা; তিনিই তোমার হৃদয়ে এই ঘোর কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি দিবেন। তাঁর কৃপায় তোমার শোকমগ্ন মন ধীরে ধীরে শান্ত হবে। মানুষের কথা বা সান্তনায় কি হয়? এই শোকাগ্নি নিবারণ মানুষের শক্তির বাহিরে।

তোমার অপরাপর সন্ততির দিকে চাহিয়া বুক বাঁধিয়া সংসারে কর্ত্তব্য করিয়া যাও; অন্যথা কর্ত্তব্য অবহেলায় ভগবানের অন্য সন্তানগুলির কষ্ট হবে। সবগুলিই তাঁর সন্তান, তোমার নিকট গচ্ছিত রেখেছেন লালনপালনের জন্য। সময় নেই, অসময় নেই, তাঁর দরকার হলেই তাঁর জিনিষ তিনি নিয়ে নেবেন। আমরা ইচ্ছা করলেই বা কি হবে? আমাদের কি তাতে অধিকার আছে? তাঁর গাছ; সেই গাছে ফল ফলেছে। এখন তাঁর যদি ইচ্ছা হয় দুটো কাঁচা ফল তুলিবার তাতে আমাদের ওজর, আপত্তি বা অধিকার কি আছে? যদি তাঁর না হয়ে আমাদের হতো তাহ'লে নিশ্চয়ই আমরা রক্ষা করিতে

পারিতাম। তাতো আমরা এই সংসারে নিত্যই দেখিতে পাই, শত চেষ্টা করেও রক্ষা করতে পারি না। জন্ম, মরণ এসব তাঁর হাতে; এতে আমাদের হাত নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তুমি তাঁকে ডাকিলেই তিনি তোমার মনে শান্তি দিবেন।

অধিক আর কি লিখিব। মা, তুমিতো সাধারণ সংসারে ঘোর আবদ্ধ স্ত্রীলোকের মত নও। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বরে ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাস খুব আছে। তুমি সাধারণ স্ত্রীলোকের মত বিহ্বল হলে চলিবে কেন, তুমি এমন ধীর ও গম্ভীরভাবে আচরণ কর, যাতে তোমাকে আর দশজনে দেখে, তোমাকে দৃষ্টান্তস্থল করে উপকৃত হবে। তোমার কাছে অনেক শোকাতুরা এলে শান্তি পাবে।

আশাকরি, তোমার নিকট এই পত্র পৌছিবার পর ঠাকুরের কৃপায় তোমার মন অনেকটা শান্ত হবে। এখানে একপ্রকার সমস্ত মঙ্গল। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ ও শুভাশীর্বাদ জানিবে ও অপরাপর সকলকে জানাইবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী—
নির্মলানন্দ

(১০)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ কমল ভরসা

ব্যাঙ্গালোর
১৫।৫।৩১

শ্রীমান সতীন্দ্র,

আশাকরি, তুমি ভাল আছ ও তোমার আমাশয় একেবারে সারিয়া গিয়াছে। আমি গতকল্য সকালে এখানে পৌছিয়াছি। পথে কোন কষ্ট হয়নি। পুরুষোত্তম আমার সঙ্গে এখানে এসেছিল। সে গতকল্য সন্ধ্যার সময় উটী* গিয়াছে। তার বাপ-মা গ্রীষ্মের সময় উটীতে change (বায়ুপরিবর্তন)-এ

* উতকামণ্ড

যাবার ইচ্ছা করিয়াছে। সেইজন্য সে ভাল বাড়ী ভাড়ার সন্ধান করিতে গিয়াছে। রসগোল্লা ও সন্দেশ সকলে খাইয়া সুখী হইয়াছে।

অনাথের গান শুনে বোম্বাইর লোক মুগ্ধ; তার ভারি সুখ্যাতি হয়েছে। সে এখনও বোম্বাইতে পুরুষোত্তমদের বাড়ীতে রয়েছে। সম্ভবতঃ আরও এক সপ্তাহ পরে কলিকাতা ফিরে যাইবে। এখানে এখনও বৃষ্টি অভাবে ঠাণ্ডা তেমন পড়েনি। তবু বোম্বাইতে কলিকাতা অপেক্ষা অনেক ঠাণ্ডা। সম্ভবতঃ শীঘ্র বৃষ্টি হতে পারে।

আমার শরীর সেই এক রকম; বিশেষ কিছু খারাপ নয়। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে ও মঠের সকলকে জানাইবে। ভুমানন্দ, গণেন, কৃষ্ণলাল, দত্তবাড়ী, দুর্গা ডাক্তার ও তাদের বাড়ী, শান্তিরাম, তোমাদের ছোটদি ও জুলু প্রভৃতি সকলকে জানাবে। সরোজ, গৌরী ও তাদের বাড়ী ও অপরাপর সব ভক্তদের জানাইবে। এখানকার সব খরচ নলিনীর চিঠিতে পেয়েছ তাই আর লিখলুম না। মৈমনসিং-এর খবর জানা থাকিলে লিখবে। মনিঅর্ডার বোধ হয় এতদিনে পেয়ে থাকবে। এবছর এখানে আম খুব সস্তা; কিন্তু গরুর দুধ খুব কম; রোজ পাঁচপো বা দেড় সেরের বেশী পাওয়া যায় না। এই সময় দুধটা বেশী হলে বেশ মজা হোতো। ময়ুরের ছানাগুলি বেশ হয়েছে। খুব ফুর্তি করে বেড়ায়। হেঙ্কুটা* ভীষণ মোটা হয়েছে। কেবল পড়ে পড়ে ঘুমোয়। হরিপ্রেমের খবর কি? আশা করি, ভাল আছে। বেলুড়ের খবর যদি কিছু শুনে থাকো তো জানাবে। বশীকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। ললিত কি ওখানে আসে? এখানে সকলে ভাল আছে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—

নির্মলানন্দ

---

* শ্রীমৎ তুলসী মহারাজের পোষা কুকুরের নাম।

(১১)*

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বুল টেম্পল রোড, বাঙ্গালোর সিটি
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯১১

প্রিয় শ্রীনারায়ণ পিলে

তোমার ৮ তারিখের চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর মত মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণে আমাদের সকলের মর্মাহত হওয়া সম্পূর্ণ মানবোচিত। এই মহাক্ষতি অপূরণীয়, কিন্তু ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা। এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের যে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী আছে তৎদ্বারা বর্তমান সমস্যার সমাধান হইবে না। জাগতিক ঘটনাবলী ও আন্দোলনের পশ্চাতে এক দিব্য হস্ত ক্রীয়াশীল। যদি আমরা দৈনন্দিন জীবনের সর্বব্যাপারে এবং নৈসর্গিক দুর্ঘটনার মধ্যে ভাগবত কর্তৃত্ব অস্বীকার না করি তাহা হইলে আমাদের মানসিক সামঞ্জস্য ও শান্তিপ্রিয়তা অব্যাহত রাখিতে পারি। নচেৎ নহে। আগে বা পিছে আমাদের কার্য্যকাল ও কর্তব্যভার সমাপ্ত হইলেই ঠাকুর প্রত্যেককে ডাকিয়া পাঠাইবেন। যা ভবিতব্য তা অখণ্ডনীয়। তাঁহার ডাকে সত্বর সাড়া দিবার জন্য আমাদের প্রত্যেকের সতত প্রস্তুত থাকা দরকার। যে কোন মুহূর্তে আমাদের অজ্ঞাতসারে সেই অনিবার্য্য আহ্বান আসিতে পারে।

ওখানে আশ্রমের কাজ ভালভাবে চলিতেছে জানিয়া সুখী হয়েছি। তুমি আমার ভালবাসা জানিবে এবং ভক্ত নীলকণ্ঠ ও অন্যান্য বন্ধুবর্গকে দিবে। ইতি

তোমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ পদাশ্রিত
নির্মলানন্দ

(১২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ-কমল ভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বুলটেম্পল রোড, বাসাভাঙ্গুডি
বাঙ্গালোর
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

স্নেহের সতীন্দ্র,

তোমার ৯ই তারিখের পত্র গতকল্য পাইয়াছি। তোমার ২৭, ৩১, ৪ঠা ও ৫ই তারিখের পত্রগুলি পরের পর যথা সময়ে পেয়েছি ও প্রত্যেক চিঠিরই জবাব দিয়েছি। তুমি কি সে সব পত্র পাওনি ? তোমার কোন চিঠিতে আমার চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ ও তাহার তারিখ মোটেই উল্লেখ কর নাই। সেইজন্য আমার মনে হয়—আমার চিঠি হয়ত মারা গিয়ে থাকবে। আমি তোমার প্রত্যেক চিঠির জবাব দেবার সময় তারিখটা লিখতে কখনও ভুলি না। তুমি এই চিঠির জবাব দেবার সময় আগে পর্য্যন্ত, আগষ্ট মাসের শেষাশেষী থেকে কতগুলি চিঠি ও সেই সেই চিঠির কি কি তারিখ তা আমাকে জানাতে ভুলো না। ২৭ ও ৩১ আগষ্ট তো অনেক দিনের কথা, তার জবাব কি আদো পাওনি ? যদি না পেয়ে থাকো তো সে পত্রগুলি নিশ্চয়ই মারা গিয়েছে। ওখানে যখন ডাক আসে তখন চিঠিপত্র গ্রহণ করে কে ?

আমরা কাহাকেও জোর ক'রে রাখতে পারবো না। যার যেমন অভিরুচি সে তেমন করুক। তবে মঠে থাকতে হ'লে মঠের আদর্শ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও পবিত্রতা রক্ষা করে তবে মঠে থাকা হতে পারে। যারা তা করতে রাজী হবে না, তারা স্বাধীনভাবে থেকে যা ইচ্ছা তাই করুক। আমরা তাদের কোন কথাই বলবো না ও তাদের কোন সংশ্রবেই থাকবো না। তুমি ভয় পাইও না ও চিন্তিত হইও না। আমি যতশীঘ্র পারি কলিকাতায় যাইবার চেষ্টা করিতেছি। ঠাকুরের কাজ তিনি নিজেই করেন। আমি একবার বাঙ্গালোর আশ্রম একা চার মাস চালাইয়াছিলাম। তখন ...... প্রভৃতি ঝগড়া ক'রে চলে গিয়েছিল। আবার সেই সময় স্বামিজী ও ঠাকুরের মহোৎসব। সব কাজই ঠাকুরের কৃপায় বেশ ভাল করে চলে গেল ; উৎসবাদিও বেশ সুসম্পন্ন হ'য়ে গেল। কত

বাহিরের ছেলে এসে উৎসবের সমস্ত কাজ—খাটাখুটি ও রোজ তদারক সব শেষ করে দিয়ে চলে গেল। ঠাকুর নিজের কাজ আপনি করে নেন; কারুর জন্যে তাঁর কাজ আটকায় না। তুমি চিন্তিত হইও না। ঠাকুরের কৃপায় তাঁর কাজের জন্যে লোক জুটে যাবে। * * * * আমি যত শীঘ্র পারি কলিকাতায় যাচ্ছি। ওখানে গিয়ে যা হয় একটা বন্দোবস্ত করবো। আমার ওখানে পহুঁছিবার পূর্বে এই কটা দিন একরকম ক'রে চালিয়ে নাও। তারপর আমি ওখানে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রী৺পূজা সম্বন্ধে ওখানে পহুঁছিলে পর কথাবার্তা হবে। এ বৎসর সকল রকমেই দুর্বৎসর। আর্থিক সমস্যা বড়ই গুরুতর। মার ইচ্ছা যা তাই হবে। জীবন্মুক্তজীকে এই কথা জানাবে।

আমাদের যখন লোকবল নেই তখন স্বাধীনভাবে রিলিফের কাজ আলাদা না খোলাই ভাল ও যুক্তিযুক্ত; যা কিছু যোগাড় হয়েছে ও পরে হ'তে পারে সে সমস্ত কোন বিশ্বস্ত সমিতি, যেমন "সঙ্কট ত্রাণ সমিতি" যারা কাজ করছে তাদের দিলেই হবে। অবশ্য "বিবেকানন্দ মিশনে"র তাতে নাম থাকবে। এই সম্বন্ধে কিরণবাবু প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করে যা ভাল হয় তাই করিবে।

ইনজেক্‌শান নিয়ে অনেকটা ভাল বোধ করিতেছ জানিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত ও সুখী। ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি—যেন ইনজেকশনের দ্বারাই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়।

এখন ঠাকুরের ইচ্ছায় খালধারের বস্তীটা শীঘ্র ঠিক হ'য়ে গেলেই সকল রকম ভাল। বাড়ীটা পাওয়া গেলেই মোটামুটি মেরামত যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সে চেষ্টা করিবে। হরিপ্রেম যতদিন নিজে ইচ্ছা ক'রে চলে না যায়, ততদিন ওখানে থাক। আর যদি ভবানীর পরামর্শ শুনে সে চলে যায় তো যাক্। কাউকে খোসামোদ করে রাখবার দরকার নাই। ঠাকুরের কাজের জন্য যারা থাকবার থাকবে। তাদের বহুভাগ্য থাকলে তবে তারা ঠাকুরের কাজ করতে অধিকার পায়। যাদের দুর্ভাগ্য তারা মাগীদের গোলামী করে জীবন কাটাবে। লোক ও ভক্তরা কে কি বলবে সে সব কথা আমি তিলমাত্র গ্রাহ্য করি না। যা সত্য ও ন্যায্য বলে জানি তা প্রাণপণে পালন করবো। সেজন্য আমি ডরাই না, তা লোকে ভাল বলুক, আর মন্দ বলুক, বা আমার দুঃখই হোক আর সুখই হোক, হার হোক আর জিত হোক, বদনাম হোক আর সুনাম হোক। তাঁর

জন্য কাজ করছি ন্যায্য বলে, এতে পলিসিও নেই, ডিপ্লোমেসিও নেই। আমি ঠাকুরের ছেলে কাউকে ডরাইনে। হলেই বা হার, তাতে ডরাবো কেন? ন্যায্য বলে তাঁর কাজ করেছি। সিংহের বাচ্ছা সিংহের মতন থাকবো। লোকের মতামতে আমার কি আসে যায়? ঠাকুর বলতেন, "লোক না পোক।" বীরের বাচ্ছা, বীরের মতন লড়াই করতে করতে মরবো। তাতে ভয় কি? যারা তাতে ভয় পায়, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে চায়, দুঃখ-কষ্টকে বরণ করতে পেছপাও হয়, কেবল নির্বিবাদে আনন্দে দিন কাটাতে চায়, তারা হয় তো সাধু হতে পারে; কিন্তু তারা ঠাকুরের কাজ করবার একেবারে অনুপযুক্ত। ঠাকুর বলতেন, "যে তালগাছের মাথা থেকে ঝাঁপ দিতে পারে সেই সাধু হ'তে পারে।" আমার কেউ সঙ্গী জোটে বা না জোটে একাই লড়বো। আমার জন্যে আমি কাউকে দুঃখ-কষ্ট দিতে চাইনা, বা কাউকে Policy, diplomacy শিখিয়ে পুরোদস্তুর জুয়াচোর বানাতে শেখাই না। আমি ছলবল অত্যন্ত ঘৃণা করি। সেই জন্যই বীরের মতন সদাই লড়তে প্রস্তুত। আমি ভীরুতা—কাপুরুষতা ইত্যাদি ও সুখে স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে দিন কেটে যাক (ঐ রকম জীবন কৃষ্ণলাল প্রভৃতি ধাতের লোকের প্রিয় হ'তে পারে) এই ভাব একদম পছন্দ করি না। শৈশব হতে আমার জীবন নানা রকম দুর্বিপাকে, ঝড় তুফান, দুঃখ-কষ্টে ও পরে সাধু জীবনে ও অন্য প্রকারের দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে; সেজন্য দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি প্রভৃতির সহিত সংগ্রামে আমি চির অভ্যস্ত। তাতে আমার ভয় নেই। এই বৃদ্ধ বয়সে এখনও ঐ ভাবে চলিয়াছি। যেমন ঠাকুরের ইচ্ছা সেই ভাবে চলুক। এতে আমার নিজস্ব কোন পছন্দ ও অপছন্দ ভাব নেই। তবে যে শৈশব থেকে সংগ্রাম ক'রে আসছে সে হুঁসিয়ার হয়। অর্থাৎ সে শত্রুর প্রতি পা ফেলার উপর নজর রাখে। কখন কি বাজী করে ঠকিয়ে দেবে সে সেদিকে তার দৃষ্টি পূর্ণভাবে রাখে ও যাতে শত্রুর দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হয় সে উপায় অবলম্বন করে। ঠাকুর বলিতেন, 'সাধু হয়েছিস বলে বোকা হবি কেন?' এই সতর্কতা, পটুতা ও কুশলতা Policy ও Diplomacy নয় "হাঁ করার" দুষ্ট বুদ্ধিকে পাটওয়ারী বুদ্ধি বলি কেন? পরম পূজ্যপাদ স্বামিজী ও মহারাজ প্রভৃতির জীবন দেখিয়াছি। তাঁহারাও আমাকে এই শিক্ষা দিয়াছেন। নির্বোধ, সুখপ্রিয়, ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজী নয়, মনের মত কাজটী হ'লে করবো, পাঁচজন বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে আনন্দে দিন কাটিয়ে দেব, সাধুর জীবন অলস অবসর

প্রাপ্তির জীবন হবে,—এ রকম ধারণার লোক আমি সাধু বলে মনে করি না। আমি তাঁদের কৃপা ও আশীর্বাদে এই শিক্ষা ও এই অভীমন্ত্রে দীক্ষিত। সেই জন্য যদি কাহাকেও সজাগ সতর্ক ও বুদ্ধিমান হইবার জন্য ও শত্রুর চাল-চলনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে উপদেশ দিয়া থাকি তাহা যদি ভুল বুঝিয়া Policy ও diplomacy বলে মনে করে সে জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। আমি বীরের সন্তান, কাহাকেও নীচ শিক্ষা কখনও দিই নাই। কাপুরুষ, ভীরু, স্বার্থপর ও সুখপ্রিয় এবং তথাকথিত শান্তিপ্রিয় লোকেরা স্পষ্ট সংগ্রাম পছন্দ করে না, পেছন থেকে Policy, diplomacy নিয়ে ন্যাজে খেলে।

নলিনী ফিরে এসেছে। তার শরীর বেশ সুস্থ ও সবল আছে। এখানে অপরাপর সকলে ভাল আছে। অন্যান্য সংবাদ নলিনী তোমাকে দিয়েছে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহ ও আশীর্বাদ জানিবে। তথাকার স্ত্রী ও পুরুষ সমস্ত ভক্তদের এবং ছেলেমেয়েদের সকলকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জানাবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী—
নির্মলানন্দ

(১৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বাসাভাঙ্গুডি, বাঙ্গালোর
৩১ শে মার্চ, ১৯১১

প্রিয় শ্রীনারায়ণ পিলে,

আমি তোমার ২২ তারিখের চিত্তাকর্ষক চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। তোমরা সকলে শ্রীগুরু মহারাজের কৃপায় বেশ সুস্থ আছ জানিয়া আমার আনন্দের সীমা নাই। এখানে প্রত্যাগমনের পর হইতে তোমাকে চিঠি না লেখার জন্য আমাকে ক্ষমা করিও। সম্প্রতি আমি আমাদের সংঘ-মাতাকে শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদনার্থ মাদ্রাজে গিয়াছিলাম। তথায় আমি দুইদিন ছিলাম এবং

বাঙ্গালোরে পায়ের ধূলা ফেলিবার জন্ত তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইলাম। কৃপাপূর্বক তিনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন এবং তদনুসারে এই মাসের ২৪ তারিখে গত শুক্রবার সকালে এখানে আসিলেন। তিনি এখানে মাত্র চার দিন থাকিয়া বহু শত ভক্ত নরনারীকে আনন্দ-সাগরে ভাসাইয়াছিলেন।

কাল সন্ধ্যায় এই স্থান ছাড়িয়া আমি মাদ্রাজ যাইতেছি, কলিকাতা পর্য্যন্ত শ্রীমার সঙ্গে গমনের উদ্দেশ্য। খুব সম্ভবতঃ পরবর্তী মাসের শেষে আমি এখানে ফিরিব। প্রায় ছয় মাস পূর্বে তোমাদের ওখানে যে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল তাহা সুচারু ও সুদৃঢ়রূপে চলিতেছে জানিয়া আমি যে কত আনন্দিত হইয়াছি তাহা লিখিতে পারিতেছি না। শ্রীগুরু মহারাজের নাম কি অচিন্তনীয় প্রভাব ধর্মপ্রাণ নরনারীদের মনে বিস্তার করে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, তোমার দ্বারা স্থানীয় আশ্রমে উপহার প্রদত্ত ঠাকুরের ছবি সম্পর্কে তোমার লিখিত ঘটনা সমূহ দ্বারা। তিনি এই যুগের পরিত্রাতা। যতই দিন যাইবে ততই প্রত্যেক সম্প্রদায়, সংঘ ও সমাজের লোকে তাহা বুঝিতে পারিবে। আমার আন্তরিক প্রার্থনা, তিনি তোমাদের সকলের উপর উৎকৃষ্ট আশিস্ বর্ষণ করুন এবং তোমাদিগকে নিপীড়িত মানবজাতির অন্তরে আনন্দ ও শান্তিদানের যন্ত্রস্বরূপ করুন।

শ্রীগুরু মহারাজের ভাব প্রচারার্থ পরম আগ্রহসহকারে ভক্ত নীলকণ্ঠ কাজ করিতেছে জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। যাহারা পরোপকার্থ জীবন ধারণ করে তাহারাই ধন্য। আমার স্নেহাশীষ ও ধন্যবাদ তাহাকে জানাইবে এবং তাহার সাফল্যের জন্য আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিবে।

আমার বিশ্বাস, যখন তুমি ত্রিবান্দ্রমে যাইবে তখন তত্রস্থ আশ্রমের কাজেও সাড়া পড়িবে। ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে আগামী মে মাসে আমি তথায় যাইব। আশা করি, তোমার শরীর ও মন ভাল আছে। তুমি আমার শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীষ গ্রহণ করিবে। ইতি

শ্রীরামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত তোমাদের

নির্মলানন্দ

আটত্রিশ

কথোপকথন

শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য। স্বামী বিবেকানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ ও ত্রিগুণাতীতানন্দের ন্যায় তিনিও আমেরিকায় যাইয়া তিন বৎসর বেদান্ত প্রচার করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয় এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে মালাবার প্রদেশে ওট্টাপালমে তিনি দেহত্যাগ করেন। ওট্টাপালমে তাঁহার স্মৃতিমন্দির অদ্যাপি সগর্বে বিদ্যমান। তিনি বহু মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং অসংখ্য শিষ্য ভক্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিস্তৃত ইংরাজী জীবনী তৎশিষ্যগণ কর্তৃক ইংরাজীতে লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, তিনি বর্তমান ভারতের একজন স্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি যখন বেলুড় মঠে আসিতেন তখন তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছি। তখন তিনি ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ এবং আমি কলিকাতা সিটি কলেজের ছাত্র। বেলুড় মঠে দর্শক-কক্ষে বসিয়া তিনি আমাদিগকে একদিন ধর্মপ্রসঙ্গ শুনাইলেন। সম্ভবতঃ তখন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল এবং সব স্কুল ও কলেজ বন্ধ থাকায় বহু ছাত্র বেলুড় মঠে আসিয়াছে। তিনি যখন ধর্মপ্রসঙ্গ করিলেন তখন দুইজন ব্রহ্মচারী তাঁহার দুইদিকে দাঁড়াইয়া বড় বড় হাত পাখায় তাঁহাকে বাতাস করিতে ছিলেন। ধর্মপ্রসঙ্গ করিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর সিংহগর্জন তুল্য সুগম্ভীর ও তেজোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। আমরা তাঁহার সৎসঙ্গ শুনিয়া স্ব স্ব জীবনে অনির্বাণ ধর্ম প্রেরণা পাইলাম। আমি তাঁহাকে বাঙ্গালোর মঠের ঠিকানায় পত্র দিতাম এবং তিনিও দয়া করিয়া আমাকে উত্তর দিতেন। আর একবার যখন তিনি বেলুড় মঠে আসেন তিনি আমায় তথায় দেখিয়া বলিলেন, "আর কতদিন Battledore and Shuttlecock হাতে ধরে থাকবে? এবার খেলা আরম্ভ করে দাও।" ইহার দ্বারা তিনি বলিতে চাহিলেন, "যেমন ব্যাট ও বল হাতে না রাখিয়া খেলিলেই আনন্দ পাওয়া যায় না তেমনি সাধুসঙ্গ ও মঠবাস যাহারা অধিক করিতে চায় তাহাদের

পক্ষে সাধু হওয়াই উচিত।” তিনি সাধু হইবার জন্য আমাকে উৎসাহ দিলেন। তাঁহাদের আশীর্বাদেই অদূর ভবিষ্যতে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবার সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছি। সত্যনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর আশিস্ অব্যর্থ।

স্বামী নির্মলানন্দ যে সকল গল্প বলিয়া উপদেশ দিতেন তন্মধ্যে দুইটী নিম্নে বিবৃত হইল। গল্পদ্বয় তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের মুখে শুনিয়াছিলেন বলিয়াই মন্তব্য করেন। প্রথম গল্পটি রাজা মান্ধাতার আমলে ঘটিয়াছিল। নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র দ্বীপ মান্ধাতা গৌহাটীতে ব্রহ্মপুত্র নদীর মধ্যস্থিত উমানন্দ ভৈরব তুল্য। মান্ধাতা দ্বীপের দৈর্ঘ্য দেড় মাইল এবং প্রস্থ পৌনে এক মাইল। উক্ত দ্বীপে ভারত বিখ্যাত ওঙ্কারেশ্বর মন্দির অবস্থিত। রাজা মান্ধাতার রাজধানী ও ওঙ্কারেশ্বর। এই ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের পূর্বে নর্মদা-তীরে মামেশ্বর শিব মন্দির অবস্থিত। উহা ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে অন্যতম। বেলুড় মঠের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ তথায় কিছুকাল তপস্যা করেন গুরুভ্রাতা স্বামী সুবোধানন্দকে সঙ্গে লইয়া। উক্ত স্থান তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। মান্ধাতা হইতে ৬০।৭০ মাইল নীচে নর্মদা-কিনারে মাহেষ্মতী নগর ছিল। রাণী অহল্যাবাই-এর সময়ে ইন্দোর রাজ্যের রাজধানী ছিল মাহেষ্মতী। মাহেষ্মতীর এক মাইল উত্তরে নর্মদা-তীরে মণ্ডলেশ্বর গ্রাম। এই গ্রামে মণ্ডণমিশ্রের বাড়ী ছিল এবং শংকরাচার্য্য তথায় যাইয়া তৎপত্নী উভয় ভারতীর সহিত তর্কযুদ্ধ করেন। মণ্ডলেশ্বর গ্রাম অধুনা ভগ্নস্তূপে পরিণত ও লুপ্তপ্রায়। মাহেষ্মতী নগরে অদ্যাপিও রাণী অহল্যাবাইয়ের দানশীলতায়, সওয়া লক্ষ শিবের নিত্যপূজা হইয়া থাকে। একশত ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রত্যহ নর্মদায় স্নানান্তে উক্ত নদী হইতে মাটি তুলিয়া সওয়া লক্ষ শিবলিঙ্গ গড়িয়া সচন্দন বিল্বপত্রে পূজা করিয়া থাকেন। মান্ধাতার রাজবংশের রাণী ছিলেন অহল্যাবাই। একবার রাজা মান্ধাতা তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন যে, তাঁহার রাজধানীতে নিত্য-বাজার বসাইতে হইবে। মন্ত্রী রাজ্যের চারিদিকে উক্ত সংবাদ ঘোষণা করিলেন এবং অবিলম্বে প্রত্যহ বাজার বসিতে লাগিল। উক্ত রাজ্যের নানাস্থান হইতে দোকানদারগণ আসিয়া দোকান খুলিত ও নানাদ্রব্য বিক্রয় করিত। একদা কোন দরিদ্র কুমার বহু দেবদেবীর মূর্তি গড়িয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আনিল। সে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী প্রভৃতি মূর্তি গড়িয়া আনিল। মূর্তিগুলি এত সুন্দর ও সস্তা ছিল যে, একদিনেই

সব পুতুল বিক্রয় হইয়া গেল। কিন্তু অলক্ষ্মী পুতুলটি কেহই কিনিতে চাহিল না; অলক্ষ্মী গৃহে রাখিলে লক্ষ্মীর পলায়নের ও অমঙ্গল সংঘটনের আশঙ্কা সমধিক। রাজা স্বয়ং এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, বিক্রেতাদের যে সব দ্রব্য কেহ কিনিবে না সেই সব তিনি নিজেই কিনিয়া লইবেন। এই জন্য দূর দূর স্থান হইতে দোকানদারগণ বহু দ্রব্য লইয়া ঐ বাজারে আসিত। কিন্তু সেদিন কুমারের অলক্ষ্মী পুতুলটি কেহ ক্রয় না করায় মান্ধাতা রাজধর্ম রক্ষার্থ উহা কিনিয়া প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার মন্দিরে উহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিলেন। সেই মন্দিরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ধর্ম, শিব প্রভৃতি দেবগণ নিত্য পূজিত হইতেন। তাঁহাদের সঙ্গে অলক্ষ্মীর পূজা হওয়ায় দেবগণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং মন্দির ছাড়িয়া যাইতে সংকল্প করিলেন। এক গভীর নিশীথে দ্বাররক্ষক দেখিল—মন্দির-দ্বার সহসা উন্মুক্ত হইল এবং এক জ্যোতির্ময় দেবপুরুষ বহির্গত হইয়া গেলেন। দ্বাররক্ষক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? দেবপুরুষ উত্তর দিলেন—'আমি বিষ্ণু এবং রাজপ্রাসাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।' দ্বাররক্ষক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন চলিয়া যাইতেছেন?" বিষ্ণুদেব উত্তর দিলেন, "অলক্ষ্মী দেবীর পূজা এই মন্দিরে বিহিত হওয়ায় আমি রাজাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।" পরবর্তী মহানিশায় শিবঠাকুরও এইরূপে মন্দিরের দরজা খুলিয়া চলিয়া গেলেন। উক্ত প্রকারে ব্রহ্মাদি দেবগণও এক এক রাত্রিতে প্রস্থান করিলেন। এবার ধর্মদেবের যাইবার পালা আসিল। তিনি যখন মন্দিরের দরজা খুলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন তখন মন্দিরের দ্বার-রক্ষক পূর্ববৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় ধর্মরাজ একই উত্তর দিলেন। তখন দ্বাররক্ষক রাজার পক্ষ সমর্থনপূর্বক সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "রাজা মান্ধাতা ধর্মরক্ষার জন্যই অলক্ষ্মীকে স্বীয় মন্দিরে আনিয়াছেন সুতরাং তাঁহাকে ত্যাগ করা আপনার উচিত নয়।" ধর্মরাজ দ্বাররক্ষকের প্রার্থনার যৌক্তিকতা বুঝিয়া মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ফিরিয়া আসার পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবগণও একে একে প্রত্যাবর্তন করিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ গল্পটী বলিয়া বুঝাইতেন যে, ধর্মকে জীবনের ভিত্তি করিলেই সর্বাঙ্গীন শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা থাকে এবং ধর্মত্যাগ করিলে বিবিধ অশুভ আসিয়া জীবন-পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করে।

স্বামী নির্মলানন্দ কর্তৃক কথিত দ্বিতীয় গল্পটী নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

আমরা ধর্মবিষয়ে যুক্তি তর্ক করিলে তিনি আমাদিগকে মূর্খ পণ্ডিত বলিয়া উপহাস করিতেন এবং উহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গল্পটী বলিতেন। এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত কোন কলুবাড়ীর কাছ দিয়া যাইতে ছিলেন। কলুর বাড়ীতে যে তেলের ঘানি ছিল তাহা একটি বলদে টানিতেছিল। সেই বলদের গলায় একটি ঘণ্টা ঝুলিত। বলদ চলিলে ঘণ্টা বাজিত এবং বলদ না চলিলে ঘণ্টা বাজিত না। যখন ঘণ্টা বাদ্য শোনা যাইত না তখন কলু বারান্দায় বসিয়া অন্য কাজ করিতে করিতে আওয়াজ করিলেই বলদটি আবার চলিতে থাকিত এবং তাহার গলার ঘণ্টাটি বাজিত। উল্লিখিত নৈয়ায়িক ঘণ্টাবাদ্য শুনিয়া মনে করিলেন, কোন দেবপূজার ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে। তিনি বারান্দায় উপবিষ্ট বৃদ্ধ কলুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার বাড়ীতে কোন্ দেবতার পূজা হইতেছে?" বুড়ো কলু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, এই ঘণ্টাধ্বনি দেবপূজার নয়। যে বলদ তেলের ঘানি টানিতেছে তাহার গলায় উহা বাজিতেছে।" যুক্তিবাদী নৈয়ায়িক পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "যদি বলদ দাঁড়াইয়া মাথা নাড়ে তাহা হইলেও উক্ত ঘণ্টা বাজিবে। তুমি তখন কিরূপে বুঝিবে যে, সে ঘানি টানিয়া চলিতেছে।" বৃদ্ধ কলু মৃদুহাস্যে উত্তর দিলেন, "বলদ তো আর আপনার মত ন্যায়শাস্ত্র পড়েনি!" এই গল্পটী বলিয়া স্বামী নির্মলানন্দ উপদেশ দিতেন যে, ধর্মরাজ্যের সব কথা যুক্তিতর্ক দ্বারা বোঝা যায় না; কারণ অতীন্দ্রিয় ধর্মতত্ত্ব বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। সাধু-বাক্যে বা শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলে ধীরে ধীরে বুদ্ধি নির্মল এবং ধর্মতত্ত্ব বোধগম্য হয়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী নির্মলানন্দ বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। কার্তিক মাসের রাস পূর্ণিমার দিনে তিনি প্রায় বিশজন সাধুর সহিত পার্শ্ববর্তী দাঁ'দের রাস-বাড়ীতে রাসমেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। বেলুড় মঠে রাসোৎসব দর্শনে যাবার জন্য হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা রাসমেলায় 'কাল জগদ্ধাত্রী', 'ভীষ্মের শরশয্যা', 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' প্রভৃতি মৃন্ময় পুতুল ও বড় মেলা দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বে মঠে ফিরিলেন। কোন ভক্ত তুলসী মহারাজকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার জন্য যে ঠাকুরের প্রসাদ রাখা হইয়াছিল তাহার সবটাই তিনি কোন তরুণ-ভক্তকে দিয়া বলিলেন, "তোকে অনেক দূর যেতে হবে, প্রসাদটা খেয়ে ফেল। আমি কাল ভুবনেশ্বর যাচ্ছি।" এই ঘটনার দুই তিন মাস পূর্বে স্বামী নির্মলানন্দ কলিকাতায় (ভবানীপুরে) গদাধর আশ্রমে গিয়াছিলেন। তথায়

বিচারপতি দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের ছেলের সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা হইল। তিনি তিনি বলিলেন, "আগে ধারণা ছিল, লেখাপড়া শিখে কর্ম করবে, রোজগার করবে। আর আজকাল দেখ্‌ছিস্, বি. এ., এম. এ., পাশ করে সাধু হচ্ছে। একজনের Influence-এ (প্রভাবে) সমস্ত পরিবার ভক্ত হয়ে যায়। আমি একটি পরিবারের কথা জানি ; এক বধূর প্রভাবে সেই পরিবার ভক্ত হয়ে গেছে। ঐ পরিবারে আগে অনেক ম্লেচ্ছাচার, ভ্রষ্টাচার ছিল। আজকাল সব শুধরে গেছে।"

স্বামী নির্মলানন্দ ১৯২৭ খ্রীঃ জুন মাসে দক্ষিণ ভারতে কুর্গ প্রদেশের অন্তর্গত পোন্নামপেট নামক স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন করিতে গিয়াছিলেন। উক্ত মাসে ৯ই তারিখে দ্বিপ্রহরে তাঁহার কয়েকটি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্য বাঙ্গালোর হইতে আসিয়াছেন। তিনি সমবেত সাধুবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমাদের কাজকর্ম্ম কেমন চলছে? ইহার পরে আর কেউ তোমাদিগকে আলস্যের জন্য দোষী করবে না। কারণ, তোমরা সব জিনিষের বিজ্ঞপ্তি ব্যাপকভাবে দিতেছ। যাহারা শ্রীগুরু মহারাজ বা স্বামিজীকে দেখে নাই তাহারা জনসাধারণের সহযোগিতা লাভার্থ এরূপ প্রচার করবে। আমি রামকৃষ্ণ সংঘের একটি নগণ্য সন্ন্যাসী এবং ব্যক্তিগত ভাবে যে ভাবে প্রেরণা পাই সে ভাবেই কাজ করি।

"বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক যে সব ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেগুলি যুগাচার্য্য স্বামিজীর ভাবানুযায়ী নহে। যদি আমাকে এই সব কর্মের সহিত সংযোগ রাখিতে হয়, তাহা আমার পক্ষে অতিশয় কষ্টকর। অসত্যের সহিত সহযোগ রাখা অপেক্ষা আত্মহত্যাই শ্রেয়স্কর। আমি সেই সন্ন্যাসীর গুরুভ্রাতা, যিনি মাদ্রাজের সমাজ-সংস্কারকগণকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমাকে ভীত করিতে পারিবে না।" শ্রীগুরু মহারাজ শম্ভু মল্লিককে বিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তোমরা কি মনে কর, ঈশ্বর নাকে সরিষার তৈল দিয়ে এবং আহার করে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হয়েছেন? তোমরা সমাজ সংস্কার করার কে?" স্বামিজী সমাজ সেবার জন্য এই সকল সেবাশ্রম স্থাপন করেন নাই। মানুষের মধ্যে যে কর্মস্পৃহা আছে সেগুলি ভাল দিকে মোড় ফিরান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। আজকাল তোমরা বড় বড় বক্তৃতা দাও এবং সংবাদপত্রে লম্বা লম্বা

বিবরণ বাহির কর। যতক্ষণ না ঘট জলপূর্ণ হয় ততক্ষণ উহা শব্দ করে। মৌমাছি যতক্ষণ না মধু খায় ততক্ষণ গুন্ গুন্ করে। ইহা শ্রীগুরু মহারাজের বাক্য। দাতব্য চিকিৎসালয় ও ছাত্রাবাস স্থাপন, পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীগণকে উত্তীর্ণ হইবার জন্য পড়ান এবং নাম জাহির করা প্রভৃতি প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম নহে। এইগুলি কর্মযোগের মধ্যে পড়ে না।

"আজকাল কোন উৎসবই বক্তৃতা ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না। যে স্বামিজী ভাল বক্তৃতা দিতে পারেন তিনিই বড় সাধুরূপে বিবেচিত হন। যদি কোন সাধু বক্তৃতা দিতে না পারেন তিনি গণ্যমান্য হন না। যখন শ্রীমা সারদা দেবী মাদ্রাজ ভ্রমণে এসেছিলেন তখন কতিপয় স্থানীয় তরুণ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর নিকট গিয়া বলিল, "আমরা শুনলাম, মিসেস্ রামকৃষ্ণ এখানে এসেছেন এবং এই মঠে আছেন। কখন তাঁর বক্তৃতা হবে? শশী মহারাজ এই কথা শুনে বিরক্ত হয়ে ছোঁকড়াগুলিকে তিরস্কার করিলেন। এই হলো আধুনিক কর্মধারা। আমি বক্তা নয় এবং বক্তা হতেও চাই না। বক্তৃতাদানাদি রজোগুণের কার্য্য।"

"এখন আমার বয়স ৬৪ বৎসর হয়েছে। ৪৪ বৎসর আমি সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছি। এতদিন আমি কয়েকটি মূলনীতি মেনে চলে আসছি। আমি অন্যের পথে চলিতে পারি না এবং আমার আদর্শকেও ছোট করতে চাই না। যখন আমি প্রথম বাঙ্গালোরে আসি, তখন আশ্রমে পুরাতন বাড়ীটি মাত্র ছিল এবং আশ্রমের তহবিলের কোন অর্থ ছিল না, অথবা আশ্রমে কোন পাচক বা চাকর থাকত না। শশী মহারাজ বাঙ্গালোর শহরের এখানে ওখানে শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করতেন বলে আমাকেও তাই করতে হতো। কোন কোন স্থানে ক্লাস করে রাত্রে নয়টায় আশ্রমে ফিরতাম। তারপর নিজের জন্য রান্না করতাম। এইরূপে আমাকে বাঙ্গালোরে থাকতে হতো এবং প্রথমাবস্থায় কখন কখন আমি অনাহারেও কাটিয়েছি। তারপর ডেপুটি কমিশনার শ্রীনারায়ণ আয়েঙ্গার মাসে ত্রিশ টাক দিতে আরম্ভ করলেন। কিছুকাল পরে তিনি ঐ চাঁদা চল্লিশ টাকা পর্য্যন্ত বাড়ালেন। আমি বাজরে যেতাম চাঁদা তুলতে ও ডাল চাল শাক সব্জী প্রভৃতি ভিক্ষা করতে। অনেক চেষ্টা করে আমি ছয় হাজার টাকা সংগ্রহ করলাম এবং স্থায়ী তহবিল রূপে উহা ব্যাঙ্কে জমা দিলাম। তারপর উত্তর ভারত থেকে আমি একটি পাচক আনালাম। সে আমার কাছে ক্রমাগত

ছয় বৎসর ছিল। এইরূপে আশ্রম ধীরে ধীরে বর্তমান অবস্থায় গড়ে উঠেছে একটা আশ্রম গড়ে তোলা কি ছেলে খেলা? এক এক সাধু বুকের রক্তপাত করে এক এক মঠ গড়ে তোলেন। যতদিন সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেঁচেছিলেন ততদিন বাঙ্গালোর আশ্রমের প্রতি আমার খুব টান ছিল। তিনি চলে যাবার পরই সব মঠের প্রতি আমার টান চলে গেছে। আমার মন জগৎ ছেড়ে তাঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণলোকে চলে গেছে।”

আশ্রম প্রতিষ্ঠার উৎসবাঙ্গ রূপে কুর্গ নৃত্য অনুষ্ঠিত হলো। অনন্তর স্বামী নির্মলানন্দ সমবেত সন্ন্যাসীগণকে নিম্নোক্ত উপদেশ দিলেন।—

“যদি আমাদের কোন কিছু দেখাবার থাকে সেটি এই যে, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান; আমরা শ্রীগুরু মহারাজের সেবক। তোমরা বক্তৃতাদানের জন্য অস্থির হও এবং সেইজন্য সংসারী লোকের সংস্পর্শে আস। এমন কি স্বামিজীও এদেশে বক্তৃতা দেন নাই। তাঁকে যে সব অভিনন্দন দেওয়া হয়েছিল তিনি কেবল সেইগুলিই উত্তর দিয়েছিলেন। আমাদের প্রেসিডেণ্ট মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দন এবং আমার গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ কি করলেন? তাঁরা কি বক্তৃতা দিয়াছিলেন? তাঁরা কি বক্তৃতামঞ্চের উপর নেচে ছিলেন? আদর্শ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন এবং বিশুদ্ধ চরিত্র গঠনই সন্ন্যাসীর প্রধান কর্তব্য। আদর্শ বর্জন অপেক্ষা আত্মহত্যাই সন্ন্যাসীর পক্ষে শ্রেয়ঃ। তোমরা কি কখনও আমাকে দেখেছ, ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের প্রশংসা করতে? গুরু মহারাজের চরণে আমার অটল বিশ্বাস আছে। তাঁর কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি তার এককণাও যদি রাখতে পারি তাহলে শত শত লোক আমার কাছে এসে মাথা নোয়াবে। বর্তমান কালে স্বামী তুরীয়ানন্দের মত সাধননিষ্ঠ মোক্ষার্থী সন্ন্যাসী তোমরা কি দেখেছ? আধ্যাত্মিকতা তোমাদের জীবনে অগভীর। তাই তোমরা বাজেকাজ নিয়ে মেতে আছ। যদি তোমরা স্বামী ব্রহ্মানন্দের মত অন্তর্মুখী বা স্বামী তুরীয়ানন্দের মত তপোনিষ্ঠ হও তবেই তোমাদের কল্যাণ হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যবৃন্দকে এই যুগের ধর্মপথ-প্রদর্শক বলে জানবে।”

উক্ত আশ্রমে ঐদিন কোন ভক্ত প্রশ্ন করিলেন, “স্বামিজী, প্রাণায়াম অভ্যাস করলে কি মনঃসংযম লাভ হয়?” স্বামী নির্মলানন্দ উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, প্রাণায়াম করলে মন একাগ্র হয়; কিন্তু সমাধি লাভ হয় না। ধ্যান গভীর হলে সমাধি হয়।” আর এক ভক্ত প্রশ্ন করিলেন, “স্বামিজী, তপস্যা কি?

স্বামী নির্ম্মলানন্দ বলিলেন, "দৈনিক তপস্যা দ্বারা মন শান্ত হয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা বিচলিত হয় না। সর্বপ্রকার খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হওয়া, মেজেতে শয়ন করা প্রভৃতি দৈহিক তপস্যা। মানস তপস্যায় প্রথমে ইষ্ট-মূর্ত্তি ধ্যান, পরে ইষ্টদেবের জীবন স্মরণ ও শেষে ইষ্টস্বরূপ চিন্তন করিতে হয়। দৈহিক তপস্যার মূল কথা 'যুক্তাহারবিহার' হওয়া। কঠোর তপস্যা পরিমিত হওয়া দরকার। তিতিক্ষাই তপস্যার উদ্দেশ্য। তাই আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন, 'অপ্রতিকার পূর্বক চিন্তাবিলাপ রহিত সর্বদুঃখ সহনই তিতিক্ষা।'

প্রশ্ন—মহাত্মাদের পূতসঙ্গে দীর্ঘকাল থাকিয়াও অনেকে ধর্মীয় প্রগতি করিতে পারেন না কেন?

উত্তর—কারণ তাহাদের মনের ধারণা শক্তি নাই এবং তাহারা সুনীচ বা সুনম্র নহে। আত্মতৃপ্ত ও আত্মাভিমানী হইয়া তাহারা মনে করে, যাহা কিছু জানা দরকার তৎসমুদয় তাহারা জানে। তাহারা নিজেদের সব জানতা মনে করে। যেমন জল-পাত্রগুলির মুখ উল্টাইয়া জলমধ্যে রাখিলে সেইগুলির মধ্যে জল ঢুকিতে পারে না তদ্রূপ তাহারা। সর্বাগ্রে জ্ঞান-তৃষ্ণা প্রয়োজন। আর শ্রদ্ধাবান্ হওয়া দরকার। গীতায় আছে, শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। ইহার অর্থ, যিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, জ্ঞাননিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হন তিনিই জ্ঞানলাভে সমর্থ। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবার বলেন—

তৎবিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ॥

অনুবাদ—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সশ্রদ্ধ সেবা দ্বারা তাঁহাকে জানিবে। এই তিন উপায় অবলম্বিত হইলে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিবেন। নচেৎ জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

প্রশ্ন—মন্ত্রের অর্থ কি?

উত্তর—তোমরা কখনো মনে করো না যে, মন্ত্রার্থ সম্যক্ অবগত হইয়াছ। মন্ত্র যতই জপ করিবে ততই ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবে। মন্ত্রার্থ অবগতির চরম পরিণতিতে সিদ্ধিলাভ বা ঈশ্বর দর্শন হয়। এই মন্ত্রমালা কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ এবং আমাদের মহর্ষিদের চরম উপলব্ধি সম্ভূত। প্রত্যেক মন্ত্রের অর্থ অত্যন্ত গভীর। গুরুদত্ত মন্ত্রজপ নিয়ম ও নিষ্ঠা সহকারে করিয়া যাও। যতই মন্ত্রজপে মনোযোগী হইবে ততই মন্ত্রার্থ প্রকটিত হইবে।

কোন ব্রাহ্মণ কুমার মন্ত্রদীক্ষা লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে স্বামী নির্মলানন্দ বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ কুমার। তুমি তো উপনয়ন কালেই দীক্ষিত হইয়াছ? ইতঃপূর্বে প্রাপ্ত গায়ত্রী অপেক্ষা অধিকতর শক্তিমতী ও সুপবিত্র মন্ত্র কি আর আছে? ইহাতেই বিশ্বাস রাখ এবং নিষ্ঠার সহিত ইহাই জপ কর। গায়ত্রী বেদমন্ত্র, সিদ্ধমন্ত্র, শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ ভাবনার ফলে ধ্যান ও সমাধি লাভ হয়। সাধনে লাগিয়া থাকিলে যথাসময়ে তুমি ব্রহ্ম দর্শন করিবে ও কৃতকৃতা হইবে।"

কোন চাকুরীজীবী ভদ্রলোক কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পরে সন্ন্যাসী হইতে চাহিয়াছিলেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কামিনী-কাঞ্চনার্থ ব্যয়িত হইয়াছে। তথাপি জীবনের আরও কিছু কাল উহাদের জন্য দিতে চাও, তা হইলে শেষে তুমি ঈশ্বরকে কি দিবে? শুভ সঙ্কল্প অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করা দরকার। জাবাল উপনিষদে আছে 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।' ইহার অর্থ, যেদিন জীবনে বৈরাগ্য আসিবে সেইদিনই প্রব্রজা বা সংসার ত্যাগ করিবে।

যাহারা বাহ্য ভাবে আচারনিষ্ঠ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী নির্মলানন্দ একদিন বলিলেন, "তুমি বল যে, তোমার আচারগুলি মানিয়া চলিতে হইবে। জগতে উন্নতির জন্য তুমি যত্র তত্র বিচরণ করিতেছ, তোমার সন্তানদিগকে উচ্চশিক্ষার্থ আমেরিকায় ও ইউরোপে পাঠাইতেছ। তখন আচারের প্রশ্ন উঠে না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়—তোমার আচারনিষ্ঠা বাহ্যিক, আন্তরিক নহে। যখন তুমি তোমার সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুসারে আচার পালন বা বর্জন কর তখন তোমার আচারকে মান্য দিবার জন্য তুমি অন্যকে আশা কর কেন? আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার এই অভাবহেতু তোমাদের ধর্মোন্নতি হয় না।"

জনশিক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে একদা স্বামী নির্মলানন্দ মন্তব্য করেন, "প্রাচীন ব্রহ্মদেশের অধিবাসিগণ যে শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করিতেন, তাহাতে এই সমস্যার সমাধান সহজেই হইয়াছিল। তাহাদের নিকট বৌদ্ধবিহারগুলি বিদ্যালয় এবং শ্রমণেরা শিক্ষক ছিলেন। ধনী বৌদ্ধ ভাবিতেন, বিহার নির্মাণ পুণ্যকর্ম। শ্রমণদিগের অন্নসংস্থানও সহজব্যাপার। ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া শ্রমণগণ কয়েক মিনিট গৃহদ্বারে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইতেন এবং তাঁহাদের প্রতি কেহ লক্ষ্য না করিলে তাঁহারা চলিয়া যাইতেন। বৌদ্ধধর্ম্মে সন্ন্যাসীকে শ্রমণ বলে। কিন্তু

শ্রমণেরা প্রায় কোন দ্বারে বিমুখ হইতেন না। কারণ, যদি কোন শ্রমণ ভিক্ষা না লইয়া চলিয়া যাইতেন তাহা অশুভ বলিয়া বিবেচিত হইত। যখন শিশু শিক্ষার বয়স প্রাপ্ত হয় তাহাকে শ্রমণদের অধীনে কোন বিহারে পাঠান হইত। শিশু বিহারে অবস্থানকালে শ্রমণগণ কর্তৃক সংগৃহীত সহজ খাদ্য খাইত, সরল জীবন যাপন করিত এবং তাহাদের বিদ্যা, সংস্কৃতি ও ধর্ম শিক্ষা করিত। এক পাই খরচ না করিয়া এইরূপ সুশিক্ষালাভ এবং স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন অন্য উপায়ে অসম্ভব। এই জন্যই সর্বগৃহে জন্ম, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে ও ধর্মানুষ্ঠান কালে অর্থদান ও অন্নদানাদি আশ্রমে প্রেরিত হইত। শ্রমণগণ পুরোহিতের কার্য্য করিতেন, কিন্তু দক্ষিণা লইতেন না।

কয়েকজন আশ্রমবাসীর ভাবালুতা লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "তাহারা ভাবপ্রবণ। ভাবপ্রবণতায় কোন লাভ হয় না, পরন্তু বৃথা শক্তি ক্ষয় হয়। তাহারা কল্পনা করে, অমুক স্থান সাধনায় অত্যন্ত অনুকূল এবং তথায় যাইয়া বাহ্যদৃশ্যে মুগ্ধ হয়। তাহারা তাহাদের বন্ধুদের নিকট উচ্ছ্বাস সহকারে এই সম্বন্ধে পত্র লেখে এবং তাহাদিগকে তথায় যাইতে অনুরোধ করে। কিন্তু অত্যল্প সময়ে সেইস্থান নূতনত্ব ও সৌন্দর্য্য তাহাদের নিকট হারাইয়া ফেলে। তখন তাহারা অন্যস্থানে যায় এবং কিছুকাল পরে সামান্য অসুবিধায় পড়িয়া উহা ত্যাগ করে। এইরূপে তাহারা আবর্তমান প্রস্তরখণ্ডসমূহবৎ সারা জীবন ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ ভবঘুরে ও নিষ্ঠাহীনদের পক্ষে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রথম প্রয়োজন দৃঢ়তা ও কোন আশ্রমে লাগিয়া থাকা। তত্রস্থ কর্তৃপক্ষ তোমার যে কর্ত্তব্য বিধান করেন তাহা সযত্নে সম্পাদন করা এবং তোমার সাধনা নিষ্ঠা-সহকারে চালানো, যেরূপ কাজ আসুক না কেন, তাহা ঠকুর পূজার ন্যায় সশ্রদ্ধ-ভাবে সম্পন্ন করা। ঈশ্বর কি গাছের কাঠালের মত যে, তুমি তাহা অনায়াসে পাড়িয়া আনিবে? পবিত্র ও সত্যনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ হও, তিনিই তোমার শুভ ইচ্ছা কালে পূর্ণ করবেন। কেবল তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে পাওয়া যায়।

শিমোগার আমিলদারকে স্বামী নির্মলানন্দ বলিয়াছিলেন, "মেজাজ, ভাবনা, অভ্যাস সবই বদলান যায়। শুভ ভাবনা বা কার্য্য দ্বারা অসৎ ভাবনা বা অভ্যাস উৎপাটিত হয়। বাল্যকালে আমি কিঞ্চিৎ ভীরুছিলাম, আমি সাহসী ও নির্ভিক হইতে ইচ্ছা করিলাম। সেই উদ্দেশ্যে আমি শ্মশানে বা কবরখানায় প্রায়ই একা যাইতাম। ইহার ফলে বাল্যকালের দুর্বলতা অল্লায়াসে অতিক্রান্ত হয়।

যদি আমরা আন্তরিক আকাঙ্খা করি এবং সুদৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া নির্দিষ্ট সাধন অনুশীলন করি তবে আমরা সকলেই সৎস্বভাব ও ঈশ্বরানুরাগী হইতে পারি। কোন বিষয়ে উদাসীন হওয়া উচিত নয়, সেই বিষয় যতই ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ মনে হউক। কোন কোন বিষয়ে ঔদাসিন্য প্রদর্শনের জন্য ঠাকুর স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী যোগানন্দকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। একদা ঠাকুর আহারার্থ বসিতে যাইয়া বিছানো আসন ছুঁইতে পারিলেন না; ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় রাখাল মহারাজ বলিয়াছিলেন, "নিত্য গোপালের কোন তরুণ শিষ্য কর্তৃক ইহা পাতা হইয়াছে।" এই ঔদাসিন্য নিমিত্ত ঠাকুর তাঁহাকে তিরস্কারপূর্বক আসনটিতে গঙ্গাজল ছিটাইয়া শুদ্ধ করিয়া পুনরায় পাতিতে বলিলেন। ঠাকুর কাহারো অশুদ্ধ দৃষ্টি বা স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতেন না।

"খ্রীষ্টান মিশনারীগণ কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে স্বামী নির্মলানন্দ বলিয়াছিলেন, "হিন্দু বালিকাগণকে এইরূপ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের জন্য পাঠান আদৌ সমীচীন নহে। তাঁহাদের গুপ্ত উদ্দেশ্য সকলকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা। তাহাদের দৃষ্টিতে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। সেইজন্য তাহারা সকল উপায় প্রয়োগপূর্বক অন্যকে স্বীয় ধর্মে টানিতে চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে নীরবে সাফল্যের সহিত তাহারা পরিকল্পিত কর্মপথে অগ্রসর হয়। তাহারা বালিকাদের প্রতি তাহাদের কল্যাণের জন্য কতই না প্রীতি ও শুভেচ্ছা দেখায়। পাদ্রিগণ বালিকাদিগকে সর্বপ্রকার অনুগ্রহ দেখায় এবং নানা ভাবে সাহায্য করে। তাহাদিগকে গীর্জ্জায় যাইতেও বাধ্য করে না। ক্রমশঃ বালিকারা খ্রীষ্টভাবের পরিবেশে থাকিয়া প্রভাবিত ও দীক্ষিত হয়। ভারতে ও আমেরিকায় আমি অনেক অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। খ্রীষ্টান সিষ্টার বা মাদার বা নান্‌দের অধীনে আমাদের কন্যাগুলিকে রাখা নিরাপদ নয়।

"বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের সমীচীনতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় স্বামী নির্মলানন্দ উত্তর দেন, বৌদ্ধধর্মে যাহা কিছু মূল্যবান্ ভাবসম্পদ আছে তাহা হিন্দুধর্মেই পাওয়া যায় এবং হিন্দুধর্ম আমাদিগকে এক সাকার ঈশ্বরের সন্ধানও দেয়। সাকার ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস মানব-মানসের অত্যন্ত প্রয়োজন। পরবর্তীকালের বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধকে ঈশ্বর করিয়া এই ব্যাপক অভাব অসঙ্গত উপায়ে পূরণ করিলেন। সুতরাং হিন্দু বৌদ্ধ হইলে কোন লাভ হয় না, বরং ক্ষতিই হয়।"

ছাপড়ার কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত কর্তৃক দীক্ষাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বামী

নির্মলানন্দ বলিলেন "দেবমানব ঈশ্বরাবতার হইতে নির্গত অধ্যাত্ম আলোকের দীপশিখা গুরু দীক্ষাকালে শিষ্যের হৃদয়ে জ্বালিয়া দেন। সাধনা ও বিশ্বাস সহায়ে সে অধ্যাত্ম প্রদীপ সর্বদা জ্বালিয়া রাখাই শিষ্যের কর্ত্তব্য। যদি শিষ্য তাহা করে তাহার বলে সে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হয়।"

প্রশ্ন—সাধনা কিরূপে করিতে হয়?

উত্তর—প্রত্যহ কোন কোন সময় উহার জন্য নির্দিষ্ট রাখ এবং তখন বিহিত উপায়ে সাধনে নিমগ্ন হও নিয়মিত ভাবে ও নিষ্ঠা সহকারে, কিন্তু দিবারাত্রির চব্বিশ ঘণ্টা প্রভুর সতত স্মরণ আবশ্যক। যখন অন্য কর্মে নিযুক্ত থাক তখনও গুরুদত্ত দীক্ষামন্ত্র নিরন্তর জপ কর। জপ ও কাজ যুগপৎ চলিবে। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন, "মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ।" আমাকে স্মরণ করতে করতে যুদ্ধ কর।" সতত স্মরণে মজ্জাগত কুসংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সর্বদা নিজেকে ইষ্টদেবের হস্তস্থিত যন্ত্রস্বরূপ ভাব। প্রভুপদে ষোলআনা আত্মসমর্পণ কর। জীবন ও মনের এইরূপ প্রবৃত্তি হইলেই ঈশ্বর লাভ হয়।

স্বামী বিবেকানন্দজীর জীবন সম্বন্ধে স্বামী নির্মলানন্দ একদা বলিয়াছিলেন, "এই যুগে শত শত দেশপ্রেমিক সেবক প্রয়োজন। স্বর্গত স্বামী বিবেকানন্দের মত এমন মহাত্মা নাই, যাঁহাকে স্বদেশ সেবকগণ আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। তিনিই প্রথম সন্ন্যাসী, যিনি হিন্দুদের গোঁড়ামির সুদৃঢ় প্রাচীর ভগ্ন করিয়া কালাপানি পার হন এবং বহির্জগতের সম্মুখে বেদান্ত দর্শনের সমুজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা উত্তোলিত করেন। তিনিই পাশ্চাত্য দেশের চক্ষে ভারত ও উহার সভ্যতার মান বহুগুণে বৃদ্ধি করেন। তাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে যাহাদের অগভীর ধারণা আছে তাহারও অনুভব করিবেন,—তাঁহার স্বদেশ প্রীতি কত সুগভীর ছিল এবং তাঁহার প্রত্যেক হৃদয়স্পন্দন জনগণের উন্নয়নের জন্য উৎপন্ন হইত।"

মহাপণ্ডিত মোক্ষমূলার প্রণীত "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন" সম্বন্ধে স্বামী নির্মলানন্দ মন্তব্য করেন—ইহা শুধু তাঁহার উপদেশের কিয়দংশ 'কথামৃতে' পাওয়া যায়। কথামৃতের শ্রদ্ধেয় লেখক স্কুল মাষ্টার ছিলেন এবং কেবল ছুটির দিনগুলিতেই ঠাকুরের কাছে যাইতেন। এ সব দিনে তিনি ঠাকুরের মুখে যাহা শুনিয়া ছিলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি ভগবান রামকৃষ্ণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখার সুযোগ পান নাই। এই বিষয়ে স্বামী সারদানন্দের 'লীলাপ্রসঙ্গ

সর্বাঙ্গ সুন্দর মহাগ্রন্থ। সারদানন্দজী ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী শিষ্যদের ন্যায় মাসের পর মাস ধরিয়া দিবারাত্রি তাঁহার কাছে থাকিতেন এবং ভাব রাজ্যের সম্রাট শিরোমণির বিভিন্ন ভাব দর্শন করিবার অপূর্ব সুযোগ প্রাপ্ত হন।"

উনচল্লিশ

বক্তৃতাবলী

স্বামী নির্মলানন্দ ভারতে, ব্রহ্মদেশে ও আমেরিকায় যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন তন্মধ্যে মাত্র পনেরোটি বক্তৃতার সারাংশ তাঁহার ইংরাজী জীবনীতে প্রকাশিত। ত্রিবান্দ্রম, কলিকাতা রেঙ্গুন ও সালেম সহরে তাঁহাকে যে অভিনন্দন-পত্র চতুষ্টয় দেওয়া হয় সেগুলি এইগ্রন্থ মধ্যে উদ্ধৃত এবং তদুত্তরে তাঁহার বক্তৃতাবলীও প্রদত্ত। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলমাসে বর্মা প্রাদেশিক হিন্দু সভায় তিনি যে সভাপতির অভিভাষণ দেন তাঁহার কিয়দংশ এই গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যাইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি যে তিনটি বক্তৃতা ত্রিবান্দ্রমে এবং কুইলনে দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ত্রিবান্দ্রমে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তথায় সর্বপ্রথম গমনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহার সারাংশ প্রথমে দেওয়া হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব বাসনা বাস্তব নিরন্তর জীবন্ত মাতৃদর্শন দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়। অহর্নিশি ভাবাবেশ নিমিত্ত তিনি মন্দিরের কার্য্যক্রম অনুসারে আর পূজাদি করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য পূজক নিযুক্ত হইল। মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী, অথচ উদ্যানবাটীর মধ্যস্থ নিজ স্থানে তিনি তাঁহার দিন গুলি কাটাইতেন। তখন এক ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী স্বতঃই তাঁহার কাছে আসিলেন। তিনি গদাধরকে উচ্চতম অদ্বৈত জ্ঞানের সুযোগ্য অধিকারী দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার কাছে বেদান্ত সাধন করিবে কি?" গদাধর বলিলেন যে, তিনি তাঁহার মাতাকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন। এই মাতা তাঁহার পার্থিব জননী নহেন, ইনি শক্তিরূপা জগন্মাতা। জগন্মাতা তাঁহাকে বলিলেন, "এই উদ্দেশ্যেই আমি তাঁহাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছি।" সেই সন্ন্যাসী গদাধরকে বেদান্ত সাধনের গুপ্ত রহস্য শিক্ষা

দিলেন এবং দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, যে নির্বিকল্প সমাধিলাভ করিবার জন্য তোতাপুরী চল্লিশ বৎসরাধিক কঠোর সাধন করিয়াছেন তাহা এই নিরক্ষর ব্রাহ্মণ পূজারী তিনদিনেই লাভ করিলেন। তখন হইতে এই ব্রাহ্মণ বালক গণ্ড গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াও জগৎকে দিব্যালোক বিকিরণ করিতে লাগিলেন এবং দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে খ্যাত হইলেন।"

ত্রিবান্দ্রম সহরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে স্বামী নির্মলানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন তাহা 'প্রবুদ্ধ কেরলম' মাসিকে দ্বিতীয়বর্ষে দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"আমি যখন বালকমাত্র ছিলাম তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ সন্দর্শনে পরম সৌভাগ্য লাভ করি। তাঁহাকে ৪।৫ বৎসর সেবা করিবার সুবর্ণ সুযোগও আমি পাইয়াছিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে আমি কি বলিব? তিনি ছিলেন প্রকৃতির পবিত্র সন্তান। তাঁহাতে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা স্থান পায় নাই। সদ্য খনি হইতে উত্তোলিত কোনো দুর্লভ অমূল্য অথচ অপরিষ্কৃত অনুজ্জ্বল রত্নের সহিত তাঁহাকে তুলনা করা যাইতে পারে। সমুদ্র বা আকাশের ন্যায় তাঁহার তুলনা ইহলোকে নাই।

"নির্বিকল্প সমাধির সময় তাঁহার আদৌ বহির্বোধ থাকিত না; কিন্তু অন্য সময় প্রায় তিনি শিশুতুল্য আচরণ করিতেন। 'একটি পিঁপড়া আমাকে কামড়াচ্ছে; আমি জ্বালা সহ্য করিতে পারিতেছিনা'—এই বলিয়া তিনি প্রায়ই পিপীলিকার গর্ত্তে হাত দিয়া রাখিতেন, এমনি ছিল তাঁহার সরলতা, অকপটতা। বাংলাদেশে শিশুদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, পিপীলিকার গর্তে হাত দিলে পিপীলিকার দংশনের জ্বালা দূরীভূত হয়। তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা দেখিয়া অনেকে ভাবিতেন—'ইনিই কি সেই মহাপুরুষ যিনি জটিলতম বেদান্ততত্ত্ব কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্বে সহজবোধ্য মনোহর মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেছিলেন? তাঁহার অদ্ভুত অনুভূতির বর্ণনা শ্রবণ মাত্রই শ্রোতাদের সর্ব সংশয় তিরোহিত হইত। কি মহাবিস্ময়! তিনি পণ্ডিতদের মত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধারপূর্বক সংশয় নিরসনে অভ্যস্ত ছিলেন না। এই নিরক্ষর ব্রাহ্মণের কি শাস্ত্র জ্ঞান ছিল! প্রকৃতিই ছিল তাঁহার পক্ষে মহাগ্রন্থ, মহাবেদ। অন্য কেহ তাঁহার মত প্রকৃতি-পুস্তককে এত গভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

"যখন স্বামী বিবেকানন্দ অপরা বিদ্যার অভিমানে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি ভগবানকে দেখেছেন?' তখন তিনি উত্তর দিলেন,—'হাঁ বাবা, আমি তাঁকে দেখেছি, তুমি যদি তাঁকে দেখতে চাও আমি তোমাকেও দেখাতে পারি।' এই অপূর্ব নির্ভীক উত্তর শ্রবণে বিবেকানন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহার কাছে চিরকাল অনুরক্ত রহিলেন। এখন বিবেচনা কর, এই নিরক্ষর ব্রাহ্মণের কি অদ্ভুৎ শক্তি ছিল। যখন তিনি একা থাকিতেন তখন সাধারণতঃ কাপড় পরিতেন না। তিনি স্বীয় বগলে কাপড়খানি গুঁজিয়া আপনমনে উদ্যান বাটির এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যখন দর্শকবৃন্দ দলে দলে তাঁহার নিকট আসিতেন তখন তিনি বলিতেন, 'এখন অনেকে এখানে আসছেন, তাঁহারা সভ্যভব্য লোক। এখন আমার পক্ষে উলঙ্গ থাকা অনুচিত। আমার কাপড়খানা কই? ওটা নিয়ে এস।' তিনি তখন কাপড়খানি খুঁজিতে আরম্ভ করিতেন। হয় ত, কাপড়খানি সর্বদাই তাঁহার বগলেই ছিল! কি অদ্ভুত ব্যাপার! কি দেহবোধ রাহিত্য! আমি এরূপ অদ্ভুত মানব জীবনে আর দেখি নাই, শুনিও নাই।

"অনেকে তাঁহাকে সমাধির অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেন। যখনই তিনি উক্ত অবস্থা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিতেন তখনই নিজে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। তাঁহার মন ও মুখ এক সুর বাঁধা ছিল। অনুরক্ত সেবক মথুরানাথ তাঁহাকে বহুবার পরীক্ষা করিয়াছিলেন; একবার মথুরনাথ তাঁহাকে ব্যবসায়ী বারবণিতার বাড়ীতে লইয়া যান। এই সকল গণিকা দেহবিক্রয় করিয়া জীবন যাপন করিত। তাহাদিগকে পূর্ব হইতেই সংবাদ দেওয়া হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে কি করিতে হইবে তাহাও বলা হয়। সেই পতিতারা তাহাদের সকল মোহিনী শক্তি প্রয়োগে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইল। তিনি শুধু বলিলেন, 'মাকালী এ সকলরূপও ধারণ করিয়াছেন!' এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে জগজ্জননীজ্ঞানে স্তব করিতে লাগিলেন। তাহারা তাঁহার কাছে ঘেঁসিতে পারিল না এবং লজ্জাহত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইল। একজন মহাপুরুষকে অবনত করার চেষ্টায় নিজেরা অপদস্থ হবার জন্য মথুরানাথকে দোষারোপ করিল। তখনকার মত মথুরানাথ সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু আবার তাঁহার সন্দেহ জাগিল, শ্রীরামকৃষ্ণের কামভাব নিশ্চয়ই সম্যক বর্দ্ধিত হয় নাই। সেইজন্য তিনি অন্যরূপ আচরণ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অব্যক্ত মনোভাব বুঝিয়া

নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিলেন যে তিনি সবল, সুস্থ এবং সম্যক্ হৃষ্টপুষ্ট। মথুরানাথের সংশয়রাশি চিরতরে তিরোহিত হইল।

"তোমরা কি মনে কর—স্বামী বিবেকানন্দ অন্ধভাবে কোন কিছু বিশ্বাস করিতেন? বহুবার দেখা গিয়াছে, তিনি ঠাকুরকে যতই বিশ্বাস করিতেন, আবার তত অবিশ্বাস করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অচিরে তাঁহাকে স্বীয় শক্তি ও মহত্ব অভাবনীয় উপারে বুঝাইয়া দেন। "রাজা কখনও রাজোচিত জাকজমক সহকারে রাজ্যে ভ্রমণ করেন, আবার কখনও বা দুঃখহতো ভিক্ষুকরূপে বেড়াইতে যান। এবার রাজা কাঙ্গালবেশে এসেছিলেন।" নিজের অবতারত্ব ইঙ্গিত করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাগুলি স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করিতেন, আবার সংশয়-দোলায়ও দুলিতেন। যে ঘটনায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল তাহা স্মরণযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপ্রয়াণোন্মুখ। তাঁহার দৈহিক শক্তি খুব ক্ষীণ এবং তিনি শয্যাগত। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। বিবেকানন্দ পার্শ্বে উপবিষ্ট। তখনও তাঁহার মানস সংশয়-প্রবণ। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন, কিরূপে ইঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে পারি? এই মানুষ রোগ-শয্যায় শায়িত এবং প্রাকৃত পুরুষের মতই দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছেন?' ইহাই ছিল স্বামী বিবোনন্দের সংশয়। তন্মুহূর্ত্তেই শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানায় উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং জোরের সহিত বলিলেন, "নরেন, এখনও সন্দেহ করছ? এখনও আমাতে বিশ্বাস হচ্ছে না? যিনি ত্রেতাযুগে রামরূপে এবং কৃষ্ণরূপে দ্বাপরযুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তিনিই ইদানীং রামকৃষ্ণ-রূপে সমাগত; তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়। যিনি রাম ও কৃষ্ণ তিনিই একাধারে রামকৃষ্ণ।" নিজেকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর এই দিব্যবাণী উচ্চারণ করিয়া মহাসমাধিতে চিরতরে মগ্ন হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে স্বীকার করিলেন যে, তিনি যুগবতার।

"বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিতেন। প্রত্যেকের মনোভাব চরিত্র ও প্রকৃতির উপযোগী উপদেশ তিনি দিতেন। তাঁহার দিব্যস্পর্শে আসিয়া বহু নাস্তিক আস্তিক হইয়া উঠিলেন। কামাসক্ত, মদ্যপায়ী ও অন্যান্য পাপে লিপ্ত বহু ব্যক্তি তাঁহার প্রভাবে ভালমানুষ হইয়াছেন। নাস্তিকদিগকে তিনি এই উপদেশ দিতেন, "আমি জানি না, ঈশ্বর আছেন কি না? যদি কোনো সর্বশক্তিমান জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর থাকেন তিনি আমার নিকট

প্রকটিত হউন।' তিনদিন শুদ্ধচিত্তে নিরন্তর এইরূপে প্রার্থনা কর। এইরূপে প্রার্থনা দ্বারা যদি ঈশ্বর দর্শন করিতে না পার, আমার কাছে এস। আমি তোমাকে ঈশ্বর দেখাইব।' এইগুলি কেবল কথার কথা নয়। আমি জানি, অনেকে তাঁহার বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দিবারাত্রি যত লোক তাঁহার কাছে আসিতেন তাঁরাদের সকলের সহিত তিনি অসীম করুণা ও গভীর প্রীতি সহকারে ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতেন আহার, নিদ্রা ও বিশ্রামাদি দৈহিক প্রয়োজন ভুলিয়া। এইরূপে তিনি গলদেশে কঠিন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন। অনেক ভক্ত তাঁহাকে বেশী কথা বলিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি বলিতেন, 'এই দেহ কত হেয়! ইহা এক পাকা কুমড়ার মত। বাহির হইতে দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ভিতরটা একেবারে পচা! এই শরীর দ্বারা যদি কাহারো কোনো কল্যাণ হয় ইহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর কি আছে?' এইরূপে তিনি শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত পরহিতার্থে জীবন ধারণ করেন। রামকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষ অনেক জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁহার আবির্ভাব অদ্ভুত, বিরল ও অলৌকিক ঘটনা। অনেক শতকেও এইরূপ ঘটনা ঘটে না।"

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কুইলনে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আহুত ধর্মসভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমদৃষ্টি' শীর্ষক যে ভাষণ স্বামী নির্মলানন্দ দেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল। গীতায় আছে—।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮।৫

পণ্ডিতগণ, অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ বিদ্বান্ বিনয়ী ব্রাহ্মণে এবং গাভী, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডালে সমদর্শী হন। সমদৃষ্টি সম্বন্ধে গীতার শিক্ষা এইরূপ। আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত, অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রজ্ঞ অন্যরূপে সমদর্শী হন। এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও উহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে তাঁহারা ইতস্ততঃ করেন না। তাঁহারা শাস্ত্রীয় বাক্যোদ্ধৃতিপূর্বক প্রমাণ করেন—এই দৃশ্য জগৎ নিশ্চই ব্রহ্মময়। ইহাতেই তাঁহাদের কর্তব্য সমাপ্ত হয়। কিন্তু তাঁহাদের আচরণ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এইরূপ পাণ্ডিত্য লোক-ঠকান বিদ্যা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। "এই সব ব্রহ্মস্বরূপ। আমার ও অন্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, পশু ও বৃক্ষ সবই ব্রহ্মরূপ।"—এই ভাব কি শুধু মনে মনে ভাবিতে হইবে; অথবা উচ্চারণে পর্য্যবসিত হইবে? ইহার বাস্তব ও ব্যবহারিক

উপলব্ধি প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জীবনের বহু ঘটনায় এই শিক্ষা দেন। আমি এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করিব।

"আপনারা অনেকেই জানেন যে, কলিকাতার নিকটবর্তী দক্ষিণেশ্বর গ্রামে গঙ্গাতীরে রাণী রাসমনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত কালীবাড়ী অবস্থিত এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় ত্রিশ বর্ষ বাস করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার মহত্ত্ব সারা বাংলায় বিদিত হইল তখন হইতে প্রত্যহ বহুলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃত ধর্মপিপাসু ছিলেন এবং অধিকাংশই মন্দির, বাগান, গঙ্গা, বড় বড় অট্টালিকা, ফুলগাছ, ফল গাছ প্রভৃতি মনোরম প্রকৃতিক দৃশ্য দেখিতে আসিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত তথাকথিত সভ্যলোক কয়েকজন কোন বিশেষ দিনে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াইতে আসেন। তাঁহারা ঘোড়ারগাড়ী কালীবাড়ীর ফটকের বাহিরে রাখিয়া গঙ্গাতীরস্থ চমৎকার ফুল-বাগান দেখিতে ও শীতল হাওয়া খাইতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকিতে চাহিলেন। তখন তাঁহারা এক ব্যক্তিকে তথায় অন্যমনস্ক ভাবে দণ্ডায়মান দেখিলেন। উক্ত ব্যক্তি বিশিষ্ট দর্শকদের আগমন সম্বন্ধে একেবারে অনবহিত রহিলেন। তাঁহার কটিদেশ মাত্র বস্ত্রাবৃত ছিল এবং তিনি তাঁহাদের চক্ষে ভদ্র বলিয়া প্রতীত হইলেন না। উক্ত ব্যক্তিকে বাগানের মালী বলিয়া তাঁহাদের নিশ্চিত ধারণা জন্মিল। বাগান হইতে তাঁহারা কয়েকটি সুন্দর ফুল লইতে চাহিলেন। কেন? জামার বুকপকেটে রাখিয়া সৌরভ গ্রহণ ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন উদ্দেশ্যে। তাঁহারা কর্তৃত্ব-ব্যঞ্জক স্বরে ডাকিলেন, মালি, এদিকে এস ত? মালি তাঁহাদের নিকটে আসিলে তাঁহারা আদেশ দিলেন, ঐ ফুলগুলি তুলে এনে দাও। মালি বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশ পালন করিলেন। সেই সভ্যলোকগণ ফুলগুলি পাইয়া বুকে গুঁজিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন। মন্দির দর্শনের পর তাঁহারা কালীবাড়ীর প্রসিদ্ধ পরমহংসকে দেখিতে চাহিলেন এবং তিনি কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ধান করিতে করিতে তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে আসিলেন এবং দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, হায়! তাঁহারা যাঁহাকে মালি ভাবিয়াছিলেন তিনিই উক্ত কক্ষে ছোট খাটটীতে উপবিষ্ট! তাহারা অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন, এক পাও আগাইতে পারিলেন না এবং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন তাহাদের নিকট এই সত্য প্রতিভাত হইল যে, যাঁহাকে তারা তুচ্ছ ভাবে ফুল আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন

তিনিই সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, যিনি বহুবর্ষ বিবিধ সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য ব্যক্তির ধর্মগুরু হইয়াছিলেন। লজ্জায় ও দুঃখে অভিভূত হইয়া তাহারা নম্রভাবে এই দেহ-মানবকে ভূমিষ্ঠ প্রণতি নিবেদন-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধায় বা অশ্রদ্ধায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশান্ত বদনে হর্ষ-বিষাদ কিছুই দেখা গেল না। ইতঃপূর্বে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন—যাহারা তাঁহাকে এখন ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেছেন তাহারাই তাঁহাকে কয়েকমিনিট পূর্বে ফুল তুলিতে বলিয়াছিলেন।

তাহারা মন্দির ত্যাগ করিবার পরে অনেকের নিকট অনুতাপ করিয়াছিলেন যে, ঠাকুরকে ফুল তুলিতে আদেশ করিয়া তাহারা কি অন্যায় করিয়াছেন। এইরূপে আমরাও উক্ত বিষয়ে অবগত হইলাম। একদিন আমরা এই সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"যখন তাঁহারা ভ্রমবশে ফুল তুলিতে আদেশ করিয়াছিলেন আপনি তাহাদিগকে বলিলেন না কেন যে, আপনি এই কালীবাড়ীর সন্ন্যাসী, মালী নহেন।" ঠাকুর নিম্নোক্ত উত্তর দিলেন,—"তোমরা কি বলছ? আমি কি মালী নয়? আমি বাগান ও মালী উভয়ই। আমি সর্ব্বভূতে অবস্থিত। আমার ভেদদৃষ্টি নাই। তাহারা যাহা বলেছে খুব সত্য।" ইহাই প্রকৃত সমদর্শন, আসল পাণ্ডিত্য। গীতাতে ভগবান্ সমদর্শিত্ব ব্যাখ্যানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, জ্ঞানী এই অদ্বৈত দর্শনে ধন্য হন। অহংকার মুছিয়া ফেলিয়া এই অদ্বৈত বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ করাই বেদান্তের লক্ষ্য। আন্তরিক আগ্রহ ব্যতীত এই জ্ঞানলাভ হয় না। উক্ত লক্ষ্য না থাকিলে শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রব্যাখ্যা নিরর্থক। যাহা ইতঃপূর্ব্বেই জানিয়াছেন, তাহাই প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এখন হইতে আপনারা সাধনা আরম্ভ করুন। শ্রীরামকৃষ্ণ আপনাদিগকে উক্ত সাধন করিতে সুমতি দিন।"

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারী—শুক্রবার কলিকাতায় নিখিল বঙ্গ রামকৃষ্ণ মহোৎসব উপলক্ষ্যে প্রথম ধর্ম্মসভার সভাপতিরূপে স্বামী নির্ম্মলানন্দ যে উদ্বোধন ভাষণ দেন তাহাতে ঠাকুরের সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত সমন্বয় ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যানদানান্তে তিনি উপসংহার করেন—"ধর্ম্ম এক। ঈশ্বরেচ্ছায় বহু ধর্ম্ম উৎপন্ন, প্রসারিত এবং কিছুকাল পরে অন্তর্হিত হয়। সুতরাং সর্বধর্মের সর্বশ্রেণীর ভক্তবৃন্দকে আমি প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন জানাইতেছি। ধর্মের একত্ব অতি পুরাকালে ঋগ্বেদে ব্যক্ত হইয়াছে। এই

ঐক্য চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে। ঈশ্বর এক, যদিও তাঁহার বহু নাম ও বহু রূপ আছে। হায়! হায়! মানুষ তাহার ভাই মানুষের সঙ্গে ধর্মের নামে ঝগড়া করিবে, ঈশ্বরের নামে বিবাদ করিবে—ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? হিন্দু ভাই, মুসলমান ভাই ও খ্রীষ্টান ভাইকে ঐক্যবদ্ধ করাই সমন্বয় ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। যে ঈশ্বর একদেশে গড্ নামে, অন্যদেশে ব্রহ্ম নামে এবং আর একদেশে আল্লা নামে অভিহিত, তিনি অভিন্ন। সেই ঈশ্বরের অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ; কিন্তু অদ্বৈত স্বরূপ।" উক্ত ধর্মসভায় ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার স্বামী নির্মলানন্দ যে সমাপ্তি ভাষণ দেন তাহাতে তিনি গীতোক্ত শ্লোকার্দ্ধ 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং থথৈব ভজাম্যহম' ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা দেন। উক্ত ভাষণের শেষে তিনি বলেন, "ধর্ম্মবিষয়ে শ্রদ্ধা, স্বাধীনতা, প্রেম অবলম্বনই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মহাবাক্য, উপদেশ। এই তিন নীতি হৃদয়ে দৃঢ় হইলে সমন্বয়ধর্মের মূল ভিত্তি ধর্ম্মজীবনে স্থাপিত হইবে।" উক্ত মহোৎসবের তৃতীয় দিবসের অধিবেশন কলিকাতার শোভাবাজার রাজবাটীর শ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দিরে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা মার্চ আহূত হয়। উক্ত সভায় স্বামী নির্মলানন্দ ঠাকুরের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। "শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেক বাঙালীর গৃহে পরিচিত হইয়াছেন। সারা ভারতে এবং অন্যান্য দেশেও তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই মহাপুরুষের পূতসঙ্গে ক্ষণকাল থাকিয়া আমি যাহা লাভ করিয়াছি তাহাই বলিব। আমরা আজ এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের আটানব্বইতম জন্মতিথি উদ্‌যাপনে সমবেত হইয়াছি। কিঞ্চিতন্যূন একশতক পূর্বে তাঁহার আধ্যাত্মিক হোম-শিখা অহর্নিশি পঞ্চবটীতলে জ্বলিয়াছিল। কিঞ্চিদধিক পঞ্চদশক পূর্বে আমি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে যাইয়া তাঁহার পুণ্যদর্শন ও শুভাশীষ লাভে ধন্য হই। তাঁহার পূতসঙ্গ ও পুণ্যদর্শনই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও উত্তম অভিজ্ঞতা।

পরমহংস কে? লোকে তাঁহাকে পরমহংস বলিত। আমি কল্পনালোকে মানসপটে জটাধারী দীর্ঘশ্মশ্রু ভস্মলিপ্তদেহ পরমহংস চিত্রিত করিয়াছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি গম্ভীর স্বভাব ও মৌনাবলম্বী সাধু হইবেন। কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমার ভুল ভাঙিল। তিনি যোগী, মৌনী, সাধু বা জটী বা পরমহংস নহেন। যদিও তাঁহার বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ হইয়াছিল, বাহ্য দৃষ্টিতে তিনি শিশুমাত্র ছিলেন। তাঁহার কোন ভান বা ভঙ্গী বা কৃত্রিমতা

ছিল না। মায়ের কোলে শিশুর মত তিনি সরল, প্রফুল্ল ও পবিত্র ছিলেন। আধুনিক কালের শিক্ষা সংস্কৃতি বা সভ্যতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির চাকচিক্যে তিনি মুগ্ধ হন নাই। তিনি নিরক্ষর ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি সারাজীবন সাধনা করিয়া প্রাচীন ঋষিদের অধ্যাত্ম সম্পদ আয়ত্ত করেন। প্রকৃতি-পুস্তক অধ্যয়নে তিনি অনুরক্ত ও বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন। প্রকৃতি-পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠা তিনি ভালভাবেই পড়িয়াছিলেন। সেইজন্য প্রকৃতি তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার তাঁহার নিকট উন্মুক্ত করেন। যখন তিনি কথা বলিতেন "৺মা তাঁহার মুখে জ্ঞানরাশ ঠেলিয়া দিতেন। আমি যখন তাঁহাকে দেখিলাম, তখন তাঁহার স্কন্ধে উপবীত ছিল না। সেইজন্য আমি তাঁহার জাতি বুঝিতে পারি নাই। তিনি হাস্যমুখে প্রসন্নবদনে স্নেহভরে আমার সহিত কথা বলিলেন। শিশুর দৃষ্টি যেরূপ সুস্নিগ্ধ ও অনাসক্ত তদ্রূপ ছিল তাঁহার চাহনি। যখন তিনি ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে সমাধি-জাত গাম্ভীর্য্য ফুটিয়া উঠিত এবং তাঁহার সমস্ত গাত্র কষিত কাঞ্চনবৎ সমুজ্জ্বল হইত। ভাবের পরিবর্ত্তনে দেহের পরিবর্ত্তন এত অধিক পরিমানে প্রকাশিত হইতে আমি আর কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখি নাই। শিশুসুলভ সরলতা তাহার স্বাভাবিক হইলেও কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে তাঁহার অপূর্ব গাম্ভীর্য্য প্রকাশিত হইত। সরলতা ও গাম্ভীর্য্যের এইরূপ অদ্ভুত সমাবেশ সমাধিবান্ মহাপুরুষের জীবনেই প্রত্যক্ষীভূত হয়।

তিনি কি ছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তৎপ্রচারিত ধর্ম্মকে অন্য কোন ধর্ম্মের সহিত তুলনা করা যায় না। তিনি হিন্দু নন, মুসলমান নন, খ্রীষ্টান নন, অথবা জোরোয়স্ট্রীয়ান নন। তিনি এই সকল ধর্ম্মের ঘনীভূত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন এবং সর্ব্বধর্মাতীত পরমহংসও ছিলেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে সর্বধর্ম্মস্বরূপ অবতারবরিষ্ঠ বলিয়াছেন। ঠাকুর ছিলেন অনন্ত ধর্ম্মভাবের ঘনীভূত প্রতিমা। সর্বধর্ম্ম সাধনে সিদ্ধিলাভপূর্বক তাঁহার মত অন্য কেহ সর্বধর্মসার উপলব্ধি করিয়া বিশ্বধর্ম প্রবর্তনে সমর্থ হন নাই। পরমহংস, মহাপুরুষ বা অবতার বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়। তাঁহাকে দেহধারী পরব্রহ্ম বলাই উচিত। নাম-রূপধারী সচ্চিদানন্দই শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি যতই তাঁহার পূতসঙ্গ লাভ করিলাম ততই বুঝিলাম, তিনি সর্ব্বধর্মের শক্তিস্বরূপ এবং কালে সর্ব্ব-

ধর্মাবলম্বী তাঁহার সমন্বয় বাণী গ্রহণ করিবেন। আমরা, বাঙ্গালীরা তাঁহাকে পাইয়া গর্ব্ববোধ করিতে পারি, কারণ তিনি বঙ্গদেশেই আবির্ভূত। কিন্তু তিনি আমাদের একচেটিয়া সম্পত্তি হইতে পারেন না। তিনি সর্ব্বদেশের 'চাঁদ মামা'। আমরা বলি, তিনি আমাদের। আমেরিকানরাও বলেন—তিনি আমাদেরও; আবার অনেক উদার মুসলমান বলেন,—তিনি আমাদেরই। জগতের অন্য কোন ধর্মগুরু তাঁহার ন্যায় সর্বধর্মে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন নাই। ইহাই তাঁহার অনতিক্রম্য অসাধারণত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ এমন এক সময়ে আবির্ভূত হন যখন সর্বধর্মের অবলম্বীগণ স্ব স্ব ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়া নাস্তিক হইয়া ছিলেন। সর্ব্বধর্ম সাধন পূর্বক তিনি সর্ব-ধর্ম্মকে সঞ্জীবিত ও শক্তিসম্পন্ন করিলেন এবং দেখাইলেন, অদ্বৈত সনাতন সত্য সর্বধর্মের মূলভিত্তি। তাঁহার সমন্বয়, বুদ্ধিজাত সমীকরণ নহে, তুলনামূলক আলোচনা সম্ভূত নহে। তাঁহার সমন্বয় উপলব্ধিজাত শাশ্বত-প্রজ্ঞান। বর্ত্তমান যুগে সমন্বয় ব্যতীত শান্তি কল্পনা মাত্র। শক্তিপুঞ্জের রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইবে না। সমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণই বর্ত্তমান যুগের ধর্মগুরু ও শান্তিদূত।"

স্বামী-নির্ম্মলানন্দ ১৯১১ খ্রীঃ মে মাসে প্রথম কেরল প্রদেশে প্রবেশপূর্বক হরিপাদে হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত মহাশক্তি' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। উহা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় উক্ত বর্ষে মে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি বাঙ্গালোরে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে 'ঈশ্বর ও আত্মার বৈদিক সংজ্ঞা' শীর্ষক যে বক্তৃতা দেন তাহা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় এপ্রিল সংখ্যায় উক্ত বর্ষে বাহির হয়। উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বৈদিক যুগে আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ অখণ্ড কঠোর সাধনা ও সন্ধানের ফলে যে বিচার মূলক ধর্ম্মের অদ্ভুত ক্রমবিকাশ উপলব্ধি করেন তাহাতে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিহিত। ইউরোপে ধর্ম ও দর্শন দুই সমান্তরাল সরল রেখার ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার ফলে বিরোধ ও সংঘর্ষ চলিতেছে ধর্ম্ম ও দর্শনের মধ্যে প্রথম হইতেই। পাশ্চাত্যের ধর্মরাজ্যে বিচারের আলোক রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে নাই। তথায় ধর্ম্মতত্ত্ব বিশ্বাসের বিষয় এখনও রহিয়াছে। এই জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ দীর্ঘকাল সঞ্চিত কুসংস্কার-স্তূপে ধর্মবোধ প্রোথিত। অন্যদিকে দর্শনও ধর্মের অসহযোগী ছিল।

পাশ্চাত্যে মস্তিষ্ক কখনও হৃদয়ের সহিত এক মত অবলম্বন করে নাই। এই জন্য ধর্ম বা দর্শন পাশ্চাত্যে মানব-মনের তৃপ্তি বিধানে অক্ষম।

ভারতে ধর্ম ও দর্শন কখনও পরস্পরের অন্তরায় হয় নাই। যুগ যুগ ধরিয়া অসংখ্য ঋষিবংশ পবিত্র জীবন যাপন পূর্বক যে সত্য সন্ধান করিয়াছেন তাহাই চারি বেদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বহু সহস্র বর্ষের জ্ঞান-সাধনার অপূর্ব্ব সিদ্ধি এই চতুর্বেদে পাওয়া যায়। বেদের প্রাচীনতম অংশ সংহিতা। সংহিতা সমূহে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রসমূহে সংহত অথবা সংগৃহীত। এই সকল দেবতা ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গলোকের শাসক। মন্ত্র সমষ্টিকে সূক্ত বলা হয়। এক এক সংহিতায় অনেক সূক্ত উল্লিখিত। এই সকল সূক্ত মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রত্যেক বৈদিক দেবতা স্ব স্ব ভক্তগণ কর্তৃক বিশ্বদেব রূপে আরাধিত। তাহা সত্ত্বেও সংহিতা যুগের মন্ত্রদ্রষ্টাগণ কর্তৃক বহু ঈশ্বরবাদ সমর্থিত হয় নাই। মহাপণ্ডিত মোক্ষ মূলার বৈদিক বহু দেবতাবাদকে হেনোথিজম্ আখ্যা দিয়াছেন। ঋগ্বেদের এক মন্ত্রে আছে, 'একম্ সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলে ১৬৪ সূক্তে এই মন্ত্র পাওয়া যায়। এই বেদমন্ত্রের অর্থ, 'ঋষিগণ তাঁহাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, বা জ্যোতির্ময় জারুত্মন বলিয়া থাকেন। যে সত্তা সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত তাঁহাকে ঋষিগণ অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিলেও তিনি অদ্বৈত—এক।' এইরূপে বৈদিক যুগেই অদ্বৈতবাদের মূল সূত্র আবিষ্কৃত হয়।

যজুর্বেদ অরণ্যকের তৃতীয় মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তে আছে, "যদিও সেই সত্তা এক, তথাপি তিনি বহু নামে আরাধিত। 'শতং শক্রাণি যত্র একমেব ভবন্তি।' যাহাতে সমস্ত দেবগণ একীভূত হন তিনিই ব্রহ্ম। যখন স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে বেদধর্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতাবলী দেন তখন তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত রমণী ছিলেন। তিনি স্বামিজীর বক্তৃতাবলী শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হন এবং বক্তৃতাবলী সমাপ্ত হইলে একদিন স্বামিজীর কাছে আসিয়া বলেন, "আপনি হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ ও চমৎকার, কিন্তু একটি জিনিষ আমি বুঝিতে পারি নাই এবং তৎসম্বন্ধে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। আপনাদের ধর্মে কোন শয়তানের কথা আপনি উল্লেখ করেন নাই কেন? শয়তান ব্যতীত কোন ধর্মের কথা আমরা ধারণা করিতে পারি না।"

শয়তান বা ডেভিল ব্যতীত ধর্ম থাকিতে পারে না, ইহাই পাশ্চাত্য-মানসের বিশ্বাস।

যেমন ভারতে বৈদিক যুগে এক দেবতা প্রধানরূপে পরিগণিত হয় তেমনি অন্যান্য দেশেও ঘটিয়াছিল। জেরুজালেমে হেজেকিয়া ও জোসিয়ার রাজত্বকালে জিহোবা শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে পূজিত হন। গ্রীসেও জীউস প্রধান দেবতার পদে উন্নীত হন। উপনিষৎ-যুগেও বৈদিক দেবগণ অন্তর্হিত হন নাই, তথাপি জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল হওয়ায় সর্বদেবের পশ্চাদ্বর্তী এক সত্তা ব্রহ্ম আবিষ্কৃত হন। এই ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকাররূপে চিন্তিত হইতেন। অন্যান্য দেশে সাকার ঈশ্বরে ব্যাপক বিশ্বাস দৃষ্ট হয়, কিন্তু নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থান পায় নাই। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, আবেস্থা, ত্রিপিটক প্রভৃতি সর্বধর্মের মূল শাস্ত্রগুলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, সাকার সগুণ ঈশ্বরের পশ্চাতে নিরাকার নির্গুণ ঈশ্বর লুক্কায়িত। অন্যান্য ধর্মে এমন কি, হিন্দুধর্মের বহু সম্প্রদায় নিরাকার ঈশ্বর বিস্মৃত হইয়াছে। আবার কোন কোন ধর্মে সাকার ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া নিরাকার ঈশ্বরের প্রাধান্য কীর্তিত। একমাত্র বেদান্ত ধর্মে সাকার ও নিরাকার ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সমান শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। মুণ্ডক উপনিষদে আছে "যেমন উর্ণনাভি জাল সৃষ্টি করে ও গুটাইয়া লয়' যেমন পৃথিবীতে ওষধি সমূহ সম্ভূত হয়, এবং যেমন জীবিত পুরুষের দেহে কেশ-লোম উদ্ভূত হয় তেমনি অক্ষয় পুরুষ হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন। সুতরাং উপনিষৎ হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম হইতে এই জড় জগৎ প্রসূত। বাইবেলে আছে, ছয় হাজার বৎসর পূর্বে এই সৃষ্টি শূন্য হইতে আবির্ভূত হয়। ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। বেদ মতে সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত।

উপনিষৎসমূহে আত্মার স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে বিবৃত, যে আত্মা প্রত্যেক মানব-শরীরে অবস্থিত উহা অজ, অজর ও অমর। ইহার স্বরূপ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত। ইহা অপাপবিদ্ধ সুখদুঃখাতীত। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। সংহিতা যুগে যে অখণ্ড সত্তা হৃদয়ে দৃষ্ট হন উপনিষৎ যুগে তাহাই সর্ব মানব হৃদয়ে উপলব্ধ হন। ঈশোপনিষদে আছে, 'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি' ইহার অর্থ, যে অক্ষর পুরুষ বা পরব্রহ্ম আদিত্য-হৃদয়ে বিরাজিত তিনি আমার আত্মা এবং আমিই সেই। ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের মূল কথা।"

চল্লিশ

পরিশিষ্ট এক

অপ্রকাশিত সংঘবার্ত্তা

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মযুদ্ধে পাশ্চাত্য বিজয়ান্তে ভারতে ফিরিয়া বেলুড়ের ভাগবত নারায়ণ সিংহের নিকট হইতে জমি কিনিয়া বেলুড় মঠ স্থাপন করেন। উক্ত জমিতে ডক ইয়ার্ড ছিল এবং জাহাজ মেরামত হইত। উক্ত জমি কিনিতে ও বাড়ী করিতে স্বামীজির ইংরাজ শিষ্যা মিসেস সেভিয়ার দশ হাজার টাকা ও মার্কিন শিষ্যা মিসেস ওলিবুল দুই হাজার পাউণ্ড (প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা) দান করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর বেলুর মঠের নবগৃহ উৎসর্গীকৃত হয়। তৎপূর্বে উহা বেলুড় গ্রামে গঙ্গাতীরস্থ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যান বাটীতে চলিতেছিল। নীলাম্বরবাবু কাশ্মীর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন এবং তাঁহার পত্নী স্বামী নির্মলানন্দকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন।

সম্ভবতঃ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠের সহিত বালি মিউনিসিপ্যালিটির বিরোধ উপস্থিত হয়। বেলুড় গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও ঠাকুরবাড়ী নির্মিত হইলে উহাতে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীবৃন্দ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তখন বালি মিউনিসিপ্যালিটি মঠবাড়ীর কর ধার্য্য করিয়া তাহা আদায় করিতে চাহিলেন। বেলুড় মঠ সাধারণের ঠাকুরবাড়ী ও সাধুদের বাসস্থান বলিয়া উহার মিউনিসিপ্যাল টাক্স হওয়া উচিত নয় এই মর্মে স্বামী বিবেকানন্দ সবিনয় আবেদন জানাইলেন। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির তদানীন্তন চেয়ারম্যান প্রতিবাদ করিলেন,—"উহাতে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা চা খান, শোফায় শোন ও মাছ খান। সুতরাং চলিত অর্থে তাঁহাদিগকে সাধু বলা যায় না। আবার তথায় সাহেবরা ও মেমরা আসেন ও থাকেন। অতএব উহার কর ধার্য্য হওয়া উচিত।" স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত কর দিতে অস্বীকার করিলে বালি মিউনিসিপ্যালিটি বেলুড় মঠের বিরুদ্ধে হুগলী জেলা কোর্টে মোকদ্দমা করিলেন। তখন বেলুড় ও বালিগ্রাম হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। হুগলী কোর্টে বেলুড় মঠের স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি

ব্যক্তিদের জেহারা হয়। অন্যপক্ষের উকিল স্বামী বিজ্ঞানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কি শোফায় শুয়ে থাকেন? বেলুড় মঠে কি শোফা নাই?" স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ভাবিলেন—"শোফা নাই বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়, কারণ স্বামিজীর ঘরে শোফা আছেই। আর যদি বলি, শোফা আছে তাহলে মোকদ্দমায় আমরা হেরে যাব। এখন কি করা যায়?" তিনি বিপক্ষীয় উকিলকে উলটে প্রশ্ন করিলেন, শোফা বলিতে আপনি কি বুঝেন? তখন উকিল শোফার জমকালো বিবরণ দিলেন সেরূপ শোফা বেলুড় মঠে নাই। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ উত্তর দিলেন, আপনি শোফার যে সংগা দিলেন তদনুসারে বেলুড় মঠে শোফা নাই। এইসব কথা আমরা স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর মুখে শুনেছি। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে অন্যপক্ষের উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেলুড় মঠে কি চা খাওয়া হয়?" সান্যাল মহাশয় বিজ্ঞান স্বামিজীর ন্যায় প্রশ্ন ঘুরাইতে না পারিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিলেন, হাঁ, চা খাওয়া হয়, এই সরল স্বীকৃতিতে মোকদ্দমায় হার হইতে পারে, ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, এবং বাক্য রুদ্ধ হইল! তিনি মুর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। উক্ত কোর্টের সাব-জজ তখন কোন ও বাঙালী বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নির্দ্দেশে সাক্ষী সান্যালমহাশয়কে কোর্টের বাহিরে আনা হইল। তখন হাওড়ার জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তরুণ ইংরাজ মিস্টার ডিউক। তাঁহার মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটিয়া যায়। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া বেলুড় মঠ পরিদর্শন করিতে আসেন। তখন একটি হরিণ ও কয়েকটী গাভী বেলুড়মঠে ছিল, এবং শাক-সবজী ও ফল-ফুলের বাগান করা হইত। ম্যাজিস্ট্রেট ডিউক সাহেব এইসব দেখিয়া শুনিয়া স্বামী বিবেকানন্দজীর সহিত কথা বলিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন এবং বেলুড় মঠের আবেদন সমর্থনপূর্বক রিপোর্ট দিলেন। তখন হুগলী কোর্ট বেলুড় মঠের পক্ষেই রায় দিলেন। উক্ত রায়ের সারমর্ম এই "বেলুড় মঠে যে সাধুরা বাস করেন, তাঁহারা সুশিক্ষিত ও আধুনিক এবং বিলাতে যাতায়াত করেন। তাঁহারা চা খাইলে এবং শোফায় শুইলেও ভাল সাধু। বেলুড় মঠ সাধারণের ধর্মস্থান। উহার মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স না হওয়াই উচিত"।

বেলুড় মঠের জমি স্বামী বিবেকানন্দের নামেই কেনা হয়। ১৯০১ খৃঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ, শিবানন্দ, সুবোধানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, অখণ্ডানন্দ,

অদ্বৈতানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, অভেদানন্দ, তুরীয়ানন্দ এই এগারজনকে লইয়া একটি ট্রাস্ট বোর্ড রেজিস্টার্ড করেন। তখন হইতে এই বোর্ডই বেলুড় মঠের একমাত্র অধিকারী ও পরিচালক হইলেন। স্বামীজি স্বয়ং এই বোর্ডে রহিলেন। ইহার চারদিন পরে ১৯০১ খৃঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজির সাক্ষাতে বেলুড় মঠেই উহার প্রথম অধিবেশন হয়। ইহাতে এগারজন ট্রাষ্টির মধ্যে আটজন উপস্থিত ছিলেন। তখন স্বামী অভেদানন্দ নিউ ইয়র্কে ও স্বামী তুরীয়ানন্দ কালিফোর্নিয়াতে ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার আমেরিকা হইতে আসিয়া এই ট্রাস্ট বোর্ড রেজিষ্টার্ড করেন। তখন বেলুড় মঠের ডাক নাম ছিল ঠাকুর বাড়ী। প্রথমে এই অধিবেশনে ট্রাস্ট-ডিড্ পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইল। অনন্তর প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন আরম্ভ হইল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ ও সারদানন্দের নাম প্রেসিডেণ্টের জন্য প্রস্তাবিত হইল। এই নির্বাচন ব্যালেটে ভোট লইয়া সম্পন্ন হইল। উল্লিখিত তিনজনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যথাক্রমে ভোট হইল—৫ : ৩, ১ : ৭, ২ : ৬ মাত্র। সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইলেন দুই বৎসরের জন্য। অনন্তর স্বামী প্রেমানন্দ প্রস্তাব করিলেন যে, স্বামী সারদানন্দ ও নির্মলানন্দ যথাক্রমে বেলুড় মঠের সেক্রেটারী ও এ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারী নির্বাচিত হউন। স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক সমর্থিত হইয়া এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-কালে এই বোর্ডের আর অধিবেশন হয় নাই। প্রায় দেড় বৎসর পরে স্বামী বিবেকানন্দজীর মহাসমাধির পর ১৯০২ খ্রীঃ ২২শে জুলাই ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়।

১৯০১ খ্রীঃ ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩১ খ্রীঃ ৪ঠা এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ বর্ষে বেলুড় মঠের ট্রাষ্ট বোর্ডের মাত্র বাহান্নটী অধিবেশন হয়। ১৯২২ খ্রীঃ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রায় বাইশ বৎসর স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর পুনঃ পুনঃ নির্বাচিত হইয়া প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাঁহার অসুস্থতা নিবন্ধন স্বামী অদ্বৈতানন্দ সাময়িক প্রেসিডেণ্টরূপে কিছুকাল দুইবার সভাপতিত্ব করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের পর স্বামী শিবানন্দ হন বেলুড়মঠের দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট ১৯৩৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় বার বৎসর। বেলুড়মঠের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রেসিডেণ্ট হন যথাক্রমে স্বামী অখণ্ডানন্দ ও বিজ্ঞানানন্দ। প্রথম চারজন প্রেসিডেণ্ট ছিলেন

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য। স্বামী বিবেকানন্দের দুই শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ ও বিরজানন্দ হন যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রেসিডেণ্ট। সপ্তম ও বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট স্বামী শংকরানন্দ প্রথম প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী সারদানন্দ ১৯০১ খ্রীঃ হইতে ১৯২৭ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় সাতাশ বৎসর বেলুড়মঠের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। অনন্তর স্বামী বিবেকানন্দের দুই শিষ্য শুদ্ধানন্দ ও বিরজানন্দ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্পাদক হন। চতুর্থ ও বর্ত্তমান সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দের শিষ্য। স্বামী মাধবানন্দের সম্পাদকত্বকালে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ দুই বর্ষ সম্পাদকত্ব করেন। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ পঞ্চম সম্পাদকরূপে গণ্য হইতে পারেন।

বেলুড়মঠে ১৯২৬ খ্রীঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সাধু সম্মেলন হয়। তখন এই সংঘ পরিচালনায় ট্রাষ্টীগণকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি প্রায় ২৫ বর্ষ কার্য্য করিবার পর ১৯৫২ খ্রীঃ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কর্ম্ম-অভিজ্ঞ তরুণ সন্ন্যাসীবৃন্দকে লইয়া প্রতি দুই বর্ষ পরপর উক্ত কমিটি গঠিত হইত।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের অধ্যক্ষতার প্রথম দুই বর্ষ অতীত হইলে ১৯০৩ খ্রীঃ ১০ ফেব্রুয়ারী পুনরায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের প্রয়োজন উঠিল। ট্রাষ্টীদের কোরাম না হওয়ায় ৭ই মে পর্য্যন্ত মিটিং করা হয় নাই। সেইজন্য এই তিন মাস স্বামী অদ্বৈতানন্দ সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ বলিয়া সাময়িক প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আবার প্রেসিডেণ্ট হন। ১৯০৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায় প্রেসিডেণ্টের নির্বাচনকাল আসে। কোরামের অভাবে মিটিং না হওয়ায় পুনরায় স্বামী অদ্বৈতানন্দ ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১৯০৯ খ্রীঃ ২৮শে ডিসেম্বর মৃত্যুদিবস পর্য্যন্ত প্রেসিডেণ্ট পদে আরূঢ় হন। স্বামী অদ্বৈতানন্দ দুইবার সাময়িক প্রেসিডেণ্ট হন।

১৯০৩ খ্রীঃ ৭ই মে বেলুড় মঠের ট্রাষ্ট বোর্ডের তৃতীয় অধিবেশন হয়। ইহাতে স্বামী নির্মলানন্দ প্রভৃতি সাতজন নূতন ট্রাষ্টী নির্ব্বাচন করা হয়। স্বামী নির্মলানন্দজীর নাম প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হয় যথাক্রমে স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক। স্বামী নির্মলানন্দ ছয় ভোট পাইয়া এক নব ট্রাষ্টী নির্বাচিত হন। ১৯০৬ খ্রীঃ স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন কয়েক মাসের জন্য। ১৯০৬ খ্রীঃ ১০ই অক্টোবর ট্রাষ্ট বোর্ডের অষ্টম অধিবেশনে

তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং প্রস্তাব করেন যে, 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামটী আইনতঃ যথাবিধি রেজিষ্টার্ড হউক।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ২৪ আগষ্ট পুরীধামে শশীনিকেতনে বেলুড় মঠের ট্রাষ্ট বোর্ডের যে অধিবেশন হয় তাহাতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়, "তিয়েন শিন্ ইণ্ডিয়ান রিক্রিয়েসন ক্লাব" ১১০২৮১০ আনা বেলুড় মঠকে প্রেরণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য স্মৃতিরক্ষার্থ মুর্শিদাবাদ অনাথ আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বালককে একটি বৃত্তি দেওয়া হউক।"

সম্ভবতঃ ১৯০৯।১০ খৃষ্টাব্দে শোলাপুরে ফরেষ্ট অফিসার শ্রীহরিপদ মিত্র স্বামী বিবেকানন্দের "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" বইখানির একটি মারাঠী অনুবাদ প্রকাশ করেন। স্বামীজি পরিব্রাজক অবস্থায় শোলাপুরে হরিপদবাবুর আতিথ্য স্বীকার করেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত মহেন্দ্রনাথ দাসের চৌদ্দ বিঘা জমি ৭০৪৪৲ টাকা মূল্যে বেলুড় মঠ ক্রয় করেন। উক্ত জমি বেলুড় মঠের ঠিক পশ্চিমে অবস্থিত।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে মে মাসে স্বামী শিবানন্দ বেলুর মঠের অধ্যক্ষপদে নির্বাচিত হন। ট্রাষ্ট বোর্ডের অধিবেশনে ইহা স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং স্বামী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক সমর্থিত হয়।

১৯২৬-খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে স্বামী সর্ব্বানন্দ মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং যতিশ্বরানন্দ তৎস্থলে অভিষিক্ত হন।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে শ্রদ্ধেয় রাম দত্তের শিষ্য স্বামী যোগবিমল কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে বেলুড় মঠকে হস্তান্তরিত করেন। এই জন্য যে দলিল লিখিত হয় তাহাতে এইমাত্র সর্ত্ত ছিল যে, তিনি যতদিন বাঁচিবেন ততদিন একজন ট্রাষ্টী থাকিবেন। এই জন্য ঠাকুরের গৃহী-শিষ্য মনোমোহন মিত্রের পুত্র গৌরীমোহন মিত্র যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। উক্ত বৎসর স্বামী বিরজানন্দ স্বামী বোধানন্দের পরিবর্ত্তে নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির ভার গ্রহণে সম্মত হন। এই মর্ম্মে স্বামী বোধানন্দকে তার করা হইয়াছিল; কিন্তু স্বামী বিরজানন্দ শাম্লাতাল বিবেকানন্দ আশ্রমে যাইয়া মত পরিবর্ত্তন করেন এবং নিউইয়র্কে যান নাই।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বেলুড় মঠের পার্শ্বে অবস্থিত মহেন্দ্রনাথ দাসের

নূতন জমি ক্রয় করিবার জন্য রায় সাহেব সতীশচন্দ্র চৌধুরীকে আটত্রিশ হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ট্রাষ্ট বোর্ডে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, সংঘ পরিচালনায় সাহায্য করিবার জন্য একটি ওয়ার্কিং কমিটী গঠিত হউক। ইহা প্রায় ২৩।২৪ বৎসর কার্য্য করিবার পর তুলিয়া দেওয়া হয়; এই ওয়াকিং কমিটী গভর্ণিং বডি বা ট্রাষ্ট বোর্ডের অধীনে কার্য্য করিতেন।

মিস ম্যাক্‌লাওডের ভগিনী মিসেস্ লেগেট বেলুড় মঠের সাধুদের দুধ-ঘি খাওয়ার জন্য ১৯২৯ খৃঃ পাঁচ হাজার টাকা প্রেরণ করেন। বেলুড় মঠের পশ্চিম অংশে 'সোনার বাগান' নামে যে উদ্যানবাটী আছে এবং যাহার জমিতে দ্বিতল বিশাল সাধু নিবাস নির্মিত হইয়াছে উহা ক্রয় করিবার জন্য মিসেস্ লেগেট চল্লিশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। উক্ত জমিতে গঙ্গার ধারে যে পুরাণ একতল গৃহ আছে তাহার নাম লেগেট হাউস।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বেলুড় মঠের দক্ষিণে অবস্থিত রায় মহাশয়ের ভূসম্পত্তি চব্বিশ হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করা হয়। বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। এই জন্য ইহা মার্কিন মহিলা কুমারী হেলেন রুবেল ও মিসেস্ ওরসেষ্টার যথাক্রমে ছয় লক্ষ ও এক লক্ষ টাকা দান করেন। উহার প্রাথমিক ডিজাইন স্বামী বিবেকানন্দজীর নির্দ্দেশে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ অঙ্কিত করেন। বোধ হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। যুগাচার্য্যের সিদ্ধ সংকল্প চল্লিশ বৎসর পরে পূর্ণ হয় এবং ১৯৩৮ খৃঃ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ উহাতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে প্রতিষ্ঠিত মর্মর মূর্তি খোদিত করেন কলিকাতায় অমর ভাস্কর জি পাল। ঠাকুরের পূত ভস্মাস্থি-পাত্র এই মর্মর মূর্তির নীম্নে প্রোথিত। মঠ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ, সংঘমাতা সারদা দেবী ও প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নশ্বর শরীর বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে যে যে স্থানে ঘৃতাক্ত চন্দন কাষ্ঠের চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয় ঠিক সেই সেই স্থলে সমাধি-মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমা সারদা দেবীর মন্দির স্বামী সারদানন্দের চেষ্টায় নির্মিত হয়। সংঘমাতার জন্মগ্রাম জয়রাম বাটীতেও স্বামী সারদানন্দের মাতৃ-মন্দির নির্মাণ করেন। কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে "মায়ের বাড়ী" সারদা-সন্তান সারদানন্দ কর্তৃক কেদার দাস-প্রদত্ত জমিতে প্রতিষ্ঠিত। এই তিন স্মৃতিমন্দিরই স্বামী সারদানন্দের অক্ষয় কীর্তি।

বেলুড় মঠে বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব কোণে গঙ্গাতীরে যে শ্মশান আছে তাহাতে স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ ও স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহারাজের স্থূলদেহ দাহ করা হয়। উহা পূতস্থান—দেবভূমি। উহার ধূলিকণা ব্রহ্মরজ। বেলুড় মঠের পুরাতন গেষ্ট হাউসের একতলা গিরীশ ঘোষের পুণ্য স্মৃতি রক্ষার্থ নির্ম্মিত। বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের ঠিক পশ্চিমে দ্বিতল অট্টালিকা প্রেমানন্দ মেমোরিয়াল নামে অভিহিত। উহার দ্বিতীয়তলা স্বামী শিবানন্দের প্রচেষ্টায় নির্ম্মিত হয়। পুরাতন মঠবাড়ীর দোতলার যে কক্ষটীতে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি রক্ষিত তন্মধ্যেই স্বামিজী থাকিতেন এবং তন্মধ্যেই তিনি সমাধিতে মগ্ন হন। সংঘমাতা বেলুড় মঠে পদার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে একবারও আসেন নাই। ঠাকুরের মহাসমাধি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে এবং বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রায় বার বৎসর পরে। গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত কাশীপুর শ্মশান ঘাটে ঠাকুরের ভৌতিক শরীর অগ্নিস্মাৎ করা হয়। উক্ত শ্মশানে স্বামী অভেদানন্দ শ্রীম এবং গৌরীমার দেহও ভস্মীভূত হইয়াছে। এই চারিজনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারি স্মৃতিমন্দির এই শশ্মানে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই শ্মশান স্বর্গবৎ পবিত্র।

বাঙ্গালোর আশ্রম সম্পর্কে বেলুড় মঠে স্বামী নির্মলানন্দের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা করেন তাহাতে বিবাদীর পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণার্থ ১৯৩৪ খ্রীঃ কলিকাতা কমিশন বসে এবং স্বামী ত্রিপুরানন্দ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ এবং মিঃ এস. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষ্য দেন। ব্যারিষ্টার শ্রী এস. এন. রায় ছিলেন কমিশনার। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের বিবৃতিতে সাধারণের জ্ঞাতব্য তথ্যাবলী এখানে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"আমার নাম বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, আমার বয়স সাতাত্তর বৎসর, কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে বিশ সংখ্যক বসু পাড়া লেনে আমি বাস করি। আমি সরকারী পেনসার এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ, স্পেশাল ফর্মস ডিপার্টমেণ্টের অধীনে ইনভেণ্ট বেকাররূপে আমি কর্ম করিতাম। আমি পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছি। বহুবার আমি ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখিয়াছি এবং আমি তাঁহার শিষ্য। রামকৃষ্ণ পরমহংসের অন্যান্য শিষ্যকেও আমি দেখিয়াছি। পরমহংসের প্রধান শিষ্যবৃন্দ স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ

রামকৃষ্ণানন্দ প্রভৃতিকে আমি জানিতাম, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আমি ঘন ঘন যাইতাম। ঠাকুর পরমহংসের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম. শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মৃত্যুর পর স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে খবর রাখিতাম।

পরমহংসের মৃত্যুর পর বরাহনগরে মুন্সীবাবুদের ভগ্ন গৃহ মাসিক ৮।১০ টাকা ভাড়ায় সুরেশবাবুর অর্থ সাহায্য লইয়া মিলন মন্দির স্থাপিত হয়। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যবৃন্দ ঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিতাম এবং পূজাধ্যানে অনেক সময় কাটাইতাম। তখন মিলনমন্দিরে কোন সন্ন্যাসী ছিল না। নরেন্দ্র নিজেই সন্ন্যাস লইলেন; এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, অভেদানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, নির্মলানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অখণ্ডানন্দ, নিরঞ্জানন্দ, প্রেমানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রভৃতি গুরু ভাইদের সন্ন্যাস দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি ও ভস্মাস্থির সম্মুখে হোম করিয়া সন্ন্যাস লওয়া হয়। বরাহনগর হইতে আলম বাজার চ্যাটার্জিদের বাড়ী মাসে দশ টকা ভাড়া লইয়া তথায় মঠ স্থানান্তরিত হয়। তথায় ১৮৯৭ খৃঃ পর্য্যন্ত মঠ চলিয়াছিল।

সুরেশবাবু এবং বলরামবাবুর পত্নীর মৃত্যুর পর গিরীশচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং অন্যান্য ভক্ত মিলন মন্দির ব্যায় নির্বাহার্থ অর্থ দান করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও আমি হিমালয়ে পর্য্যটন করিতেছিলাম। আমরা দেরাদুনের নিকটবর্তী রাজপুরে আসিয়া ও তথা হইতে হরিদ্বারে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎ পাইলাম। তথা হইতে আমরা মিরাটে আসিয়া অখণ্ডানন্দের সহিত মিলিত হইলাম, তাহার অসুস্থতার জন্য মিরাট ত্যাগ করিলাম। মিরাটে একটী বাংলোতে আমরা স্বামী অদ্বৈতানন্দের দেখা পাই ; মিরাট হইতে স্বামী বিবেকানন্দ একাকী দিল্লীতে যান। দিল্লী হইতে স্বামী বিবেকানন্দ রাজপুতনার মধ্য দিয়া মাদ্রাজ গমন করেন। মাদ্রাজের ডেপুটী একাউন্টান্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য মাদ্রাজ হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দকে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিরূপে চিকাগো ধর্ম্মসভায় পাঠান। স্বামীজি কয়েক বৎসর আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করিয়া ইউরোপের গ্রেটবৃটেন প্রভৃতি দেশ দেখিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার এবং স্বামীজির সর্টহাণ্ড-রাইটার গুডুইন আসেন। স্বদেশে প্রত্যাগমনান্তে স্বামীজি আলম বাজারে

মিলন মন্দিরে অবস্থান করেন। সেভিয়ার দম্পতি মিলন মন্দিরের স্থায়ী গৃহনির্মাণার্থ অর্থ দান করিতে ইচ্ছা করেন। ইহার ফলে বেলুড় গ্রামে জমি ক্রীত ও গৃহ নির্মিত হয়। সেভিয়ার দম্পতি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন।

"আমি বেলুড় মঠের জমাখরচের হিসাব রক্ষক ছিলাম। সলিসিটার পি. সি. কর মহাশয়ের দ্বারা বেলুড় মঠের ট্রাষ্ট ডীডের খসড়া প্রস্তুত করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ বৈষয়িক ব্যাপারে প্রায়ই আমার পরামর্শ লইতেন। আমি প্রত্যেক শনিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে মঠের জমাখরচ পাকা খাতায় লিখিয়া রাখিতাম। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রারম্ভ হইতে আমি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। আমি গান করিতে করিতে বেলুড় মঠের হিসাব লিখিতাম, পরীক্ষা করিতাম। তখন বহু ভক্ত মাসিক তিন টাকা চাঁদা দিতেন। আমি, গিরীশ ঘোষ ও অন্যান্য কয়েকজন মিশনের আদি সভ্য ছিলাম বলিয়া আমাদিগকে চাঁদা দিতে হইত না! প্রায় বিশ বৎসর আমি বেলুড় মঠের হিসাব রক্ষক ও হিসাব পরীক্ষক ছিলাম।

"শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দুইটী পৃথক প্রতিষ্ঠান। মঠে ঠাকুর পূজা, শাস্ত্র পাঠ, ধ্যান ধারণা, ভক্তবৃন্দকে ধর্মশিক্ষাদান, ঠাকুরের জন্মোৎসব, দুর্গাপূজা ও কালীপূজা, যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব প্রভৃতি করা হয়। আর "শিবজ্ঞানে জীব সেবাই" মিশনের মূলমন্ত্র। বৃদ্ধ, রুগ্ন, আর্ত্তদের সেবা, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত-দের সেবা প্রভৃতি মিশনের পক্ষ হইতে করা হয়। ১৯০১ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবাকার্য্য হয় কলিকাতায় প্লেগ রিলিফ। স্বামীজির শিষ্য সদানন্দ এবং ডাঃ শশী ঘোষ, শরৎ সরকার প্রভৃতি গৃহীভক্ত এই প্লেগ সেবা কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। চারু দাস, কেদার ভৌমিক, যামিনী, কালী প্রভৃতি সেবকবৃন্দ কর্তৃক কাশীধামে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু বৎসর এই সেবকবৃন্দ সেবাশ্রম পরিচালনা করেন। মিলন মন্দিরকে মঠও বলা হইত। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও নির্মলানন্দ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাবৃন্দ যেদিন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তৎপরদিন আমি বরাহনগর মঠে গিয়াছিলাম।

অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত বাংলায় প্রকাশ করেন। তিনি আমাকে চার খণ্ড পুস্তক উপহার দেন। স্বামী কল্যাণানন্দ বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট প্রস্তাব করেন যে, কনখলে

সাধুদের জন্য একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। স্বামীজি তাহাকে তথায় যাইয়া সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে বলেন। ইহা সম্ভবতঃ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ট্রাষ্ট ডীড্ হইবার সময়।

স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্তৃক "উদ্বোধন" পত্রিকা সর্বপ্রথমে রামচন্দ্র মৈত্র লেন হইতে প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের ভাব প্রচার করাই ছিল "উদ্বোধন" প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য।

কেদারনাথ বসু ওরফে কটি মামা জামতাড়ার রাজার নিকট হইতে বহু জমি লীজ লইয়াছিলেন। অন্যান্য অংশীদারও তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন। ভূমির উন্নতি বিধানই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনে অসমর্থ হইয়া কটি মামা বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নিজ অংশের জমি দান করেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশন রেজিষ্টার্ড হয়। ইহার নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের গভর্ণিং বডি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধিকারী ও অধিনায়ক।

মার্কিণ মহিলা মিসেস্ ওলিবুল স্বামী বিবেকানন্দকে দুই হাজার পাউণ্ডের একটি চেক দিয়াছিলেন বেলুড় মঠ নির্মাণের জন্য। এই টাকায় গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি কাগজ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে কেনা হয়, বেলুড় মঠের স্থায়ী তহবিলরূপে। অন্যান্য ভক্তের অর্থ সাহায্যে এই তহবিল এক লক্ষ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

১৮৯৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ৫৭ নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দের পৌরহিত্যে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সভা আহূত হয়। আমি সারদানন্দের সহিত প্রত্যহ রাত্রিতে প্রায় তিন ঘণ্টা অতিবাহিত করিতাম। তিনি সকালে মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে আসিতেন। যখন মায়ের বাড়ী নির্মিত হয় নাই তখন তিনি আমার বাড়ীতে আসিয়া কখন কখনও চা খাইতেন। যাহারা মায়ের বাড়ীতে থাকিতেন তাহাদিগকে সারদানন্দ প্রায়ই বলিতেন, "আমার দুই চোখ বুজলেই সংঘের বিরোধ আরম্ভ হবে।" বস্তুতঃ এই মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। তাঁহার দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্ব হইতেই এই সংঘে বিরোধ বীজ অঙ্কুরিত হয়।

বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় দুই বৎসর পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি সন্ন্যাস গ্রহণান্তে স্বামী কৃপানন্দ নামে কিছুকাল তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। ঠাকুরের প্রতি ভক্তি বশতঃ আমি গৃহ ও পরিবার ত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করি। আমার গেরুয়া বসন দেখিয়া পূজনীয়া সারদা দেবী ও আমার গর্ভধারিণী অশ্রুপাত করেন। সেইজন্য আমি ঋষিকেশে সন্ন্যাস গ্রহণ-পূর্বক দুই তিন বৎসর পরে সন্ন্যাস ত্যাগ করি। কেহ আমাকে সন্ন্যাস দেয় নাই। আমি গৃহ হইতে গেরুয়া পরিয়া বহির্গত হই। উপনয়নকালে আমি গেরুয়া লইয়াছিলাম। আমি যেদিন দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে পূর্বাহ্নে যাইতাম, তখন স্নান করিয়া পরিহিত জলধৌত শ্বেতবস্ত্র না শুকান পর্যন্ত ঠাকুরের নির্দেশে গেরুয়া কাপড় পরিতাম। ,, আমি চল্লিশ টাকা বেতনে চাকরী করিতাম।"

পরিশিষ্ট

দুই

মূল্যবান পত্রাবলী

[পূজ্যপাদ স্বামী নির্মলানন্দজীকে কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রভৃতি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকখানি এখানে প্রকাশিত হইল।]

(মূল চিঠি)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

Calcutta 11th. January, 1931
50, Amherst Street

To

Swami Nirmalananda

Dear Tulshi Maharaj,

It was so kind of you to send me ৺Prasad Y' day.

I was very anxious to come to you and see Swamijee's Festival (জন্মতিথি মহোৎসব). But I was advised by the doctor not to venture out of doors after my recent breakdown.

I was fortunate also to get in the evening ৺Prasad from the Belur Math celebration.

Is it not true that all our brothers are worshipping our Master, our Father—the Father of us all in various places and in the same Temple, viz.—the Temple of the heart—হৃদয়মন্দিরে ?

Is it not true that wherever our lot may be cast, we are sons of the same Father, servants of the same Master ?

May He bless us all and unite us in one fold as ever in our loving brotherhood. Ever yours affectionately in the Lord.

The bearer is a ভক্ত friend of ours.

—M.

অনুবাদ

শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণ ভরসা

মর্টন ইনষ্টিটিউশান, ৫০, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১১ই জানুয়ারী, ১৯৩১ সাল

স্বামী নির্মলানন্দ সমীপে—

প্রিয় তুলসী মহারাজ, গতকাল আপনি আমার জন্য অনুগ্রহপূর্বক ৺প্রসাদ পাঠিয়েছেন।

আমি আপনার কাছে যাইয়া স্বামিজীর জন্মতিথি-মহোৎসব দেখিতে উৎসুক ছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আমার যে অসুখ হয়েছিল, তাহার পর ডাক্তার আমাকে বাইরে যাইতে নিষেধ করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন সন্ধ্যায় বেলুড় মঠ-উৎসব থেকেও আমি ৺প্রসাদ পেয়েছি।

ইহা কি সত্যি নয় যে, গুরুভাইরা বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু একই মন্দিরে অর্থাৎ হৃদয়-মন্দিরে আমাদের প্রভু— আমাদের পিতা— আমাদের সকলের পিতাকে আরাধনা করিতেছেন ?

আর ইহা কি সত্য নয় যে, আমরা যেখানেই থাকি না কেন, ভাগ্যক্রমে আমরা একই পিতার সন্তান, একই প্রভুর দাস? তিনি আমাদিগকে কৃপা করুন, এবং পূর্ব্ববৎ আমাদিগকে একই গোষ্ঠীভুক্ত ও ভ্রাতৃত্ব প্রেমে আবদ্ধ করুন।

এই পত্রবাহক আমাদের একজন ভক্ত বন্ধু। —ইতি

আপনাদের স্নেহাস্পদ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম

উদ্বোধন অফিস
১নং মুখার্জ্জি লেন,
বাগবাজার
১লা ভাদ্র, ১৩৩১
ইং ১৭।৮।২৪
১লা ভাদ্র, কলিকাতা।

তুলসী মহারাজ,

শ্রীমান সুধীরকে তুমি যে দুইখানি পত্র লিখিয়াছ, তাহা পড়িয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। শরীর আমার ভাল যাইতেছে না। mild types (সামান্য রকম)-এর বেরি বেরি, পেটের অসুখ ইত্যাদিতে এবং তাহার উপর গোলাপমা heart-এর অসুখে শয্যাগতা—বোধ হয়, আর অধিক দিন তাঁর দেহ থাকিবে না; সেইজন্য উত্তর দিতে বিলম্ব হইল।

আমি মহাপুরুষকে অদ্য লিখিয়া দিলাম যে, ঝগড়াঝাটি করিয়া সহসা এইরূপে তোমাকে বাঙ্গালোরের কাজ ছাড়িয়া দিতে বলা আমার মতে আদৌ ভাল নয়। সেইজন্য, তুমি ও তিনি এখানে চলিয়া আসিলে সকলে মিলিয়া যাহা ন্যায়সঙ্গত এবং যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর কার্য্যের উন্নতি হইবে, এরূপভাবে একটা মীমাংসা স্থির করা যাইবে। জীবনের অল্পদিনই আমাদের অবশিষ্ট আছে। কয়টা দিনের জন্য এইরূপে ঝগড়া-বিবাদ করা একেবারে তিক্ত বোধ হয়।

অধিক আর কি লিখিব ভাই, মহাপুরুষের সহিত তুমি একবার এদিকে কিছুদিনের জন্য চলিয়া আইস। ইহাই আমার অনুরোধ। আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবে। ইতি

চির প্রেমাবদ্ধ
শ্রীসারদানন্দ।

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,
বাসাভাঙ্গুটি, বাঙ্গালোর সিটি
৮।১০।২৪

শ্রীমান তুলসী,

আমার শুভ বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও কোলাকুলি জানিবে। আমি সব ভুলে গেছি, তুমিও সব ভুলে যাও। একটু ভালবাসা নিয়ে এস। ঠাকুর বড় ভালবাসার ঠাকুর। বুড়োবয়সে আর অন্য ভাব কেন। দিনকতক আর বাঁচিব বৈত নয়। এস ভালবেসে কাটিয়ে দেওয়া যাক। তুমি এলেই একসঙ্গে মা কন্যাকুমারী দর্শন করে আসা যাবে। খরচ পত্রের অভাব হবে না ঠাকুরের কৃপায়। এখানকার সব কুশল। একটা গরু কাল বিইয়েছে। এঁড়ে বাছুর হয়েছে। মহাষ্টমীর দিন ঠাকুরের বিশেষ ভোগরাগ হইয়াছিল, ভক্ত অনেকগুলি প্রসাদ পাইয়াছিলেন। দরিদ্রনারায়ণ ২৫।৩০ জন সেবা করিয়াছে। ভক্তও প্রায় ৫০।৬০ জন। আশা করি, তোমার শরীর ভাল আছে। আসবার সময় শর্বানন্দকে আশীর্বাদ করে এস। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্খী
শিবানন্দ

(৪)

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণম

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ
পোঃ হাওড়া, ১৮।৩।১৯৩

প্রিয় তুলসী,

এইমাত্র আমরা তোমাকে নিম্নলিখিত মর্মে এক তার করেছি। বাঙ্গালোর আশ্রমের সম্পত্তি বেলুড় মঠের ট্রাষ্টিগণের নহে; তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে উহা পরিচালিত করিয়া আসিতেছ, এবং আমাদের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দজী ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে তোমাকে লিখিয়া নিজেকে এবং শ্রীযুক্ত সুর্বারায়া আয়ারকে অনর্থক কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া তুমি বিস্মিত হইয়াছ—এই মর্মে তুমি শ্রীযুত সুর্বারায়া আয়ারকে যে পত্র দিয়াছ তাহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। তোমার নিকট হইতে এই যে কথা শুনিলাম, তাহা বাস্তবিকই সম্পূর্ণ নূতন—বিস্ময়কর।

স্বামিজী কর্তৃক রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ হইতেই আমরা সকলে এই সঙ্ঘের অধীনে একযোগে কার্য্য করিয়া আসিতেছি। শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও অপর সকলে এই সঙ্ঘের একত্বভাব রক্ষা ও পুষ্টির জন্য কি ঐকান্তিক যত্ন ও দূরদর্শিতার সহিত তাঁহাদের জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন! তাহা কি আমরা ভুলিতে পারি? তাঁহাদের কথা আমাদের মনে এখনও জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। তাই ভাবিতেই পারি নাই, যে তুমি আমাদিগের মধ্য হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পর্যন্ত অগ্রসর হইবে। স্বামিজী সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ও উন্নতির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে যে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিশ্লেষণে যে কোন ব্যক্তি চেষ্টা করিবে তাহার উপর তিনি কিরূপ তীব্র অভিসম্পাত দিয়া গিয়াছেন, তাহা নিশ্চিত তোমার জানা আছে। তাই আমাদের মনে হয় যে, কোন অজ্ঞাত কারণে তোমার মন সাময়িকভাবে কুহেলিকাচ্ছন্ন হইয়াছে। তুমি জান— আমার বয়সের আধিক্য ও শারীরিক অপটুতা হেতু তোমার নিকট যাইতে অক্ষম। এইজন্য আমরা আমাদের সমগ্র প্রেম ও আগ্রহের সহিত তোমাকে পত্রপাঠ এইখানে আসিবার জন্য সমবেতভাবে আহ্বান করিতেছি। তুমি এস ও আমাদের সহিত একত্র পূজনীয় প্রেমাস্পদ স্বামিজী, মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতির দিব্যসঙ্ঘের সেই অতীত দিনের শত শত স্মৃতির মধ্যে কিছুদিন কাটাইয়া যাও। আশা করি, আমাদের এই অনুরোধ উপেক্ষা করিবে না। অবশ্য অবশ্য এখানে আস। ইহা আমাদের সকলের একান্ত ইচ্ছা। তুমি জান, তোমার প্রতি আমাদের ভালবাসা কোন অবস্থাতেই নষ্ট হইবার নহে। সেই ভালবাসার প্রেরণায় এবং আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর মহান আদর্শ ও কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে তাঁহাদের আদেশ অনুসরণ করিয়া নিয়া যেভাবে এতদিন একযোগে কার্য্য করিয়া আসিতেছি, তাহাও স্মরণ করিয়া তোমায় এই পত্র লিখিলাম। আমাদের আন্তরিক ভালবাসা জানিবে। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

সুবোধানন্দ

শ্রীঅখণ্ডানন্দ

শ্রীচরণেষু,

উপরে মহারাজরা যাহা লিখিলেন, আমরাও তাহা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমাদের প্রণাম জানিবেন, এবং দয়া করিয়া একবার অবশ্য অবশ্য মঠে আসিবেন। ইতি

দাস শুদ্ধানন্দ
অচলানন্দ
দাস নিশ্চয়ানন্দ
স্নেহের দাস কল্যাণানন্দ
বিরজানন্দ

প্রিয় তুলসী মহারাজ,

আপনি মহাপুরুষ লোক, যাহাতে বেলুড় মঠ—রামকৃষ্ণ সংঘ অক্ষুন্ন থাকে ও আপনাকে লইয়া আরও শক্তি বৃদ্ধি করে, এমত করিবেন। আপনি পৃথক না হন—এই আমার প্রার্থনা। ইতি

আপনার শ্রীবিজ্ঞানানন্দ

(৫)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় পোঃ
হাওড়া
২৭শে মে, ১৯২৪

পূজনীয় তুলসী মহারাজ,

আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিবেন। বহুদিন আপনাকে পত্রাদি লিখি নাই। তজ্জন্য অপরাধ ক্ষমা করিবেন। মধ্যে মধ্যে নানা source (উৎসব) হইতে আপনার কিছু কিছু সংবাদ পাইয়া থাকি। মধ্যে শুনিয়াছিলাম আপনার নাকি diabetes (বহুমূত্র) হইয়াছে; আশা করি, এক্ষণে অনেকটা ভাল আছেন; সম্প্রতি বুড়ো বাবার পত্রে জানিলাম—আগামী পূজার

সময় আপনার এদিকে আসিবার সম্ভাবনা আছে। যদি শরীর ভাল থাকে তবে আপনার দর্শন পাইব। শুনিলাম—হরিপদ* বাঙ্গালোরে যাইতেছে। বোধ হয়, এতদিনে গিয়েছে। সে আবার আমেরিকা যাইবে বলিতেছে। আমি তাহাকে এখানে থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাহাতে সে বলে, "২।৩ বৎসর পরে একেবারে ফিরিব। আমি গেলে মিস্ মটন নিউইয়র্ক সোসাইটির auditorium (বক্তৃতা-গৃহ) করিয়া দিতে পারে।" আমার ত মনে হয়, হরিপদ যদি ভারতেই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয়, ভারতীয় কার্য্য বেশ সুশৃঙ্খল হইতে পারে। কারণ, শরৎ মহারাজও আজকাল নানা কারণে কিছু দেখিতে পারেন না। মহাপুরুষ মহারাজও বৃদ্ধ ও রুগ্ন হইতেছেন এবং আমরাও বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ কর্ম্মে অক্ষম হয়ে পড়ছি। আপনি কি মনে করেন? যদি ভাল বিবেচনা করেন, তাহার সহিত দেখা হইলে তাহাকে ভারতে থাকিতে বলিবেন। বোধ হয়, সে যদি Indian work (ভারতীয় কার্য্য) বেশ organise (সঙ্ঘ বদ্ধ), করিতে পারে তবে প্রয়োজন হইলে ২।৪টি ভাল ভাল চরিত্রবান উপযুক্ত লোক আমেরিকায় পাঠাইয়া তথাকার কার্য্যের সুবিধা করিতে পারি। এই সম্বন্ধে আপনি কিরূপ মনে করেন, জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

আমি প্রায় সাত মাস হইল কাশী সেবাশ্রমে change এ ছিলাম। দুর্গাপদ ডাক্তারের ব্যবস্থামত পথ্যাদি করিয়া কতকটা ভাল আছি। এখানে মাস-খানেক হইল আসিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, কাশীতে গরম কাটাইব; কিন্তু মহাপুরুষ change এ যাওয়ায় তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে মঠ হইতে পুনঃ পুনঃ লেখায় এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। আশির্বাদ করুন, যেন এই শেষ বয়সে মন ঠাকুরের পাদপদ্মে সংলগ্ন হয়, আর বাজে হুজুগে যেন না কাটে। বাল্যকাল হইতে আপনাদের আশ্রয় লইয়াছি, কত অপরাধ করিয়াছি, কত ঝগড়াঝাটি করিয়াছি, সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আবার সদুপদেশ দিয়াছেন। এখন যাহাতে ঠাকুরের পাদপদ্মে মন যায়, তাহার জন্য তাহার কাছে একটু বলুন। আপনারা তাঁর সন্তান; তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের কথা শুনিবেন।

---

* স্বামী বোধনন্দ। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ।

কাশীতে যাইবার কিছু পরেই মুকুল মহারাজ* দেহত্যাগ করিলেন। আমাদেরও বাল্য সঙ্গী তো অনেক চলে গেল, আপনারা ঠাকুরের ভক্ত ত্যাগী শিষ্য কয়েকজন মাত্র আছেন; আপনাদের সঙ্গে আমাদেরও টানিয়া লইয়া ঠাকুরের কাছে চলুন।

কাগজ দেখিয়া খুব সুখী হইলাম—ত্রিবান্দ্রম মঠ সম্পূর্ণ হইয়া উহা open করিয়াছেন। আরও আনন্দিত হইলাম জানিয়া যে, ঐ দেশীয় কয়েকজনকে ঠাকুরের ত্যাগের পথে আনিয়া সন্ন্যাস দিয়াছেন। দক্ষিণ দেশে থাকিয়া ঠাকুরের কাজ আপনার দ্বারা যেরূপ পাকা হইল, শত শত বাজে কর্মীর দ্বারাও বোধ হয় তা হয় না। আমি আপনার মন-জোগান কথা বলিতেছি না। আমার ইহাই আন্তরিক বিশ্বাস।

আপনি হয়তো বলিবেন—বুড়া বয়সে আবার বৈষ্ণবী ভাব এত কোথা হইতে আসিল? যাই বলুন; কিন্তু আপনার অনুগ্রহ চাইই চাই, যথেষ্ট পেয়েছিও। পুজনীয় স্বামিজী মহারাজ হইতে আপনারা সকলেই অল্প বিস্তর কৃপা করিয়াছেন; তার জোরেই এখনও একরূপ মঠে আপনাদের আশ্রয় টিকিয়া আছি। এই চিঠিখানি লেখবার occassion হইল মঠের কর্ম্মীদের চাপে। মঠ হইতে মিশনের জেনারেল রিপোর্ট বলিয়া ইতিপূর্ব্বে দুইখানি বাহির হইয়াছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রজ্ঞানন্দ করিয়াছিল এবং ১৯১৯ সালে আমি ও শরৎ মহারাজ করি। সম্প্রতি অনেক লোক মঠ ও মিশন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা idea পাইতে চায় বলিয়া বহুদিন হইতে আর একটা জেনারেল রিপোর্ট লেখবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু এতদিন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দ্বিতীয় জেনারেল রিপোর্টটার এক কপি আপনাকে পাঠালাম। দয়া করে ওটা একটু উল্টে পাল্টে দেখে তৃতীয় রিপোর্টের জন্য যদি আপনার ওদিককার কার্য্যের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন ত পাঠিয়ে দেবেন আপনার সাবকাশ মত। তাড়াতাড়ি কিছু নেই।

আরও কিরূপভাবে রিপোর্ট বার করলে সাধারণের উপকার বেশী হবে বলে মনে করেন, তৎসম্বন্ধে যদি কিছু Suggestion দেন তবে তাহাও যাহারা উহা সংকলন করিতেছে, তাহাদের জানাইব।

এখনও মঠের climate ভাল, বর্ষা নামিলেই হয়তো পালাই পালাই করতে

* স্বামী আত্মানন্দ। ইনি স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য ও উন্নত সন্ন্যাসী।

হবে। শরৎ মহারাজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন তবে তাঁহারও প্রস্রাবের ব্যয়রাম, বাত এবং রক্ত প্রস্রাব প্রভৃতি মাঝে মাঝে আছে। তার উপর আবার যোগীনমা বুড়ী একরূপ শয্যাশায়ী, তাঁর দিন রাত তত্ত্বাবধান। আর আর খবর একরূপ ভাল। আশা করি, আপনার কুশল সংবাদ সত্বর পাইব।

ইতি—

দাস

শুদ্ধানন্দ

(৬)

ওঁ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড়, পোঃ হাওড়া

১২ই আগষ্ট, ১৯২৪ সাল

পূজনীয় তুলসী মহারাজ,

আপনার ২৪শে জুনের পত্র পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত প্রীত হয়েছিলাম তা কি বলব? কতকটা আলস্য ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ততা বশতঃ এবং কতকটা আপনার প্রতিশ্রুত তৃতীয় জেনারেল রিপোর্টের জন্য ওদিককার কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণের প্রতীক্ষায় পত্রের উত্তর দিই নাই। মাঝে মাঝে আপনার লেখবার দেরি দেখে আর একখানি পত্র লিখব মনে করছিলাম; কিন্তু আবার অন্যরূপ ভেবে আপনার পত্রের অপেক্ষায় ছিলাম। ইতিমধ্যে আপনার ৭ই অগাষ্টের পত্র আসিয়া পৌঁছিল। এই পত্র পড়িয়া কিছু আশ্চর্য্য হই নাই। কারণ, আপনার পূর্ব পত্রে উহার কতকটা আভাস ছিল। আপনার আদেশ অনুসারে ঐ দিনই উদ্বোধনে গিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট আপনার পত্র পড়িয়া শুনাইলাম। এইরূপ একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার হওয়াতে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, আমিও মর্মাহত হইয়াছি। কাল তিনি মঠে আসিয়াছিলেন। তিনি এই বিষয়ে আপনাকে পত্র লিখিবেন বলিলেন।

একস্থানের কার্য্যভার ত্যাগ করা এক কথা। মহাপুরুষ মহারাজের ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি ওখানকার কার্য ছাড়িয়া দিন। তাঁহার উপর আপনার যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা ভালবাসা আছে, ইহাও জানি; আর মহাপুরুষ মহারাজও আপাততঃ যতই অন্যরূপ ব্যবহার করুন, তিনি যে আপনাকে আন্তরিক ভালবাসেন না বা

আপনি ওদিকে যথেষ্ট কার্য করিয়া ঠাকুর ও স্বামিজীর নাম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন না, একথাও আমি বিশ্বাস করি না। কাল আবার আপনার আর একখানি পত্র পাইলাম এবং আপনার শরীর খারাপ যাইতেছে জানিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আশা করি, এতদিনে মহাপুরুষ মহারাজের রাগ পড়িয়া গিয়াছে এবং আপনারও মনে যে একটা অশান্তির ভাব জাগিয়াছিল, তাহা কাটিয়া গিয়াছে এবং উভয়ে সদ্ভাবে ও শান্তভাবে পরামর্শ করিয়া যাহাতে ওদিককার কার্য্য বেশ ভালভাবে চলে, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। মহারাজ আশীর্বাদ করুন, যাহাতে মনটা ক্রমশঃ বহির্মুখী ভাব হইতে সরিয়া একটু অন্তর্মুখী হয়। জীবনের শেষ দশায় আসিয়াছি। ঠাকুর-স্বামিজীর মুখের দিকে চাহিয়া আপনাদের পদ-প্রান্তে আশ্রয় নিয়াছিলাম। আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া শেষ পর্য্যন্ত যেন আপনাদের সকলের উপর শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা অক্ষুন্ন রাখিতে পারি।

আমাদের আজ মহাপরীক্ষার দিন। আমি যেন নিজের দোষ কেবল দেখি, আপনাদের কেবল গুণই যেন আমার লক্ষ্য হয়। স্বামিজী মহারাজ তাঁহার নিয়মাবলীতে আমাদিগকে বড় কঠোর একটি আদেশ করে গেছেন। "এই মঠের কেহই মন্দ নহে, মন্দ হইলে কখন এখানে আসিত না। অতএব কাহাকেও মন্দ ভাবিবার পূর্ব্বে কেন মন্দ ভাবি, এটা ভাবা উচিত।" আশীর্ব্বাদ করুন, স্বামিজীর এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, জ্ঞান-ভক্তি লাভ করে জীবন ধন্য করিতে পারি। হরিপদর (স্বামী বোধানন্দ) এডেন থেকে এক পত্র পেয়েছি। মনসুনে বড় কষ্ট পেয়েছে। অপরাপর কুশল। মধ্যে মধ্যে কুশল-সংবাদ দানে সুখী করিবেন।

শীঘ্র যদি এদিকে আসা হয়, বহুকাল পরে আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে সুখী হব। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন এবং পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকেও জানাইবেন। জিতেন* আয়েঙ্গার প্রভৃতিকেও ভালবাসাদি জানাইবেন।

ইতি—

দাস

শুদ্ধানন্দ

* স্বামী বিশুদ্ধানন্দ (বেলুড় মঠের বর্ত্তমান ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট)

পুনশ্চঃ—ওদিককার কার্য্যের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাইবেন বলিয়াছিলেন, মাঝখানে এইরূপ অপ্রীতিকর ব্যাপার হইয়া যাওয়াতে বোধ হয় তাহা পাইবার একটু বিঘ্ন ঘটিল। আশা করি, উহা আপনার স্মরণ আছে এবং উহা পাঠাইবার জন্য আপনি অন্য কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন। রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া টাইপ করা হইতেছে, ১০।১৫ দিনের মধ্যে ওদিককার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আসিলে বিশেষ সুবিধা হয়।

দয়া রাখিবেন। ইতি

দাস—শুদ্ধানন্দ

পুঃ—ভবানী এখনও আসে নাই।

তিন

দক্ষিণ ভারতে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমসমূহ

	আশ্রমের নাম	স্থান	প্রতিষ্ঠার তারিখ
১।	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	হরিপাদ	৪ঠা মে, ১৯১৩ খৃঃ
২।	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	থিরুভিলা	৯ই মে, ১৯১৩ ,,
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	কুইলাণ্ডি	৩১শে মার্চ্চ, ১৯১৫ ,,
৪।	শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রম	ত্রিবান্দ্রম্	৭ই মার্চ্চ, ১৯২৪ ,,
৫।	শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগানন্দ আশ্রম	এ্যালিপ্পি	জুন, ১৯২৪ ,,
৬।	শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম	ম্যোট্টাম্	অক্টোবর, ১৯২৫ ,,
৭।	শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জন আশ্রম	ওট্টাপালম্	১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৬ ,,
৮।	শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম	পোন্নাম্পেট্, কূর্গ	১০ই জুন, ১৯২৭ ,,
৯।	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	সালেম	১৪ই নভেম্বর, ১৯২৮ ,,
১০।	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	আত্তুর	১৯৩০-৩৫ ,,
১১।	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	আরুর	
১২।	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	নিয়ূর	
১৩।	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	মুভাট্টুপুঝা	
১৪।	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	পুত্তুকাদ্	
১৫।	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	কায়াঙ্কুলাম্	১৯৩০ ,,
১৬।	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	কুলাথুর	
১৭।	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	পালাই	
১৮।	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম	কালিকট্	১৯৩৭ ,,